প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৭

মুদ্রক : শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

আমার ঘটনাকণ্টকিত রাজবন্দীজীবনের শেষ পর্য্যায়ে দিনাজপুরের এক অখ্যাত অনগ্রসর ক্ষুদ্র গ্রামে সাক্ষাৎ ঘটেছিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। পরিচয় হয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং অবশেষে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি তাঁর সঙ্গে। আজ অবশ্য তিনি আর মরজগতে নেই। কিন্তু সে যুগে পরাধীন দেশে দেশকর্ম্মিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানারূপ সাহায্যদানের কী ঝুঁকি হাসিমুখে নিতেন তিনি, আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। শুধু বিশাল হৃদয় নয়, তাঁর সাহসবিস্তৃত বক্ষপুটে আশ্রয় পেয়েছিল সে যুগের দুর্দ্ধর্ষ পলাতক বিপ্লবী। সুখের সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন পরিহার করে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তৈরী করেছিলেন একটি রাজনৈতিক পরিবার, বৃটিশ দুঃশাসনের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়েও যা আদর্শচ্যুত হয়নি।

স্বল্পভাষী, অমায়িক, স্নেহপরায়ণ ও আপামর জনসাধারণের পিতৃপ্রতিম মর্য্যাদার অধিকারী সে যুগের বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম আত্মত্যাগী নীরব শুভানুধ্যায়ী পরমপূজনীয় স্বর্গত শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করে ধন্য হলাম।

বিনয়াবনত

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"তখন আমি জেল-এ" নামীয় গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণে আরও ঘটনা সংযোজন করার ফলে উহার কলেবর এত বৃদ্ধি পায় যে, বাধ্য হইয়া উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইয়াছে। প্রথম খণ্ড "চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে" নামে প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড "দিনগুলি মোর কোথায় গেল" নামে প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারেও জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর কর্ণধার অন্যতম সুহৃদ সুরেশ দাসকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁহার অকুণ্ঠ আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বহু পাঠক পাঠিকার নিকট হইতে অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি, আশা করি দ্বিতীয় খণ্ডও তাঁহাদের স্নেহলাভে বঞ্চিত হইবে না।

আমার ঘটনাকণ্টকিত রাজবন্দীজীবনের বহু ছোট ছোট ঘটনা শুনিয়া যাঁহারা উহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজনের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, এই সুযোগে তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই। শুধু সংযোজন নয়, কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জনও করিতে হইয়াছে। ঘটনাগুলি সবই সত্য, সুতরাং তাহাতে হাত দিবার অবকাশ নাই, শুধু উপস্থাপনের ভঙ্গীতে কোথাও কোথাও সংস্কার সাধন করিয়াছি।

যে জীবন বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া বহু সম্মুখে আগাইয়া আসিয়াছি, সেই অতি অতীতের কাহিনী শুনাইবার সার্থকতা কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমার মনে হয় জীবন আগাইয়া চলিয়াছে অতীতকে একেবারে অস্বীকার করিয়া নয়, ছাঁটকাট করিয়া একেবারে বাদ দিয়া নয়। বহির্লোকে উভয়ের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে একটি অদৃশ্য মিলনসূত্র চিরকাল বিরাজ করিতে থাকে, সে সত্য একেবারে অস্বীকার করা যায় কি? গতকালের কথা আজ বাসি বলিয়া আখ্যা পাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অন্তরের মণিকোঠার ঠাণ্ডা ঘরে উহা সংরক্ষিত থাকে বলিয়াই উহা কদাপি নষ্ট ও কাজেকাজেই পরিত্যাজ্য হইয়া যায় না। তাই যদি হইত, তাহা হইলে গ্রীস ও

রোমীয় উপকথা আমরা ভুলিয়া যাইতাম, ভুলিয়া যাইতাম ঈশপের নীতিগল্প, মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী পুরাতন হইয়া উঠিত, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নিরর্থক বোধ করিতাম।

আসল কথা, দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের বাস্তুকারগণের পক্ষে অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লোমহর্ষক কাহিনী সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইয়া ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, শুধু স্বাভাবিক নয়, তাঁহাদের আগ্রহ দেখানো উচিত। ইতিহাস শুধুই a chronology of dead men and dead events নয়, ভবিষ্যৎ রচনার কাজেও উহার অবদান অনস্বীকার্য্য।

তবে আমার গ্রন্থ স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। বরং বলিতে পারা যায় যে, আমি সে ইতিহাস স্বেচ্ছায় ও সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছি। কেন সে কথা স্বতন্ত্র। আমি ব্যক্তিগত রাজবন্দীজীবনের কাহিনী লিখিয়াছি। উহারই ফাঁকে ফাঁকে অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িয়াছে সেই অগ্নিযুগের বিপ্লব আন্দোলনের খণ্ড খণ্ড আভাস, অগ্নিঋষিদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের ইতিবৃত্ত। তথাপি মূলতঃ ইহা ব্যক্তিগত কাহিনী।

চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে যে দিনগুলি অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহারই স্মৃতি-কথা কাহারো ভাল লাগিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ব্যারাক স্কোয়ার কোয়ার্টার্স নং ২০।
পোঃ—বহরমপুর। জেলা—মুর্শিদাবাদ।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

দিনগুলি মোর কোথায় গেল

এক

আমার রাজবন্দী জীবন সেকালের অনেক রাজবন্দীর সঙ্গে তুলনায় তেমন দীর্ঘ নয়। দ্বিতীয় বার তো নয়ই, প্রথম বারও মাত্র সাড়ে ছয় বৎসরের কাছাকাছি। একটানা দীর্ঘ প্রায় নয় বৎসর কাল জেলে বা বন্দীশিবিরে কাটিয়েছেন, তেমনি রাজবন্দীর সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল না।

কিন্তু তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার বন্দীজীবনের একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। একই জেলে বা একই বন্দী শিবিরেই শুধু নয়, হয়তো নির্দ্দিষ্ট একটি কক্ষেই তাঁদের কাটাতে হয়েছে বছরের পর বছর। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে সরকারী কর্ম্মচারীরা বদলি হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সহবন্দীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে সেই প্রথম দিন দেখা হয়েছে, হয়তো একেবারে শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে অনেকেই থেকে গেছেন। একই খাটে শয্যা, একই চেয়ার-টেবিলে লেখাপড়া, একই দরজা দিয়ে যাতায়াত, জানালা পথে আকাশের যেন সেই একই টুকরো। উচ্চ প্রাচীরের ওপারে পূর্ব্ব আকাশের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকেই প্রাকৃতিক নিয়মে বন্দী সূর্য্য প্রতিদিন লাল হয়ে ওঠে, তারপর নির্দ্দিষ্ট রেখা ধরে মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার প্রাচীরের ওপারে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানেই অদৃশ্য হয়ে যায়। মনে হয় সূর্য্যও বন্দী, প্রকৃতির বন্দীশালায় লক্ষ কোটি বৎসরের বন্দী একই পথ পরিক্রমায় একঘেয়ে জীবন যাপন করছে। বন্দী যেন আকাশের চাঁদ, একঘেয়ে জীবন যাপনে ক্লান্ত। বাতাসেও একঘেয়েমির গন্ধ। একঘেয়ে জীবনের বিবর্ণতা অন্তরেও অনুপ্রবেশের পথ খুঁজে ফেরে!

দীর্ঘ নয় বৎসরের ঘনীভূত একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠা তাঁদের অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল!……

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার বন্দীজীবনে কোনোদিন কোথাও এতটুকু একঘেয়েমি ঘনিয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। প্রথমতঃ, কোনো একটি স্থানেও একটানা দীর্ঘকাল আমায় থাকতে হয়নি। অবস্থা বিপর্য্যয়ে বা বিপাকে পড়ে গভর্ণমেণ্ট আমায় নিয়ে যত টানাহ্যাঁচড়া করেছেন, ততই আর কিছু হোক্ বা না-হোক্, আমার বন্দীজীবনে স্বভাবতঃই এসে গেছে বৈচিত্র্য।

নিশ্চয়ই এটা কাম্য ছিল না গভর্ণমেণ্টের। বরং একঘেয়েমির স্লো পয়জনের সিরিঞ্জ চালিয়ে কৈশোরের ফুটন্ত উদ্দীপনা ও কর্ম্মপ্রেরণাকে একেবারে পঙ্গু অথর্ব্ব করে ফেলাই ছিল নীতি। কিন্তু অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। আমার বন্দীজীবনে যে করেই হোক্, ঘন ঘন এসে গেছে পরিবর্ত্তন। স্থানের পরিবর্ত্তন, পরিবেশের পরিবর্ত্তন, পাত্রের পরিবর্ত্তন। শুধু তাই নয়। রাজবন্দী জীবনের মধ্যেই দু' দু'বার অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি। কিন্তু কোনোবারই গভর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে মামলা চালাননি। আর একবার আমার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছিল, নিম্ন আদালতে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আপীলে মুক্তি লাভ করে পুনর্মুষিকো ভবঃ-এর মতো আবার রাজবন্দীত্ব লাভ করি।

সেই পরিবর্ত্তনের তালিকা দিচ্ছি।—

১৯৩১ সালে বিক্রমপুরের কেয়টখালী গ্রামে আমাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার হয়ে প্রথম যাই ঢাকা সেনট্রাল জেলে। তিন মাস পর কনফারম্ড্ রাজবন্দীরূপে স্থানান্তরিত হই বহরমপুর বন্দী শিবিরে। সেখানে বৎসরাধিক কাল নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন কাটাবার পর আমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো আবার আমাদের গ্রামের বাড়ীতে। হলাম স্বগৃহে অন্তরীণ। বছরখানেকের মধ্যেই আইনভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বিচারাধীন আসামীরূপে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো মুন্সীগঞ্জ সাব-জেলে। কিন্তু মামলা হলো না। গভর্ণমেণ্ট মামলা প্রত্যাহার করে আবার আমায় বাড়ীতেই পাঠিয়ে দিলেন অন্তরীণরূপে। প্রায় এক বৎসর থাকবার পর আবার হুকুম এল গ্রামে অন্তরীণের। হাজির হলাম গিয়ে সুদূর মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী নামক একটি গণ্ডগ্রামে। থানা প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজবন্দী কোয়ার্টার্সে বছরখানেক থাকবার পর আবার ফিরে এলাম ঢাকা সেনট্রাল জেলে। প্রথমে রাজবন্দী, তারপরই করা হলো বিচারাধীন আসামী। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী। স্থানান্তরিত হলাম আবার সেই মুন্সীগঞ্জ সাব-জেলে। সেবার ছিল অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অভিযোগ, এবার ভারতীয় দণ্ডবিধির বাছা বাছা মারাত্মক গোটাকয়েক ধারার চার্জ্জশীট! ডাকাতি, নরহত্যা, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম!······স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তৃতীয় শ্রেণীর

কয়েদীরূপে ফিরে এলাম ঢাকা সেনট্রাল জেলে। আন্দামানে স্থানান্তরেরই তোড়জোড় চলছিল, এমন সময় হাইকোর্ট বে-কসুর মুক্তির আদেশ দিলেন!

কিন্তু মুক্তি পাওয়া গেল না। জেলের গেটেই আবার রাজবন্দীর তক্‌মা এঁটে রাজবন্দী ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেখানেও বেশীদিন থাকা গেল না। কয়েক মাস পরই আমায় স্থানান্তরিত করা হলো এবার উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলার খানসামা নামক একটি গণ্ডগ্রামে। আবার সেই গ্রামে অন্তরীণ। এখানেও অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে স্থানান্তরিত হলাম ঠাকুরগাঁ সাব-জেলে। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের মতো এখানেও মামলা চালালেন না গভর্ণমেন্ট; তাই আবার ফিরে এলাম সেই খানসামা থানায়।

কিন্তু এবার আর বেশী দিন থাকা গেল না। কয়েক মাস পরই যেতে হলো ঐ জেলারই হরিপুর থানায়, তার কয়েক মাস পর ফুলবাড়ী থানায় এবং তার কয়েক মাস পর ঐ ফুলবাড়ী থেকেই বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করি ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে।

এমনি ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে আমার বন্দীজীবনে যেমন একঘেয়েমি কদাপি অনুপ্রবেশের পথ পায়নি, তেমনি নতুন নতুন স্থানে, নতুন পরিবেশে অনেক নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘটেছে সাক্ষাৎ, হয়েছে পরিচয়, স্থাপিত হয়েছে অন্তরঙ্গতা। তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একান্ত সাময়িকভাবে হলেও যেন কতকটা জড়িয়ে পড়েছি!

আজও তাঁদের কারুর কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হলেও অনেককেই আমার মনে নেই, হয়তো তাঁরাও আমায় ভুলে গেছেন। .....

এবার দ্বিতীয় কারণ, যার ফলে আমার বন্দীজীবন সর্ব্বদাই ছিল ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যময়—তাই বর্ণনা করছি।

যেখানেই গেছি, সেখানেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। তা তিনি জেলের কর্ত্তাই হোন্ বা থানার দারোগাই হোন্। স্বগৃহে অন্তরীণের সময়ে লেগে গেল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ঠোকাঠুকি। স্থানান্তরের পথে সঙ্গী আই বি অফিসারের সঙ্গে। এমনি সর্ব্বত্র। কখনো অল্পেতেই মিটে গেছে বিবাদ, কখনো হয়তো অত সহজে না মিটলেও বেশী দূর গড়ায়নি। কথা বা মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে থেমে রয়েছে। কখনো-বা বেশ মারাত্মক হয়ে উঠেছে সামান্য ঝগড়া। এমনি মারাত্মক যে অবশেষে তদন্ত করবার জন্য সরকারীভাবে নিযুক্ত হয়ে এসেছেন উচ্চতর কোনো অফিসার। তাতেও হয়তো মেটেনি।

গভর্ণমেন্ট আমায় মনে করতেন, Very troublesome Detenu অর্থাৎ অত্যন্ত ঝঞ্ঝাটে রাজবন্দী। একটি জায়গাতেও একটি অফিসারের সঙ্গেও মিলে মিশে তো দূরের কথা, ঝগড়া না বাধিয়ে থাকতে পারে না।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়। কারণটাও খুব স্পষ্ট। কারণ, আমার বন্দীজীবনে প্রায় সর্ব্বত্র এমনি সব সরকারী অফিসারের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয়েছে, যাঁদের বলা যায় হুকুমের চাকর। দেশকে সহস্রমুখে শোষণ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশ সরকার যে সব অবমাননাকর ও নিপীড়নমূলক আইন বিধিবদ্ধ করতেন, জেলের সুপারিনটেনডেন্ট বা জেলার অথবা থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জকে দেখেছি সেই সব আইনের নির্দ্দেশ উৎকট নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে। শুধু নির্দ্দেশ কেন, জ্যামিতিক অনুসিদ্ধান্তের মতো প্রদত্ত নির্দ্দেশের সুবিধেমতো যতরকম ব্যাখ্যা করা যায়, যতখানি ইলাস্টিক করে তা স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করা যায়, তা করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করতেন না তাঁরা। অনেক সময় শোভনতা ও শালীনতাও বিসর্জ্জন দিয়ে বসতেন। টুমটুমি শুনে বানর যেমন তালে তালে নৃত্য শুরু করে দেয়, হুকুম তামিল করবার ব্যাপারে এই সব অফিসারের তেমনি দাস-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছি। তাই, ঠোকাঠুকি অনিবার্য্য হয়ে পড়তো।

কিন্তু অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এর ব্যতিক্রমও দেখেছি। আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেও রাজবন্দীদের প্রতি ভদ্রতাসম্মত ও মানবোচিত আচরণ যে অসম্ভব নয়, তা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। আইনের দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন অক্ষুণ্ণ রেখেও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দীর অন্তরের প্রতিও দৃষ্টি প্রসারিত করতে চেষ্টা ছিল তাঁদের। এবং সে দৃষ্টিতে ছিল দরদ ও সহানুভূতি! তাই রাজ-বন্দীদের সাথে যেমন তাঁদের ছিল হৃদ্যতা, তেমনি সরকারী দপ্তরেও সু-প্রশাসক বলে তাঁদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। সংখ্যা তাঁদের যতই কম হোক্।

সত্য বলতে কি, এঁদের মধ্যেও কারুর কারুর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লাগতো। কি জানি ওটা ছাড়া বোধহয় থাকতে পারতাম না বেশী দিন। বোধহয় একঘেয়ে লাগতো। তাই, কারণ খুঁজে বেড়াতাম। হোক্ না সামান্য, কিন্তু তাকেও তুচ্ছ করতাম না। সামান্য থেকেই শুরু করে অবশেষে বেশ পাকিয়ে তুলতাম। ঠোকাঠুকি থেকে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে কলহ, কলহ থেকে তা এমনি রূপ নিত যে, কমপক্ষে আমায় স্থানান্তরিত করে গভর্ণমেণ্ট শাস্তি

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। সামান্য কারণও যদি না পাওয়া যেত, তাহলে কারণ সৃষ্টি করে নিতাম। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার মতো।

কি জানি, হয়তো সত্যিই আমি একজন ঝঞ্ঝাটে রাজবন্দী ছিলাম!……

গ্রেপ্তার হবার দিনটি থেকে স্বগৃহে অন্তরীণকালের খানিকটা পর্য্যন্ত আমার বন্দীজীবনের লোমহর্ষক বহু ঘটনা বিবৃত করেছি আমার 'চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তার পরবর্ত্তী বিবরণ দিচ্ছি।

আমি তখন স্বগৃহে অন্তরীণ। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে বহরমপুর বন্দী শিবির থেকে কেয়টখালীতে স্থানান্তরিত হয়ে আসবার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হয়েছে। এই একটি বৎসরের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার একাধিক বার ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে। সর্ব্বশেষে, মাসিক ভাতা মঞ্জুর করা নিয়ে যে ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছিল এবং শনৈঃ শৈনঃ যা একটা রীতিমতো সংঘর্ষে রূপান্তরিত হতে চলেছিল, সরকার কর্ত্তৃক অকস্মাৎ সেই ভাতা মঞ্জুর হয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ায় সেই অস্বস্তিকর অধ্যায়েরও ঘটেছে পরিসমাপ্তি। ক্ষীণ আশা জাগছিল মনে, আমার জন্য এমনিভাবে মাসিক দশ টাকা অপব্যয় গভর্ণমেণ্ট বেশী দিন বরদাস্ত করবেন না। আমিও স্থির করেছিলাম, ঠোকাঠুকিটা এবার এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করবো। হয়তো তাতে সরকারের মন ভিজতেও পারে!

কিন্তু ভাবলাম এক, হলো আর! এমনি গুড বয়্ হয়ে চলবার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করে, সত্য কথা বলতে কি, যখন মুক্তি আসন্ন মনে করে পুলকে রোমাঞ্চ জাগছিল, এমন সময় সেই সাজানো পম্পিয়াই নগরী কি ভাবে বিসুভিয়সের উদগীরিত লাভা স্রোতে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল, তারই বর্ণনা করছি।—

একদিন ভোর না হতেই গোরা সৈন্যের একটি দলসহ প্রায় পঞ্চাশ জন লাল-পাগড়ি পুলিশ এসে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেললো। শ্রীনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ তখন কলিমদ্দীন সরকার। কিন্তু তিনি আসেননি, এসেছেন এদের সঙ্গে নতুন একজন দারোগা, চিনিনে তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কোন্ থানার?

ধমক দিয়ে জবাব এল: তা দিয়ে আপনার দরকার কি? এখন যা বলি, তাই করুন।

চুপ করে গেলাম তীক্ষ্ণ মেজাজ দেখে। মনে মনে হাসিও পেল। আই বি কলিমদ্দীনকে পাঠায়নি, পাছে শ্রীনগর থানার দারোগা তাঁরই এলাকার রাজবন্দী বলে কিছু খাতির করে বসেন, তল্লাশীর কড়াকড়ি হ্রাস করে দেন। তাই এবার পাঠিয়েছে ভিন্ন থানার কড়া মেজাজের লোক।

গোরা সৈন্যেরা আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের আমগাছগুলির নীচে অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে সামরিক রাইফেল, সঙ্গীন চড়ানো। একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পোশাক পরা। যেন সংগ্রাম করতেই বেরিয়েছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কঠিনতম শত্রুর সঙ্গে! ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলের ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুর্ব্বোধ্য ইংরেজীতে নিজেদের মধ্যে কথা কইছে, একবর্ণও তার বোঝা দুষ্কর। ওদের যিনি কমাণ্ডাণ্ট, দেখলাম একটি হাণ্টারের মাথায় আঁটা কেমন একটা ইস্পাতের পাত প্রসারিত করে নিয়ে দিব্যি তার ওপর বসে সিগারেট ধরিয়েছেন। তল্লাশীর সঙ্গে যেন এদের সম্পর্ক নেই কিছু।

দারোগাবাবুর বোধহয় ভালো লাগলো না তা। তাড়াতাড়ি এসে কমাণ্ডাণ্টের কানে কানে কী যেন বলতেই কমাণ্ডান্ট অকস্মাৎ সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সামরিক আদেশ উচ্চারণ করে ওদেরকে আমাদের সমগ্র বাড়ীখানা বেষ্টন করে দাঁড় করিয়ে দিল। বোধ হয় দারোগার ধারণা আমাদের বাড়ীর বোমা ও রিভলভার কারখানার শ্রমিকেরা খিড়কির দ্বারপথে অথবা টিনের দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে পারে।

তারপর শুরু হলো স্মরণীয় তল্লাশী। সাদা পোশাকে আই বি-র যে লোকটি এসেছেন এই অভিযানকারী দলের সঙ্গে, তিনি অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে হস্ত ইশারায় আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর এদিক্ ওদিক্ ভালো করে দেখে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন: কিছু থাকে তো বলুন। আমি ওদেরকে অন্য দিকে তল্লাশী করতে নিয়ে যাই, এই অবসরে সরিয়ে ফেলুন আপনি, নইলে পুকুরেই দিন না ফেলে।

চমকে উঠলাম শুভানুধ্যায়ীর নিঃস্বার্থ উপদেশের জন্য। চোখের দৃষ্টিতে যেন দেখতে পেলাম, গোখরো সাপের হাসি। কিন্তু অর্ব্বাচীন জানে না যে, অভিনয়ে আমিও বড় কম যাই না। বললাম: কিচ্ছু নেই।

লোকটা কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে দিল, বললো: মশাই, সরকারী নিমক খেয়েছি, বলা নিষেধ; তবুও বলে দিচ্ছি আপনাকে, যাদের আপনি বন্ধু মনে

করে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তারাই এবার সব ফাঁস করে দিয়েছে। তারা বলেছে যে, আপনার এখানে এসে ছেলেরা রিভলভার চালানো অভ্যেস করে। আড়িয়ল বিলের ফাঁকায় নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে শব্দ কেউ না শুনতে পায়। আরও বলে দিয়েছে যে, দেওভোগে বন্দুক চালিয়ে যারা পালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আপনিও ছিলেন। মতিলালের তো ফাঁসী হবেই, আপনারও কি হয় বলা যায় না।

ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলাম : দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—আমায় রক্ষা করবার জন্য আপনার এত উদ্বেগ কেন জানতে পারি কি ?

লোকটি জবাব দিল : ঐ তো, বিশ্বাস হবে না আপনাদের, ভাববেন যা বলি আমরা, সবই মিছে আর লোকের মন্দ ছাড়া ভালো করিনে কখনও।—বিশ্বাস করুন দ্বিজেনবাবু, একেবারে ধর্ম্মতঃ সত্যি কথা বলছি, আপনাকে দেখতে ঠিক আমার ছোট ভাইয়ের মতো। এই তো সেদিন মারা গেছে সে। ঠিক আপনারই মতো মাথায় ঘন চুল আর চশমা। আপনারই মতো স্বাস্থ্য।··· একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তারপর লোকটি আবার বললো : তাই চাকরির মায়া ত্যাগ করে বলে দিলাম আপনাকে, যদি থাকে কিছু, বলুন, আমি নিজেই সরিয়ে ফেলছি। আমায় ওরা সন্দেহ করতে পারে না।

আবেদনের ভাষা ও তা উচ্চারণের কৌশল এত নিখুঁত যে, সত্যিই কেউ সহজে সন্দেহ করবে না এবং সরল বিশ্বাসে গলা বাড়িয়ে দেবে এই ধারালো গিলোটিনে। আমি কিন্তু অতটা সরল নই।······তাই অর্থবোধক হাসিতে মুখখানা ভরে ফেলে শুধু বললাম : বলেছি তো, কিছুই নেই।

ওদিকে পুরোদমে চলছে তল্লাশী। জনকতক পুলিশ দক্ষিণের কোঠায় ঢুকে পড়েছে। পূব দিকের দেয়ালে যে মোটা ফাটল দেখা দিয়েছে, লাঠি দিয়ে ওরা তার মধ্যেও খুঁচিয়ে দেখছে। বিছানাপত্র টেনে নামিয়েছে মেঝের ওপর, তারপর বালিশ ও তোশক মুচড়ে মুচড়ে দেখছে তুলোর মধ্যে কিছু লুকিয়ে রেখেছি কি না।

উত্তরের কোঠায় যারা ঢুকেছে, তারা পড়ে গেছে ফাঁপরে। এই ঘরে আছে গোটা ত্রিশেক ছোট বড় নানা সাইজের ট্রাঙ্ক, দুটো বাসন-কোসন ভর্ত্তি কাঠের সিন্দুক, একটি প্রকাণ্ড লোহার জাল দিয়ে ঘেরা আলমারি, চারখানা দেরাজের আর একটি আলমারি, একটি বড় মিট্ সেফ, গোটা কয়েক স্যুটকেস

এবং আরো মালপত্র। মাথার ওপর ঝুলছে কাপড় দিয়ে প্যাক করা গোটা দশেক লেপের বিরাটকায় বাণ্ডিল। হিন্দুস্থানী মগজ এসব দেখে একেবারে গুলিয়ে গেছে। এ কেয়া তাজ্জব বাত হ্যায়!……

এর পর একখানা দোতলা টিনের ঘর, তারপর রান্নাঘর, তারপর দক্ষিণের চারচালা টিনের ঘর…সব শেষে ওরা এল বাড়ীর পুব দিকের পরিত্যক্ত আমাদের শরিক গাঙ্গুলীদের বাড়ীর জঙ্গলে ভরা প্রাঙ্গণে। কোদালি চালাতে লাগলো জনচারেক সিপাই।

এসবে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, উদ্বেগও ছিল না একবিন্দুও। কারণ সেদিন যা কিছু আপত্তিজনক ছিল আমার ওখানে, তার হদিস পাওয়া ওদের কর্ম্ম নয়।

ঘন্টা চারেক তল্লাশীর পর একেবারে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই অপরিচিত দারোগাপুঙ্গব যখন আবার আমার ঘরের টেবিলে এসে বসে দীর্ঘ তালিকায় ক্রস চিহ্ন দিতে লাগলেন, তখন ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞেস করলাম: পেলেন কিছু?

কী করে পাবো? সরিয়ে ফেললে সব আর পাবো কী করে?—তারপরই বোধ হয় পৌরুষে ঘা লাগলো শ্রীমানের! কপালে কুঞ্চনরেখা ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করলো: ঠাট্টা করছেন বুঝি?

বললাম: না, না, ঠাট্টা করবো কেন? আপনার খুব পরিশ্রম হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। চা খাবেন? এই রঙ্গলাল, একটু চা করতে বল রে হেনাকে। দারোগাবাবুকে—

Shut up—অকস্মাৎ গর্জ্জন করে উঠলো দারোগা, বললো: চালাকির আর জায়গা পাওনা, না?—বলেই সে ঘরের বাইরে চলে এল। আমিও বাইরে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম: কী বলছিস তুই?

দারোগা বললো: যাও, ঘর থেকে গোটাকতক চেয়ার বাইরে এনে দাও, এঁরা সব বসবেন।—বলে সে ঐ গোরা সৈন্যদের দেখিয়ে দিল। ওরা সবাই আবার এসে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়।

বললাম: সেজন্য গভর্ণমেন্ট তোকেই তো চাকর রেখেছে। শুধু বসতে দিবি নয়, ওদের জুতোয় কালি লাগিয়ে ব্রাশ করে দিবি। ব্যাটা ছোটলোক কোথাকার!

Shut up !—আবার গর্জ্জন করে উঠলো দারোগা।

সহ্য হলো না আর। অত্যন্ত উত্তেজনার ক্ষেত্রেও আমার মাথা ভারী ঠাণ্ডা থাকে বলে সুনাম ছিল আমার। কিন্তু কেন জানিনে, আজ শুরু থেকেই এই দারোগাকে সহ্য করতে পারছিলাম না; এইবার তা চরমে উঠলো! এসে এক লাথি মেরে দিলাম দারোগার তলপেটে। দারোগার বিরাট বপু ধূলিশয্যা গ্রহণ করলো মহীরুহ পতনের মতো।

ছুটে এল লালপাগড়ির দল, ছুটে এল সাদা পোশাকপরিহিত আই বি-র লোক, ছুটে এল গোরা সৈন্যের কমাণ্ডান্ট, ছুটে এলেন বাবা ও মা, রঙ্গলাল ও বোন হেনা, সংবাদ পেয়ে ছুটে এল পাড়াপড়শী, কাকা ও কাকীমারা, এমন কি, রেণুও। সংজ্ঞাহারা ধরাশায়ী দারোগাকে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো। মারাত্মক কাণ্ড একটা কিছু ঘটবেই। বাবা বলে উঠলেন: এ কি রে?

মা বলে উঠলেন: এ কী কাণ্ড করে বসলি তুই?

কাঁদো কাঁদো স্বরে রেণু বলে উঠলো: তুমি শেষটায় খুন করে বসলে দাদা?

আমি শুধু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে বললাম রঙ্গলালকে: এক ঘটি জল নিয়ে আয় আর একখানা পাখা।

দুই

নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনারা, এর পরই গোরা সেনাদলের সর্দ্দার বিশ্রম্ভালাপ ত্যাগ করে স্বদেশের অবোধ্য কথ্য ভাষায় অকস্মাৎ জলদগম্ভীর স্বরে সামরিক আদেশ উচ্চারণ করলো :

Aim your—guns

Safety catch—forward

One round—fire

এবং তারপরই সেই বারোটি সামরিক রাইফেলের বারোটি তপ্ত সীসে এসে বিঁধলো আমার শরীরে, শরীর একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মুসোলিনীর মতো! কিন্তু তথাপি বেঁচে গেলাম রবার্ট ব্লেকের মতো অথবা মোহনের মতো। নইলে কি করে লেখা হবে রহস্য লহরী সিরিজ কিংবা মোহন সিরিজ? তাই নয় কি?

কিন্তু শুনে বিস্মিত হবেন আপনারা যে, আমার ন্যায় একজন সাধারণ যুবকের একটিমাত্র লাথি, তা সে যত প্রচণ্ডই হোক্ না কেন, তার ফলেই এমনি বিরাটকায় পুরুষটিকে একেবারে ধরাশায়ী হতে দেখে প্রথমটা গোরা সেনাদল চমকে উঠলো, তারপর চোখেমুখে ওদের ফুটে উঠলো সহাস্য কৌতুক, তারপর অকস্মাৎ ওদের দলপতি আমার কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অবোধ্য কথ্যভাষায় একখানা গানই ধরে ফেললো, ট্রা-লা-লা-লা, ট্রা-লা-লা-লা……

দারোগাবাবুর ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। প্যান্টের ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি একখানা রুমাল বার করে মুখমণ্ডল সম্মার্জ্জনা করছেন। আড়চোখে একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আমার প্রতি চকিতে নিক্ষিপ্ত রবিনহুডের তীরের মতো, কিন্তু নীলকণ্ঠের মতো আমার মনে সে তীরের বিষ ক্ষণিকের তরে শুধু একটা রংয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলো মাত্র, বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না!

নিশ্চিত ছিলাম যে, দেওভোগের ঘটনার পরেই যখন হানা দিয়েছে পুলিশ, গ্রেপ্তার তখন আমায় করবেই। কিন্তু কত আশা ও কত রঙীন পরিকল্পনা

নিয়ে শোভাযাত্রা করে যেমন এসেছিল দারোগা, আই বি, পুলিশ ও গোরা সেনার দল, তেমনি শোভাযাত্রা করেই বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা গভীর হতাশ্বাসে ভাঙ্গা বুক নিয়ে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই দক্ষিণের ঘরের ঢেউ-তোলা টিনের বেড়ার ওপর খবরের কাগজ সেঁটে আমি যে পুরু কাগজের দ্বিতীয় দেয়াল তৈরী করে রেখেছিলাম, তার নির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে ব্লেড চালিয়ে খানিকটে ফাঁক করে দিতেই ভেতরে একটি ক্ষুদ্র খোপর দেখা গেল। সাবধানে রিভলভারটি বার করে রঙ্গলালের হাতে দিয়ে বলে দিলাম ওটা সুহাসিনীর হাতে গোপনে দিয়ে আসতে।

রঙ্গলাল বেরিয়ে গেল। মনে হলো, ঢাকার আই বি ওদের কর্ত্তাদের কাছে তীব্র তিরস্কার খেয়ে হয়তো আবার একদিন এসে আমায় নিয়ে যাবে। কে জানে, ওদের সে প্রত্যাগমন পরদিনও সম্ভব হতে পারে, তাই নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আশায় কালবিলম্ব করা সমীচীন মনে হলো না!

সুহাসিনী প্রসঙ্গে যখন এসেই পড়েছি, তখন তার অধ্যায়টি বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাড়ার জ্ঞাতি-কাকাদের অন্যতম মণিমোহন চক্রবর্ত্তী। ঢাকা শহরে মোক্তারী করেন। অর্থাগম যে তাতে কী পরিমাণ হয়ে থাকে, সঠিক তা না জানতে পারলেও কাকীমা ও তাঁর ডজনখানেক বাচ্চাকাচ্চার জীবনধারণের মান ও প্রণালী দেখেই তার শোচনীয়তা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যেত। আইনের অবোধ্য জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর শ্লেষ্মাজড়িত উচ্চকণ্ঠের ধারাবাহিক বক্তৃতায় মণিকাকার সান্ধ্য মজলিস সরগরম হয়ে উঠলেও আমার অজানিত ছিল না যে, প্রায়ই তাঁর ভাতের হাঁড়ির মধ্যে চলতো ছুঁচোর অহোরাত্রি জলসা, সঙ্গীত ও নৃত্য! ঢাকা শহরে বাস করতেন তিনি তাঁর কোন্ দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার বাড়ীতে এবং প্রায় রবিবারেই এসে কাটিয়ে যেতেন কেয়টখালীর পারিবারিক হাটে। শক্তি ছিল তাঁর একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, সামর্থ্য ছিল শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ, তবুও বহু ব্যক্তি ও সমাজহিতকর কাজে দেখেছি তাঁকে একেবারে নির্ব্বোধের মতো সবার আগে এগিয়ে আসতে। মামলায় পরাজয়ের চুন-কালি গালে মেখে এসেও শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে ও ওজস্বিনী ভাষায় এমনিভাবে ঘটনার বিবরণ দিতেন যে, মনে হতো যেন প্রতিপক্ষের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে, মণিকাকার অব্যর্থ গুলী নেহাৎ কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে, নইলে······ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই মোক্তার মণিমোহনেরই জ্যেষ্ঠা কন্যা সুহাসিনী। বছরখানেক হলো মানিকগঞ্জে বিয়ে হয়েছে কোন্ এক যুবক মুহুরীর সঙ্গে। তাকে সুহাসিনীর মনে ধরেনি। ডিংসাই শ্রোত্রীয় কুলমর্য্যাদা এক তিলও ক্ষুণ্ণ না করে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঅমুকচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ন্যায়রত্ন, বেদান্তশাস্ত্রী, সার্ব্বভৌমের প্রপৌত্রং-এর সঙ্গে বৈশাখে মাসি শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি যে ধরাধামে কী অমর কীর্ত্তি রেখে গেলেন, সালঙ্কারে ও সবিস্তারে সেই পরম সত্য বর্ণনায় মণিকাকার শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠ যখন গমকে গমকে সপ্তমে উঠে বিলাস কাকার বৈঠকখানা উত্তপ্ত করে তুলছিল, ঠিক সেই সময়ই আমাদের নিরালা ছাদের এক কোণে বসে সুহাসিনী বিবাহিত জীবনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা বলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিলো আর ফুলবৌদি চেষ্টা করছিলেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। গ্রামের মেয়ে হলেও সুহাসিনী বহুবার ঢাকা শহরে গেছে ও বাবার কাছে বাস করেছে। গ্রামের মেয়ে স্কুলে কিছু লেখাপড়াও করেছে সে। চুল ফাঁপিয়ে তোলবার বিশেষ কৌশলটি এবং শরীর জড়িয়ে শাড়ী পরবার বিশেষ ধরনটি সে শহর থেকে আহরণ করে এনেছে। বয়সও হয়েছে তার দুরন্ত আঠারো! এমনি সময় যখন তার মনের সরোবরে কল্পনার বেলোয়ারী তরঙ্গ ময়ূরের মতো পেখম তুলে নৃত্য শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় এলো তার জীবনে মানিকগঞ্জ শহরের এক অখ্যাত মোক্তারের তেইশ বৎসর বয়স্ক মুহুরী, নোট বই হাতে করে ও পেন্সিল কানে গুঁজে যে শিকারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় আদালতের চারদিকে, গাছের তলায় তলায়। ফুলবৌদি বলেন, ওর স্বামী জুতো পায়ে দিতে পারে না ফোস্কা পড়ে বলে, সিনেমা দেখতে পারে না অশ্লীল বলে, আর দন্তধাবন করতে পারে না সময়াভাবে। এই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্মবীর মহাপুরুষটি কিশোরী স্ত্রীর নিদ্রিত শয্যার সন্নিধানে এসেও চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান, বড্ড বেশী স্পষ্ট মনে হয় সুহাসিনীকে। আলুথালু অসতর্ক আবরণ অনাবরণের চাইতেও মারাত্মক! যা অদৃশ্য, দৃশ্যমানের চাইতেও যেন তা বেশী প্রকট। তাই নিদ্রিত রূপকে অক্ষম স্বামী মনে করে অশ্লীল, অস্পৃশ্য। ডাইরেক্ট বৈদ্যুতিক কারেণ্ট, ছুঁলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে!……

নড়বড়ে হারমোনিয়ামে যেমন সুর তোলা যায় না প্রাণপণে হাওয়া দিয়েও, চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে দিলেও যেমন নিদ্রিত অশ্বের নিদ্রা আর ভাঙ্গা যায় না, ঠিক তেমনি উপর্য্যুপরি ব্যর্থকাম হয়ে নারী-জীবনের সর্ব্বসুখ ও

সর্ব্বশান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এসেছে সুহাসিনী অবশেষে গর্ব্বিত পিতার আলয়ে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে বিদ্যাহীনের মতো যে ছেলেটি আনাগোনা করতো, গ্রামের বারোয়ারীতলায় মানময়ী গার্লস স্কুলে মানসরূপে দেখা দিত পাদ-প্রদীপের সম্মুখে, খেলার মাঠে যার পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত বল গিয়ে ঠেকতো যেন একেবারে আকাশের নীলে, বিসূচিকা রোগাক্রান্তকে অনর্থক সারারাত নার্স করে ভোরবেলা আবার তাকে বহন করে গ্রামের শ্মশানে নিয়ে যেতে যে অগ্রগামী, সেই প্রিয় দেবরটি এসে স্থান করে নিল সুহাসিনীর মানস-মরুতে! প্রতিদিনকার অন্তরঙ্গতায় সেই মরুতেই ফুটে উঠলো একটি সুন্দর ওয়েসিস্! বিবাহিত জীবন যার দুস্তর এক সাহারায় পরিণত হয়েছে, উন্মুখ যৌবনের বিকশিত বসরাই গোলাপের মধুলোভী ভ্রমর যার জীবনে একটিবারও গুনগুনানি শুনিয়ে যায়নি, তৃষিত চাতকের মতো অকরুণ মেঘের প্রতি চেয়ে থেকে থেকে যার দিন কেটে যাচ্ছে, হাজারো হাত প্রসারিত করে সে যে ওয়েসিসের শ্যামলিমা গ্রাস করবার জন্য ধেয়ে যাবে, তাতে আর বিচিত্রতা কি?······

বুভুক্ষু কিরণময়ীর সম্মুখে থরে থরে সাজানো সুস্বাদু দিবাকরের অমৃত ব্যঞ্জন! অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভোজ্য দর্শনে লকলক করে জ্বলে উঠলো সুহাসিনীর অন্তরের আগুন!······

এখনও আসে গোপাল মাঝে মাঝে। দু'এক দিন থেকেও যায়। কাকীমা যে একেবারে টের পান না তা নয়, কিন্তু কন্যার ব্যর্থজীবনের দুঃখের কথা স্মরণ করে নলচে আড়াল দিয়ে অজ্ঞতার ভান করেন। এই সাইকোলজি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। দিনের আলোর মতো সত্য!······ফ্রয়েডি মনোবিকলন মনোবিকার বলে কে উড়িয়ে দিতে পারে?

এ সবই সুহাসিনী অকপটে বলেছে ফুলবৌদিকে, আর ফুলবৌদি সবই বলেছেন আমায়। আরও বলেছেন যে, গোপালও নাকি কোন্ স্বদেশী দলে কাজ করে। গোপনে সুহাসিনীর কাছে কখনো কখনো পিস্তল রেখে যায়, ছোরা রেখে যায়—আবার নিয়েও যায় এসে। আরও একদিন বললেন যে, কিছুদিন হলো গোপাল এসে একটা ছোট্ট সুটকেস রেখে গেছে। সুহাসিনী বলে তার মধ্যে নাকি গোটা দুই পিস্তল, অনেকগুলো কার্তুজ ও খানচারেক ছোরা আছে।

এর পর আরও একটা কথা ফুলবৌদি গোপনে বলেছেন আমায় যে, আমায়

নাকি খুব ভালো লেগেছে সুহাসিনীর। কিন্তু এগোতে সাহস পাচ্ছে না, কি জানি কিসের ভয়ে !……

ব্যস্, প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল। খসড়া নয়, একেবারে ব্লু প্রিন্ট। খরচ-খরচার এস্টিমেটও মনে মনে করা হয়ে গেল। এবার কাজ শুরু হোক্। স্থির করলাম, ভয় ওর ভাঙিয়ে দিতে হবে। সহজেই যে এগিয়ে আসা যায় আমার কাছে, কিছুক্ষণ বেশ হাসিঠাট্টাও করা যায়, আবার ফিরে আসবার সহাস্য অনুরোধও যে শোনা যেতে পারে আমার তরফ থেকে, এ সব আপাত-সত্য সমঝিয়ে দিতে হবে ওকে। অবশ্য এই সত্যের অভিনয়ে নিতে হবে আমায় প্রাণান্তকর ঝুঁকি তা জানতাম, তবুও সেই ছোট্ট সুটকেসের ভিতরকার দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলি দুর্নিবার বেগে আমায় আকর্ষণ করতে লাগলো।……

আকর্ষণ সুহাসিনী নয়, আকর্ষণ সেই সুটকেস। লক্ষ্য সুহাসিনীর প্রেম নয়, লক্ষ্য সেই সুটকেসের পিস্তল, কার্তুজ ও ছোরা। কার্যোদ্ধারের জন্য চরম পন্থা পারবো না গ্রহণ করতে ?……

সুহাসিনীর সঙ্গে আমার সহাস্য আলোচনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস মধ্যাহ্নে বসে একেবারে বাজে বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি, হাসি-পরিহাস, কাজে ও অকাজে দিনের মধ্যে অসংখ্যবার তার আমাদের বাড়ীতে আমারই ঘরে আগমন, এমনি সব রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের দ্রুতগতির মধ্য দিয়ে আমাদের দু'জনকার সম্পর্ক এমনি ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় করে ফেললাম যে, একদিন আমি একেবারে দুই আর দুয়ে চারের মতো বেশ উপলব্ধি করলাম, সুহাসিনী আমার প্রেমে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যিই প্রেমে পড়ে গেছে ! প্রেম বলতে কী স্থূল সম্পর্ক বুঝতো সে, তাও টের পেতে দেরি হলো না আমার। কিন্তু আমার মধ্যে তখন অভিনেতা দ্বিজেন গাঙ্গুলী জন্মলাভ করেছে এবং নিখুঁত অভিনয়ের পুরস্কার যে পাওয়া যাবে গোপালের সেই সুটকেসটি, এই সম্ভাবনাও সত্য হয়ে মনে গেঁথে গেছে। তাই অভিনেতা দ্বিজেন গাঙ্গুলী ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো জীবনের চরম সাফল্যের দিকে !……

যে রাত্রে সুহাসিনী সেই অমূল্য দ্রব্যগুলি বয়ে এনে আমার ঘরে এসে দিয়ে গিয়েছিল, আজও তা ভুলিনি। সেদিন ছিল হয় অমাবস্যা, কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তিথি। আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল ধূসর মেঘে। না ছিল বিদ্যুতের কোনো একটি চমক, না ছিল হাওয়ার মাতামাতি। কিন্তু আসন্ন ঝড়ের

ভয়াবহতা সেই গুমোটের মধ্যে দিয়েই যে প্রকট হয়ে উঠেছিল, দক্ষিণের ঘরের জানালার পাশে বসে বেশ উপলব্ধি করছিলাম তা। বোধহয় লিখতে চেষ্টা করছিলাম একটি কবিতা। কী কবিতা, আজ আর তা মনে পড়ে না। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত ফুলবৌদির দুষ্টুমির ফলে যে কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না রাইটিং প্যাডের কাগজে, তা আজও ভুলিনি।

রাত বারোটার পর আবার এলেন ফুলবৌদি।

কি গো কবি, আর কত পেন্সিল কামড়াবে? ঘড়ির কাঁটা তো আর তোমার অচল পেন্সিলের অপেক্ষা রাখে না। চেয়ে দেখ একবার।

প্রায় সাড়ে বারোটা। কিছু যায় আসে না তাতে। একটা সুন্দর কাব্যময় লাইন মাথায় এসেও পেন্সিলের সীসেয় কেন আসছে না? এখনই যদি সেটিকে জোরজবরদস্তি করে প্যাডের পাতার ওপর না সাজিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কে জানে কাল হয়তো সে পালিয়ে যাবে কোথায়, কোন্ আকাশের নীলে! সুতরাং—

বললাম: তা জানি। কিন্তু এটি শেষ না করে উঠতেও পারছি না। তুমি বার বার এসে বিরক্ত করছো কেন বল তো? তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?

সেটা আমার খুশী।—স্পষ্টভাবে জবাব দিলেন ফুলবৌদি।

আমি বললাম: আমারও খুশী আমি সারারাত জেগে লিখবো।

তবুও বৌদি বসে পড়লেন একেবারে টেবিলের ওপর আমার রাইটিং প্যাড চেপে। সিরিয়াস হয়ে বললেন: সারাদিন ছিলে না, সুহাসিনী অন্ততঃ দশবার এসেছিল তোমার খোঁজে।

কেন?

মুচকি হেসে বৌদি বললেন: কেন, তা তুমিই জান। কী দিয়ে যে ভুলিয়েছ, সারাদিন বেচারী পড়ে থাকে আমাদের এখানে আর তুমি না থাকলে একেবারে তোমার ঘরে। তোমার লেখা সুন্দর, তোমার কথা মিষ্টি, তোমার ঘরখানা কী সুন্দর গোছানো, তোমার সবই সুন্দর আর তুমি মানুষটি এত ভালো যে তার নাকি তুলনা নেই।

হেসে বললাম: তোমার তুলনা তুমি শ্যাম।

বৌদি বললেন: সত্যিই তাই। অন্ততঃ সুহাসিনী তাই মনে করে।—তারপর একটু থেমে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন: কিন্তু ওদিকে কদ্দূর? হলো কিছু ব্যবস্থা?

আমার অভিনয় কতখানি সাফল্যলাভ করেছে, জানালাম বৌদিকে। খুব শীগগিরই যে তার ক্লাইমেক্স আসছে, তাও জানাতে দ্বিধা করলাম না। কিন্তু তারপর যেই বললাম যে, ক্লাইমেক্সের পরই কালো ভারী যবনিকা ঝপ্ করে নেমে আসবে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে, তখনই বাধা দিলেন ফুলবৌদি ঃ পারা কঠিন। জোঁকের মতো ও তোমায় ধরেছে। পেট পুরে রক্ত না খেয়ে ছাড়বে বলে ভরসা করো না। আর দোষই বা কী দোব ওকে। বিয়ে দেবার সময় কাকার কি উচিত ছিল না উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বার করা? তুমিই বল—

বাধা দিলাম ঃ গ্যাখ বৌদি, এমনি বে-মানান বিয়ে আশেপাশে বহু আছে। অভিভাবক বিয়ে দেবার সময় আর সবই দেখেন, দেখেন না শুধু যার বিয়ে দিচ্ছেন, তাকে। ফলে, সারাটি জীবন ভুগতে হয় ঐ বে-মানান বিয়ের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, তাদেরকে। কিন্তু, এ ব্যাপারে সে সব কথা কেন বৌদি? স্রেফ্ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই তো এই অভিনয়, তাই সেই অভিনয়টি কেমন হচ্ছে, তাই বল!

হেসে বললেন বৌদি ঃ চমৎকার!

এবার ধমক দিলাম ঃ শীগগির যাবে কি না বল! আমার কবিতাটি একেবারে বরবাদ করে দিলে।

হেসে চলে গেলেন বৌদি আবারও আসবার ভয় দেখিয়ে। চেয়ে দেখলাম, রাত একটা বেজে গেছে। সেই মোলায়েম লাইনটি কোথায় পালিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। পেন্সিলের সীসেয় দূরের কথা, মগজের কোণেও আর উঁকিঝুঁকি মারছে না।···বাইরে চেয়ে দেখলাম, নিবিড় অন্ধকার। দক্ষিণের জানালা দিয়ে এবার ঝিরঝিরে হাওয়া ছেড়েছে। দূরে কোনো নৌকার মাঝি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে। ভাষা ঠিক বুঝতে না পারলেও মেঠো সুরটি ভারী মিষ্টি লাগছে! নিস্তব্ধ আমাদের বাড়ী, পাড়াটাও সুষুপ্ত,······কিন্তু সেই লাইনের একটি শব্দও কি মনে আসবে না?

—অকস্মাৎ মনে হলো কে যেন পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছে ছায়ার মতো। সহকর্ম্মীরা কেউ হতে পারে!···বিপদভঞ্জন? খগেন? সুবোধ?···না, কোনো স্পাই? শালা বোধহয় দেখতে এসেছে আমায়!...না কোনো চোর?···কিন্তু ঘরে জলছে আলো, জলজ্যান্ত বসে রয়েছি আমি জানালার পাশে—এমনি অবস্থায় চোর? এ কি সম্ভব?

—কিন্তু একটু পরেই সকল সন্দেহের নিরসন করে দিয়ে জানালার পাশে সহাস্যমুখে ছায়া এসে দাঁড়ালো—পাগলিনী সুহাসিনী। দরজা খুলে দিতে হলো। নিঃশব্দে ভেতরে এসে দাঁড়ালো শ্রীমতী। চেয়ে দেখলাম। সমস্ত শরীর সিক্ত, সিক্ত শাড়ী গায়ে লেপটে গেছে। মাথার সঙ্গে পাগড়ির মতো করে বাঁধা একখানা শুকনো শাড়ী, হাতে একটি বড় পিতলের কলসী। কলসী মেঝেতে রেখে পাগড়ি খুলে তার ভেতর থেকে বার করলো দুটো রিভলভার ও এক বাক্স কার্তুজ। টেবিলের ওপর রেখে বিজয়িনীর হাসিতে মুখখানা ভরে তুলে অনুচ্চকণ্ঠে বললো সুহাসিনী: কেমন, পারবো না দিতে? এইবার হলো তো?—দাও পুরস্কার।

একেবারে ঝুঁকে পড়লাম রিভলভার ও কার্তুজগুলির ওপর। সত্যিই রিভলভার এবং যত দূর বোঝা গেল তাজা রিভলভার। কার্তুজগুলি ঠিক ফিট্ করে।—যাক্, এতদিনে সত্যিকার সাফল্য লাভ সম্ভব হলো। প্রেমের অভিনয়ে এবার অনায়াসেই ছেদ টেনে দেয়া যেতে পারে!……সরিয়ে ফেলতে হবে কাল সকালেই, যাতে এর পর গোপালের তাগাদায় মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করে ফেললেও এই অমূল্য দ্রব্যগুলির আর ও সন্ধান না পায়। সত্যিই বলেছেন ফুলবৌদি, ও ছিনে জোঁক।

কিন্তু ছিনে জোঁক ইতিমধ্যেই তার সিক্ত শাড়ীখানা পরিবর্তন করে শুকনো শাড়ী ও ব্লাউজ পরে ফেলেছে এবং দেখলাম, নিঃশব্দ হাসিতে সারা মুখখানা প্রদীপ্ত করে তুলে আলগোছে এসে বসে পড়লো আমার সম্মুখে টেবিলের ওপর, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ফুলবৌদি যেখানে বসে কিছুক্ষণ জ্বালাতন করে গেছেন।

কী বলে যে শুরু করবো, সেটা আমায় আর ভাবতে হলো না। সুহাসিনী নিজেই বলে উঠলো: এত রাত অবধি বসে বসে কার কথা ভাবা হচ্ছিলো? সে সৌভাগ্যবতী কে জানতে পারি কি?

কাল হলে হয়তো অনায়াসে গদগদ স্বরে বলে দিতাম: সে তুমি গো, তুমি! আজ তার প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে গেলেও বুঝতে পারলাম, এখনই সবটা ওলট-পালট করে দেয়া সঙ্গত হবে না। রিভলভার যখন এসে পড়েছে হাতের মুঠোয়, তখন আর তা ফস্‌কে যাবার আশঙ্কা নেই। এবার অনায়াসে এই মেয়েটাকে একেবারে কুইক্ মার্চ্চ না করালেও এ্যাবাউট টার্ণ তো করিয়ে দিতে পারি। তাই স্বাভাবিক মিষ্টি সুরেই বললাম: কে যে নিজেকে সৌভাগ্যবতী

মনে করে, তা আমি কি করে জানবো বল? যেভাবে এসেছ তুমি, তোমার প্রশংসা না করে পারি না সু। কিন্তু কাকীমা যদি জেগে গিয়ে থাকেন, তাহলে? আর আমাদের বাড়ীতেও তো বৌদিরা বা মা-বাবা জাগতে পারেন, তাহলে?

তুষ্টু হাসিতে ভরে উঠলো সুহাসিনীর মুখ: তাহলে কী হবে শুনি?

তাহলে আমাদের দু'জনের ফাঁসি হবে, আর কী হবে। রাত দুপুরে জল সাঁতরে কি জন্যে তুমি আমার ঘরে এসেছ, তার যেমন কোনো কৈফিয়ত দিতে পারবে না তুমি, আমার পক্ষেও তেমনি—

কিন্তু আর কিছু বলা হলো না, একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো সুহাসিনী। ফুঁ দিয়ে ফস্ করে দিল আলোটি নিভিয়ে, তারপরই কানের কাছে কী সব মিষ্টি ভাষা উচ্চারণ করতে লাগলো আধো-আধো স্বরে, আজ আর তা মনে পড়ে না।

বুঝতে পারলাম, আজ আর নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছিলাম পুরস্কার আহরণের আশা নিয়ে। তা তো পেয়ে গেছি আজ। কিন্তু এ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ কোথায়? অভিমন্যুর মতো কি মৃত্যু অনিবার্য্য?···ইলেকট্রিক শক্ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তাই স্মরণ করলাম নাট্যাচার্য্য, নটসূর্য্য ও নটশেখরদের! বললাম মিহি সুরে দরদ মিশিয়ে: তুমি একটি বোকা মেয়ে। কাকের মতো চোখ বুজেই বুঝি মনে করছো কেউ আর দেখলো না তোমায়? জানো দেয়ালেরও কান আছে, অন্ধকারেরও আছে চোখ? ফুলবৌদি যদি একবার টের পেয়ে যান, তাহলে তোমার ঐ কলসীটা গলায় বেঁধে জলে নামতে হবে।

তা না হয় নামবো—দ্বিধাহীনভাবে জবাব দিল সুহাসিনী: তবুও তো মরবার আগে এই একটি রাত একেবারে নিজস্ব করে পাবো। অনেক দুঃখ ভুলে থাকতে পারবো তবু কিছুক্ষণের জন্য।

এবার মরিয়া হয়ে বলতে লাগলাম: জানোই তো ভাই, সারাটি দিন আজ বাড়ীতে ছিলাম না! ভীষণ খাটুনি গেছে। তারপর লিখতে বসেছি জরুরী একখানা চিঠি। লিখতেই হবে আজ। রাত সাড়ে চারটেতে একটি ছেলে এসে নিয়ে যাবে চিঠিখানা। তাই—

সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ অসম্মতি প্রকাশ করলো এবং সহজভাবে বুঝিয়ে দিল যে, সুযোগ জীবনে অনেকবার আসে না। হাল আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম

কিন্তু নাট্যাচার্য্য ও নটশেখরদের কৃপায় ক্রমেই যেন আবার পানি পেতে লাগলাম। ঝড়ের দাপাদাপি কমে এল, কমে এল বৃষ্টির তোড়, পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউগুলিও যেন শান্ত হয়ে এল। ছেঁড়া পাল জোড়া দিলাম, ভাঙ্গা হাল তুলে নিলাম, কৃতকার্য্যতার খুশীতে ছেড়ে দিলাম সপ্তডিঙ্গা মধুকর……বদর ! বদর !……

তারপর এক সময় ধীরে ধীরে অত্যন্ত আদর করে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে এলাম সুহাসিনীকে আগামী রাত্রির গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বললাম : কাল না এলে কিন্তু আড়ি, আড়ি, আড়ি !

কলসীটা উলটে দিয়ে বুকের নীচে চেপে সোনার মতো ভেসে রইল সুহাসিনী। বললাম : কাল পরবে তুমি সেই গোলাপী শাড়ীখানি, খোঁপায় গুঁজে আসবে ফুলের মালা, সুন্দরতর করে তুলবে তোমার সুন্দর দেহখানি, তারপর চলবে আমাদের অফুরন্ত গল্প সারাটি রজনী···

কিন্তু আরব্যোপন্যাসের সেই সহস্র রজনীর একটিও আর এলো না আমার জীবনে !

তিন

সে যুগে গুপ্ত সমিতির সদস্য সংগ্রহের প্রথম পন্থা ছিল বই পড়ানো। সিনেমার প্রকোপ সে যুগে তত তীব্র না হলেও উপন্যাসের ভিড় কম ছিল না। চুরি করে, লুকিয়ে উপন্যাস পাঠ, তার প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের ভাষা কণ্ঠস্থ করা এবং প্রেম আদান-প্রদানের রীতি অনুকরণ, সে যুগের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও এই কদভ্যাস এসে গিয়েছিল। তাই সর্ব্বপ্রথম আমরা এই কদভ্যাসটি পাল্টাবার দিকে মনোনিবেশ করতাম। ভালো ভালো বই দেয়া হতো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, বিবেকানন্দ বাণী, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও অর্জ্জনের লোমহর্ষণ কাহিনী, ভারতবর্ষের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, আনন্দমঠ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, দেশবিদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদদের অমর জীবনী—এমনি ধরনের বই পড়তে দেয়া হতো। শুধু পড়া নয়, রীতিমতো অধ্যয়ন এবং শুধু অধ্যয়ন নয়, তা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক ও তা ভিত্তি করে প্রবন্ধ রচনা চলতো। গীতার ক্লাস হতো। ফলে, উপন্যাসের পঙ্কিল পরিণামের পাষাণ চত্বরে ফাটল দেখা দিত। পাঠকের মনে জাগতো আলোড়ন ও প্রশ্ন: কোন্‌টা ভালো? পথ কি? কে বড়? কর্ত্তব্য কি?… এই সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো না। জবাব সে নিজেই সংগ্রহ করবে অনুসন্ধান করে।

এই ধরনের গ্রন্থপাঠের ফলে পাঠকের মনে জাগতো আলোড়ন, ক্রমে সে আলোড়ন সেখানে ঝড় তুলতো, ঘূর্ণি ঝড়—নীচের ধূলাবালি, খড়কুটো সব উড়িয়ে নিয়ে যেত আকাশের নীলে, নীচে দেখা দিত ঝকঝকে তকতকে নিষ্পাপ মন। এমনিভাবে পাঠকের মনে জন্মলাভ করতো আর একটি বিপ্লবী। মন আগে তৈরী করা হতো, মজবুত মন। মন তৈরী হয়ে গেলে পাঠানো হতো তাকে হয়তো কোনো কাজে—ডাক লুণ্ঠনে, ডাকাতিতে বা কারুর ওপর চরম শাস্তি হানবার ব্যাপারে। একেবারে আসরে তাকে নামতে দেয়া হতো না প্রথম প্রথম, একটু দূরে রাখা হতো, প্ল্যান করেই অথচ তাকে বুঝতে না দিয়ে। তারপর কাজের দ্বারা সে তার স্থান করে নিত। হয়তো অতি দ্রুত সে পরিচালকের সমকক্ষ হয়ে উঠতো কিংবা হয়তো নেমে যেত নীচে, আরও

নীচে !—এর পর একবার আই বি বা এস বি অফিসে দিন পনেরো হাজতবাস করে এলেই সে হয়ে পড়তো একেবারে বয়লারপ্রুফ্ !···

আর একটা পন্থা অবলম্বন করা হতো সে যুগে সদস্য সংগ্রহের জন্য। দলের চতুর কোনো একটি ছেলেকে স্থানান্তর সার্টিফিকেট নিয়ে বার বার স্কুল পরিবর্ত্তন করানো হতো আর কোনো বৎসরই তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হতো না। স্কুল থেকে স্কুলে সে বিপ্লবমন্ত্র ছড়িয়ে যেত আর পরীক্ষা না দেবার ফলে প্রতি বৎসরই তার ক্লাসে এসে পড়তো নতুন নতুন ছাত্র।

আমাদের সুবোধ চক্রবর্ত্তীকেও এমনিভাবে বার বার স্কুল পরিবর্ত্তন করানো হয়েছিল এবং বার বারই বাৎসরিক পরীক্ষার সময় তার অসুখ হতো !

কিছুদিন ধরেই আমি অভাব অনুভব করছিলাম বইয়ের, জাতীয়তামূলক বা আমাদের প্রয়োজনমতো গ্রন্থের। এই বইয়ের অভাবে বহু স্থানে আমাদের কাজে বাধা পড়তে লাগল। যেগুলো ছিল তাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়েও চাহিদা মেটানো সম্ভব হলো না। অনেকগুলো কেন্দ্র থেকেই সংবাদ আসতে লাগলো, বইয়ের অভাবে তাদের কাজে অসুবিধে হচ্ছে। বই পড়তে নেবার ব্যাপারে অনেকগুলো নিয়ম করা হলো, কড়া নিয়ম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একসময় মনে হতে লাগলো, এই বইয়ের প্রয়োজন অবিলম্বে না মেটাবার ব্যবস্থা করলে সংগঠনের সমগ্র কাঠামোটাই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং—

এক অন্ধকার রজনীতে যাত্রা করলো আমাদের অভিযানকারী ক্ষুদ্র দলটি। রাত তখন অনেক। কারুরই জেগে থাকবার কথা নয়। অন্ধকার রাত্রি গাছ-পালা ও ঝোপ-ঝাপের দঙ্গলে আরো অন্ধকার মনে হয়। আমাদের গ্রামের মুসলমান চাষীরাও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

পূবপাড়া ছাড়িয়ে আমরা রওনা হলাম ডানদিকে বীরতারা অভিমুখে। সামরিক আদবকায়দা আমি প্রবর্ত্তন করে চলতাম প্রায় প্রতি কাজেই। তাই চলেছি আমরা ফাইলে—একের পশ্চাতে অপরে। পুরোভাগে চলেছে দীর্ঘদেহ খগেন হাতে নিয়ে একটি দীর্ঘ লৌহখণ্ড। তার পশ্চাতে রঙ্গলাল। সাপের মতো অন্ধকারে সে দেখতে পায়। চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারে তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনভিপ্রেত কিছু দেখতে পেলেই সে স্পর্শ করবে সম্মুখের খগেনকে আর পশ্চাতের অনাথকে। অনাথ স্পর্শ করবে নেপালকে, নেপাল স্পর্শ করবে সুবোধকে। এমনি করে স্পর্শের মধ্য দিয়ে ঐ সঙ্কেত এসে পৌছোবে লাইনের

একেবারে পশ্চাতে আমার কাছে। ততক্ষণে থেমে গেছে সবাই। অপেক্ষা করছে দলপতির আদেশের। আমি তৎক্ষণাৎ ত্রস্তপদে বেরিয়ে আসবো রঙ্গলালের কাছে। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে নেব সংক্ষেপে, তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো নিজের মনে এবং তারপরই অনুচ্চস্বরে জানিয়ে দেব আমার আদেশ রঙ্গলালকে।...মুহূর্ত্ত পরে দেখা যাবে আমাদের দলটি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে বা পাটক্ষেতের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের অধিনায়কের মতোই আমার স্থান দলের পুরোভাগে নয়, পশ্চাতে। ওয়ারলেসে সংবাদ আদান-প্রদানের মতোই সহকর্ম্মীরা প্রয়োজনবোধে সংবাদ পাঠাতো আমার কাছে এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যেতো আমার সিদ্ধান্ত। রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের অধিনায়কের মতোই বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করবার রীতি ছিল না।

রাত প্রায় একটার সময় আমরা এসে পৌঁছোলাম সিংপাড়া বাজারের পশ্চিম দিকের বড় কাঠের পোলটার নীচে। শ্রীনগর থেকে মুন্সীগঞ্জগামী উঁচু সড়কের ওপর এই পোলটি। নীচে তখন আর জল নেই। তাই নীচের অন্ধকারে আমরা নিশ্চিন্তে জড়ো হলাম।

এইবার আমাদের এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল ব্যক্ত করা হবে। যারা এসেছে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চুপি চুপি, তাদের মধ্যে একজনও জানে না কোথায় আমাদের যেতে হবে, কী আমাদের করতে হবে, সে কাজের ঝুঁকি কতখানি এবং এ কথাটিও জানে না তারা যে, কাজের শেষে আবার তারা সুস্থদেহে চুপি চুপি বাড়ীতে ফিরে আসতে পারবে কি না! একেবারে অনিশ্চিতভাবে তারা যাত্রা করে। ঠিক যে সময় তাদেরকে কাজের খবরটি জানানো দরকার, ঠিক সেই সময় তা জানানো হয়।...এমনিই ছিল গুপ্ত সমিতির গোপনতা।

কাজের হদিস পেলো সবাই। কীভাবে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে, তাও দ্রুত স্থির করা হলো। তারপর সাবধানে এগিয়ে চললাম আমরা পূব দিকে বাজারের পশ্চাতে বেলতলা হাই স্কুলভবনের দিকে।

লাইব্রেরী চিনে নিতে দেরি হলো না। যাকে যেখানে পোস্ট করা দরকার, তেমনিভাবে ব্যবস্থা করে রঙ্গলাল এসে জানালো আমায়, সব রেডি। সুবোধ পূর্ব্বেই লাইব্রেরী ঘরের নম্বরী তালার চাবিটি সংগ্রহ করে এনেছিল। বেশ মোটা ও মজবুত তালা একেবারে সুবোধ বালকের মতো খুলে গেল। ভেতরে

প্রবেশ করলাম বিপদভঞ্জন, সুবোধ, খগেন ও আমি। ঠিক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো রঙ্গলাল।

টর্চ্চ জ্বালিয়ে দেখা গেল, অনেকগুলি কাঁচের আলমারি ভর্ত্তি থরে থরে সাজানো গ্রন্থ। এক ঘুষিতেই কাঁচ ভেঙ্গে ফেলা যায়, কিন্তু শব্দ করা সঙ্গত হবে না। তাই আবার চাবির সাহায্য নিতে হলো এবং এবারও আশ্চর্য্য, প্রত্যেকটি আলমারি অনায়াসে খুলে গেল। প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর বইগুলো ছড়িয়ে ফেলে বাছাই শুরু হলো এবং বাছাই-করা বইগুলো বিভিন্ন থলিতে পুরে ফেলা হলো।

একেবারে যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। নিশ্চিন্তে, কারণ বাইরে সতর্ক প্রহরা আছে! সময়মতো সঙ্কেত পাবোই!

ক্যাশবাক্সের মতো কালো টিনের একটা বাক্স দেখা যাচ্ছে একটি আলমারিতে। কোনো চাবিতেই কাজ হলো না দেখে যেই আমি বাটালি দিয়ে ওর ডালার নীচে চাড় দিতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়লো: ঠক্ ঠক্ ঠক্!

অর্থাৎ বিপদের সঙ্কেত! টর্চ্চ তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম পরবর্ত্তী সঙ্কেতের।

বাইরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাটি এমনি নিখুঁত যে, কখনও কোনো সময়েই বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ দেখা দেবার উপায় নেই। বাজার থেকে এসে যে রাস্তাটি লাইব্রেরী-গৃহের পশ্চিম ও উত্তর ঘুরে দূরে গ্রামের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই রাস্তার পাশে পাশে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে কালো রংয়ের চাদর জড়িয়ে একেবারে ঘাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে একজন এখানে আর একজন একটু তফাতে। কালো মজবুত সরু দড়ি তাদের পরস্পরকে সংযোজন করে এসে পৌছেছে লাইব্রেরী-গৃহের কিছুদূরে লুক্কায়িত অনাথের হাতে। আবার তার কাছ থেকে এমনি একটি সরু দড়ি এসে পৌছেছে একেবারে রঙ্গলালের হাতে। এই দড়ির সাহায্যে সেই একশো গজ দূরে পথের বাঁক থেকে সংবাদ এসে পৌছোচ্ছে অনাথের কাছে, অনাথ আবার তা পাঠিয়ে দিচ্ছে রঙ্গলালের কাছে আর রঙ্গলাল দরজায় টোকা দিয়ে বাইরের অবস্থা জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে আমাদেরকে।

এমনিভাবে বাজারের দিকেও পাহারায় রত আছে একজন এবং আর একজন

আছে দূরে দরওয়ানের ঘরের কাছে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আমরা জাল ছড়িয়ে বসেছি নিপুণভাবে। রুই-কাতলা তো দূরের কথা, সামান্য পুঁটি-ট্যাংরারও সাধ্য নেই সে জালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশের।

একটু পরই আবার শব্দ শোনা গেল। এবারের আঘাত দু'বার, খানিকটে নীরব থেকে আবার দু'বার। অর্থাৎ অল্ ক্লিয়ার। আবার কাজ শুরু হয়ে গেল। কালো বাক্সটা খুলে ফেললাম। পাওয়া গেল ওর মধ্যে কিছু স্বর্ণালঙ্কার, কিছু রূপোর টাকা ও একতাড়া নোট।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সুসম্পন্ন করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। সতর্ক পদক্ষেপে এসে আবার জমায়েৎ হলাম সেই কাঠের সেতুর নীচে। সামরিক কায়দায় এবার সবাই ফল্ ইন করে দাঁড়ালো। অনেকগুলো বই গোটাকয়েক পুঁটলি করে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। তথাপি—

কমাণ্ডার আদেশ করলেন: ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কেউ কিছু নিয়ে এসেছ কি?

মুহূর্তকাল সবাই নীরব। একটু পর সহসা ফল্ আউট করে বাইরে এসে দাঁড়ালো খগেন।

কি এনেছ?

অপরাধীর মতো জবাব দিল খগেন: কতকগুলো নিব আর খানকতক পোস্টকার্ড।

That's dangerous! আমাদের এই অভিযানের পশ্চাতে আছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য—দেশসেবা। বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, জীবনপণেও তা করতে এগিয়ে যাবো। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ বা সুবিধার জন্য যদি আমরা লালায়িত হয়ে উঠি, তাহলে সাধারণ চোর ডাকাতের সঙ্গে তফাৎ কোথায় আমাদের? Why did you steal away those things? Answer why?

এগিয়ে এল আমার অর্ডারলি—নেপাল। মাত্র পনেরো বছর বয়সের নেপাল। অত্যন্ত কচি মুখখানি, দেখলে মায়া হয়! আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো এ্যাটেন্‌শন্ হয়ে।

হাঁক দিলাম যথাসম্ভব নিম্নস্বরে: Speak out—I give you one minute's time.

শার্টের নীচে আমার যে রিভলভার আছে, এরা সবাই জানে এবং এ-ও

জানে যে, যে কোনো সময় তা ব্যবহারে দ্বিধা করবো না আমি এতটুকুও!··· আর নিজের হাতে তার প্রয়োজনও হবে না। নেপাল এগিয়ে এসেছে হুকুম তামিল করতে।

খগেনের কণ্ঠ শোনা গেল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীর মতো: আমার অপরাধ হয়ে গেছে, সে জন্য ক্ষমা চাইছি দাদা—

Search his person and search everybody—হুকুম উচ্চারিত হলো। নেপাল প্রত্যেকের দেহ তল্লাশী করলো। দেখা গেল, শুধু খগেনই খানকতক পোস্টকার্ড ও কয়েক বাক্স রেড ইংক নিব নিয়ে এসেছিল। ওগুলো এখানেই ফেলে দিলে হতো। কিন্তু যেখানে আমরা এসেছিলাম, দাঁড়িয়েছিলাম, কথা বলেছিলাম, সেখানকার সন্ধান দেবার কী প্রয়োজন আছে?···তাই নেপাল ওগুলো নিয়ে দ্রুত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে চলে গেল স্কুলের পশ্চিম দিকের খেলার মাঠে।

সে ফিরে এলে আবার যাত্রা করলো অভিযানকারী আমাদের ক্ষুদ্র দলটি বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে।

এমনি করে মালখানগর, রুসদী, ষোলোঘর, হাঁসাড়া প্রভৃতি গ্রামের স্কুল-লাইব্রেরীতে হানা দিয়ে অসংখ্য জাতীয়তা-প্রচারক গ্রন্থ সংগ্রহ করা হলো। সাবধানে ভেতরকার রবার স্ট্যাম্পগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলে দিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সেগুলো বণ্টন করে দেয়া হলো। কাজ চলতে লাগলো অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে।······

বইয়ের অভাব মিটে গেলেও যে অভাবটি বার বার কাঁটার মতো খচখচ করে আমার মনে বিঁধতো, সে হচ্ছে টাকার অভাব। যাকে বলা যায় সত্যিকার ধনী, তেমনি একজনও ছিল না আমাদের দলে। শুধু মধ্যবিত্ত নয়, এদের সবাইকে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা যায়। দু'একজন ছিল, যাদের অবস্থা স্বচ্ছল হলেও নগদ অর্থের প্রতিটি পাই আগলে রাখতেন যখের মতো তাদের অভিভাবক। ছেলের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মনোরম ব্যবস্থা করে দিয়ে অভিভাবক শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বদাই খুলে রাখতেন পাছে বাড়ীর তৃণগাছটি সে টেনে নিয়ে যায় গাঙ্গুলী-বাড়ীতে দ্বিজেন গাঙ্গুলীর কাছে! নেপাল ছিল এমনি অভিভাবকের অধীনে।

অত্যন্ত স্মার্ট যেমন, তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ। কার্য্যোদ্ধার করবার জন্য সে যে-কোনো ঝুঁকি নেবার জন্য এগিয়ে আসতো। সত্যি, এক-এক সময় আমার মনে হয়েছে, অবোধ বালক বুঝি উপলব্ধিই করতে পারে না বিপ্লবী দলের কর্ম্মপন্থা কতখানি ভয়াবহ! মায়া-মমতার সকরুণ আবেদন মাঝে মাঝে অন্তরাকাশে চিন্তার বাষ্প সৃষ্টি করলেও শরতের মেঘের মতোই তা মুহূর্ত্ত পরে কোথায় মিলিয়ে যেত!

কিন্তু টাকা? টাকা কোথায় পাই? সহকর্ম্মীরা যা সংগ্রহ করে এনে দিত ভিক্ষে করে বা ধার করে বা চুরি করে, খুব সামান্য না হলেও সমগ্র বিক্রমপুরের সংগঠনী কাজ চালাবার পক্ষে তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর! কী করা যায়? কী করা যেতে পারে?

বেশ ভালো করে ভেবে দেখলাম ডাকাতি করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ছেলেরা একবাক্যে সায় দিয়ে ফেললো। কোনো গৃহে চড়াও হয়ে লুণ্ঠন করবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মী ও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও সে সময় চারিদিক্ বিবেচনা করে তা যুক্তিসহ মনে হলো না। হ্যাঁ, ডাকাতি করতে হবে, কিন্তু তার মধ্যেও থাকবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা। কেউ কিছু টের পাবার পূর্ব্বেই কাজ হাসিল করতে হলে যে কূটবুদ্ধি ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, তাই প্রয়োগ করতে হবে। একটা কিছু করবার অধীর আগ্রহে সহকর্ম্মীরা যেন টগবগ করে ফুটছে! শুধু ঝুঁকি নয়, আত্মবলিদানের প্রতিশ্রুতি দিতেও তারা পশ্চাৎপদ নয় তা জানি। জানলেও দলপতি হিসেবে আমার নিশ্চয়ই নীতি হবে যথাসম্ভব কম বিপদের পথে এদের এগিয়ে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করা।

মশাল জ্বালিয়ে তরবারি, বল্লম ও গাদা বন্দুক নিয়ে বা খানকতক রামদা কাঁধে করে 'কালী মাইকি জয়' ধ্বনি করতে করতে দিক্ প্রতিধ্বনিত করে তুলে গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দিয়ে, প্রহার করে, হত্যা করে, গুলী চালিয়ে, বোমা ফাটিয়ে, সিন্দুক ভেঙ্গে ও মহিলাদের অঙ্গ থেকে টাকা ও গহনা সংগ্রহ করে আবার সপদদাপে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ার কাহিনী পাঠ করেছিলাম। শহরে ডাকাতির বিবরণীও অজানা ছিল না। হুস্ করে এসে একখানা জিপ থামলো বাড়ীর সম্মুখে, স্টেনগান হাতে ঝপাঝপ্ নেমে পড়লো ক'জন, chemical solution ঢেলে মুহূর্ত্তে খুলে ফেললো প্রকাণ্ড সিন্দুকের তালা, তারপর ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললো সব, তারপর যেমন হুস্ করে

এসেছিল তেমনি হুস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল জিপ, রাজপথের বাঁকে, যার number plate-এ লেখা একটি সংখ্যা, যা ঐ গাড়ীর নয়।

কিন্তু আমার পরিকল্পনা একেবারে অভিনব। সে যুগে একে একেবারে যুগান্তকারী বলা যায়! আয়োজনটি একেবারে শান্ত ও স্বাভাবিক, কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করবে না। যেমন নিঃশব্দে শুরু হবে কাজ, তেমনি সহজভাবেই তা শেষ হয়ে যাবে। ছোরাছুরি, বোমা-রিভলভার নেই, শুধু বুদ্ধির খেলা আর কব্জির জোর। নিরামিষ ডাকাতির মতো, জোর করতে হবে বটে, কিন্তু জবরদস্তি নেই। অনিবার্য্যভাবে হত্যা হয়তো একটা হয়ে যাবে, কিন্তু নীরবে ও নিঃশব্দে। অন্ধকারে গোখরো সাপের ছোবলের মতো! তথাপি রিজার্ভ ফোর্সের মতো নাগালের মধ্যেই থাকবে একটি সশস্ত্র দল, শুধু জরুরী অবস্থায় যাদের আহ্বান জানানো হবে। ওৎ পেতে থাকবে এরা নেকড়ে বাঘের মতো কিন্তু লম্ফ দেবে তখনই, যখনই আসবে ইঙ্গিত!......

শ্রীনগরের কাছাকাছি দেলভোগ নামে একটি গ্রাম আছে, সে গ্রামে আছে একটি গণিকাপাড়া। গণিকাদের সবাইকে পুলিশ চেনে, কারণ থানার খাতায় তাদের নামের তালিকা আছে। এই গণিকাদের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য করে থাকেন উর্ব্বশী, মেনকা বা রম্ভার মতো যিনি, তাঁর নাম চাঁপা। চাঁপার নামে মরা হাড়েও বিদ্যুৎ চকমকিয়ে ওঠে। নৃত্যে, সঙ্গীতে, আদর-আপ্যায়নে ও অতিথিসেবায় চাঁপা অতুলনীয়। শুধু গ্রামের খড়ো ঘরে বা টিনের চালে তার খ্যাতির দ্যুতি প্রদীপের মতো টিমটিম করে না, শহরের অনেক অট্টালিকার চার-পাঁচতলাতেই চাঁপার মোহনীয় পোট্রেট কার্ব্বন লাইট জ্বালিয়ে রাখে এবং সে শুধু ঢাকা শহরে নয়, কলকাতাতেও।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কৌশলে সংগ্রহ করে আনলো রঙ্গলাল আর তাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করলো বিপদভঞ্জন। দালালের মারফত রঙ্গলাল একেবারে গিয়ে হাজির হলো চাঁপার প্রকাণ্ড টিনের ঘরে, মেঝেয় বিছানো পুরু গদির ওপর বসে চাঁপার সঙ্গে দু'চার দিন খোশগল্পও সে করে এল। সঙ্গে চা ও মিষ্টি। বলে এল যে, চাঁপার নাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার বনেদী জমিদার হরিপ্রসন্ন দাসের একমাত্র পুত্র হরলালবাবুও শুনেছেন চাঁপার অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা। তিনি একবার পদধূলি দেবেন চাঁপার গৃহে। দিনচারেক থাকবেন। চাঁপার কর্ত্তব্য হবে এই চারটি দিন ও রাত শুধু হরলালবাবুর জন্য

রিজার্ভ করে রাখা। পান ও আহারের ব্যবস্থা এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর রাখতে হবে বটে, কিন্তু বেশী রাত পর্য্যন্ত নয়, কারণ হরলালবাবু চাঁপাকে একান্তে চান। বাবু সেই কলকাতা থেকে একা আসবেন গোপনে বাপকে লুকিয়ে, সুতরাং মিস্ চম্পকরাণী—বলতে বলতে রঙ্গলাল একেবারে মোসাহেবের অভিনয় করে এসেছে: স্যারের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেজন্য আপনি সব ব্যবস্থা করে রাখবেন কিন্তু।

চাঁপা মহা অপরাধিনীর মতো জিজ্ঞেস করেছিল: কিন্তু এখানে যে সব বাংলা—বিলিতি তো এখানে পাওয়া যায় না বিরিঞ্চিবাবু!

বিলক্ষণ!—স্যারের জন্য আপনি কেন ভাবছেন? তাঁর সঙ্গেই আসবে কয়েকটি বাক্স—সব বিলিতি মাল—দেখবেন একবার টেস্ট করে, আর ভুলতে পারবেন না মিস্—বরং আপনি এক কাজ করবেন, এই কেমিক্যালের গয়নাগুলো যেন স্যারের সামনে পরে বেরুবেন না।

কেমিক্যাল?—বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলো চাঁপা!

বিরিঞ্চি বলে উঠলো: না, না, আমি আপনার গয়নার কথা বলছি না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অমনি পরে থাকেন কিনা। কৃত্রিমতা রাত্রে ধরা কঠিন।

প্রায় ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিল চাঁপা: কিন্তু আমার গয়না একেবারে খাঁটি সোনার, তা জানেন? আর এ কী দেখছেন, আমার জড়োয়া গয়না আছে দু' সেট, দেখবেন?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে একটা কাঁচের আলমারি খুলে ফেলে বার করলো একটি মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স। বিরিঞ্চির চোখের সামনে ডালাটা খুলে ফেলে বললো: দেখুন, পছন্দ হবে কিনা আপনার স্যারের। আমি মশাই মেকি জিনিসের কারবার করি না। খাঁটি জিনিস পাবেন আমার কাছে।

বিরিঞ্চি অনুরোধ জানালো: এইগুলোই তাহলে সে ক'দিন পরবেন, বুঝলেন? ভালো না লাগাতে পারলে আমারও চাকরি যাবে, মিস্ চম্পকরাণী—সেদিকে একটু যদি লক্ষ্য রাখেন। আপনার রূপগুণের কথা কত করে আমি বলেছি—

চাঁপা কথা দিয়ে দিয়েছে রঙ্গলালকে সে সবগুলো জড়োয়া গহনা পরে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে কলকাতার হরলালবাবুকে।

স্থির হলো, মোসাহেব বিরিঞ্চিকে সঙ্গে করে যাবে হরলাল চাঁপার গৃহে। অকস্মাৎ অসুস্থতার ভান করে সেদিনকার নৃত্যগীতের আসর ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তারপর রাত্রে চাঁপার নির্জ্জন কক্ষে হরলাল মদ্যপান করবেন। বিরিঞ্চির হাতসাফাই-এর ফলে চাঁপার গ্রাসে পড়বে একেবারে খাঁটি জনিওয়াকার! পুলিশ এসে বাইরে থেকে এদের একবার হাঁক দিয়ে চলে যাবার পর অকস্মাৎ হরলালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবো আমি। গলা টিপেই শেষ করা যাবে চাঁপাকে। ইশারা পেয়ে নির্জ্জন কক্ষে এসে প্রবেশ করবে রঙ্গলাল। জড়োয়া গহনাগুলো নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়া যাবে। উত্তর দিকের বট গাছের ডালে সশস্ত্র যে দলটি আত্মগোপন করে থাকবে, তারা নিঃশব্দে নেমে রঙ্গলাল ও আমার দেহরক্ষীর মতো আমাদের ঘিরে অনুসরণ করবে।······

একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা। শীঘ্রই বাস্তবে রূপান্তরিত করবার সর্ব্ব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। কোনো স্বদেশীদলের ক্রিয়াকলাপ বলে আদৌ সন্দেহ করতে পারবে না পুলিশ। ফাল্গুনের এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি নির্দ্দিষ্ট করা হলো। দেলভোগে সেদিন সাহাদের বাড়ীতে যাত্রাগান। স্বভাবতঃই গ্রামবাসী ও শ্রীনগরের পুলিশ, এমন কি গণিকাপাড়ার সবাই ঐ যাত্রাগান দেখতে যাবে। সেই অবসরে চাঁপার গৃহে আমরা গিয়ে হাজির হব। ওদিকে হবে ঘোষালের যাত্রা আর এদিকে চাঁপার গৃহে নাটকাভিনয়। সেনাপতি বলবন্ত সিং এনামেল করা তরবারি চালনায় ও মুহুর্মুহুঃ কর্ণপটহবিদারী হুঙ্কারে যখন সহস্র সহস্র দর্শকের কাছ থেকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্জ্জন করবেন ঘন ঘন করতালি ও উল্লাসধ্বনি, চাঁপার রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্তে স্তিমিত আলোর নীচে তখন চলবে শিশির ভাদুড়ীর মূক অভিনয়, শনৈঃ শনৈঃ সে অভিনয়ের নায়িকা এগিয়ে চলবে ক্লাইমেক্সের পানে যেমন করে অজ্ঞ নৈশ মেলগাড়ী এগিয়ে যায় ফিসপ্লেট-খোলা লাইনের ওপর দিয়ে।······

দেখে তো ফুলবৌদি হেসেই অস্থির! হাসতে হাসতে বললেন: আজ আবার এ কী কাণ্ড বল তো? তোমার তো গোটাকতক ছদ্মবেশের কথা জানি, কিন্তু এই রূপ তো দেখিনি কোনো দিন! আজ কোন্ দিকে?

হেসে বললাম: অবান্তর প্রশ্ন। তার চাইতে তুমি একটু সজাগ থাকবার চেষ্টা করো। তিনটের মধ্যে ফিরে আসবোই। আর ভোর হয়ে গেলেও যদি

না ফিরি, তাহলে কাল সকালে ফুলদা'কে শ্রীনগর থানায় পাঠিয়ো জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্য।—বলে আবার হাসলাম।

বৌদি চুপ করে গেলেন। এই নীরবতার অর্থ কী, তা আমি জানি। দুঃখ এঁদের অনেক দিয়েছি, আমাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের ফলে অনেক বিনিদ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রজনী এঁদের যাপন করতে হয়েছে, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু সমস্ত আবেগ ও আকুলতার ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছি আমরা দেশাত্মবোধের ঝাণ্ডা!...জন্ম থেকেই আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত!

রাত তখন বারোটা হবে। মা, বাবা ও অন্যান্য সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তমিজদ্দী চৌকিদার একবার হাঁক দিয়ে সরকারী চাকরি বহাল রেখে চলে গেছে। রঙ্গলাল তো গেছে সেই সন্ধ্যেবেলায়। চাঁপাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফুলপরী তৈরী করে রাখতে হবে সবগুলো জড়োয়া গহনা পরিয়ে। নইলে জমিদারপুত্র কলকাতার কাপ্তান হরলাল স্যার খুশী হবেন কেন! বিপদভঞ্জন তার সঙ্গে গেছে জল-ভরা গোটাকয়েক বিলিতী মদের বোতল আর কয়েকটি সত্যিকারের নারায়ণগঞ্জী সোডা নিয়ে। অন্যান্য যারা রিভলভার ও ছোরা নিয়ে রিজার্ভ ফোর্সের কাজ করবে, তারাও চলে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করবে তারা। আমার পকেটে থাকবে শুধু একখানা স্কাউট ছুরি, হাতলের বোতাম টিপলেই খচ্ করে বেরিয়ে আসে একখানি তীক্ষ্ণধার ফলা। অসুবিধা বোধ করলে চাঁপার কণ্ঠনালী সহজেই কেটে ফেলা যাবে।......

বৌদি বললেন: ফিরবে কি না, তাও বুঝি ঠিক নেই আজ?

বললাম: না। তবে যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহলে জীবনে এই হবে আমার প্রথম পরাজয়। তোমার কি মনে হয়—

সে কথায় কান দিলেন না বৌদি, বললেন: মা, বাবা—তারপর চুপ করে গেলেন আবার।

আরশির সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। প্রতিবিম্বিত হয়েছে কলকাতার কাপ্তান হরলাল দাসের চেহারা। ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখা, মাঝখানে তেড়ি-বাগানো ঘন চুল কপালের দু'পাশে দুটি শিং-এর মতো করে ঘোরানো, চোখে ডিমের মতো কাঁচওয়ালা সোনার চশমা। পরনে শান্তিপুরী গিলে-করা ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় পাতলা ফুরফুরে চাদর আর হাতে কুকুরের মুখওয়ালা সরু ছড়ি।

ফুলবৌদি বললেন : কিন্তু তোমার কাছে এলেই স্পিরিট গামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃত্রিম গোঁফ ধরা পড়ে যাবে।

হেসে জবাব দিলাম : তা হবে না। কলকাতার কাপ্তানের গা থেকে স্পিরিটের গন্ধ বেরুবে না তো কি ধূপধুনার সুবাস বেরুবে? ওতে কাজ হবে। মনে হবে এইমাত্র ইনি পান করে এসেছেন কোনো রূপসীর স্বাস্থ্য!·

আবার জিজ্ঞেস করলেন : কিন্তু কলকাতার কাপ্তানের পোশাকই-বা কেন, আজ যাচ্ছোই-বা কোথায়?

আমার কিছু কিছু কাজের আভাস ফুলবৌদিকে দিতে হতো, খানিকটে আঁচ করেও নিতেন তিনি। তাই তাঁর প্রশ্ন স্বাভাবিক হলেও আমার আজকের অভিযানটি যেমন অভিনব, তেমনি মারাত্মক। তাই গোপনতা একেবারে অক্ষুণ্ণ রাখাই যুক্তিযুক্ত।

ফুলবৌদির প্রশ্নের জবাবে নীরবে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম মুহূর্ত্তমাত্র। তারপর দু'জনেই হেসে উঠলাম। সাবধানে দক্ষিণের দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখলাম চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নার বন্যা। পুকুরঘাটের ওখানে নীচে নামতে গিয়ে পেছন ফিরে চাইলাম, ফুলবৌদি তেমনি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন।······ দ্রুতপদে চললাম এগিয়ে। ম্যান্দার বাড়ীর হিজল গাছের নীচে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল অনাথ। আর জমির কারিগরের বাড়ীর ওপাশে গাব গাছের ডালে বসেছিল মণীন্দ্র। তারা একজন চললো পিছনে, আর একজন সম্মুখে।

ঘোলোঘরগামী সড়ক দিয়ে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো কলকাতার বনেদী জমিদার হরিপ্রসন্ন দাসের একমাত্র কাপ্তান পুত্র হরলাল দাস।

দোলভোগের গণিকাসম্রাজ্ঞী চম্পকরাণীর গৃহে তাঁর নৈশ আমন্ত্রণ!···

চার

একটু পরই আমরা কেয়টখালী গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে এসে মাঠে পড়লাম। চারিদিকে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না! ক্ষেতে তখনো শস্য বোনা হয়নি বা বীজ ছড়ানো হয়নি, সবে লাঙ্গল চালিয়ে মাটির ডেলাগুলো উলটে ফেলা হয়েছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় ডেলাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য অনড় ক্ষুদ্র তরঙ্গ। এর পর বীজ ছড়ানো হবে, তা থেকে একদিন মুখ বাড়াবে অঙ্কুর, পরিণত হবে চারাগাছে। তারপর একদিন সেই চারাগাছ বড় হয়ে উঠলে শ্যামল সেই শস্যক্ষেত্রের ওপর জ্যোৎস্না আবার সৃষ্টি করবে অসংখ্য দোদুল্যমান তরঙ্গ। সে তরঙ্গ আর মাটির ডেলা নয়, ধানের শীষের দোলন-তরঙ্গ!

নীরবেই পথ অতিক্রম করছিলাম, অকস্মাৎ মণীন্দ্র বলে উঠলো: পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই দাদা যে, আপনাকে চিনতে পারে। আমরা নেহাৎ আপনার গলার স্বরও চিনি, তাই। নইলে যে নিখুঁত মেকআপ্ করেছেন—

একেবারে হরলাল দাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না, তাই না?—বলে হেসে উঠলাম।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম: ওদিকে সব রেডি তো?

মণীন্দ্র বলল: হ্যাঁ, দাদা! সন্ধ্যের পরই রমুদা' আর বিপদভঞ্জন মদের বোতল ভর্ত্তি প্যাকিং কেসটা নিয়ে গেছে। খগেন ওদের সঙ্গে গিয়েছিল। এসে বললো, চাঁপা খুব পরিপাটি করে মুরগীর কোর্ম্মা রান্না করছে। বিরিঞ্চিবাবু বলেছেন কিনা, হরলাল স্যার মুরগীর ঠ্যাং খুব ভালোবাসেন। যাত্রা শুনতে যাবে বলে অন্যান্য ঘরেও নাকি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না চলছে। চাঁপা সবাইকে আগেই জানিয়ে রেখেছে যে, সে আজ আর কোথাও যাবে না, কারণ ঘরে নতুনবাবু আসবেন। খগেন থাকতেই সে কেষ্ট ছোকরা নাকি আবার এসেছিল। ইশারা করতেই চাঁপা তাকে বাজে কথা বলে ভাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু বললো, ও নাকি খুব ছোটবেলার বন্ধু আর এ পথে কেষ্টই নাকি চাঁপাকে প্রথম নিয়ে আসে। সুতরাং একটা কৃতজ্ঞতা—

কৃতজ্ঞতা তো থাকবেই।—বলে মনে মনে হাসলাম। মনে মনে বললাম, ছোটবেলাকার বন্ধুত্বের আজই হবে সমাধি! কাল সকালে ঘরের মেঝেতে মরা চাঁপাকে দেখে ছোটবেলার বন্ধু যে তাজা কোনো চাঁপার সন্ধানে তৎক্ষণাৎ

বেরিয়ে পড়বে, তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। এরা ভ্রমরের জাত। ফুল থেকে ফুলে আনাগোনা করাই এদের স্বভাবধর্ম্ম।

দূরে ঘোলোঘর গ্রামের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। তীব্র জ্যোৎস্নায় যে দু'চারখানা বাড়ীও দেখা যাচ্ছে, মনে হয় সেখানে কেউ আর জেগে নেই। কিন্তু ঘোলোঘরের বাজার অতিক্রম করবার পরই চাঞ্চল্য আশঙ্কা করছি। কারণ সাহাদের বাড়ীতে আজ আর কোনো দল নয়, একেবারে ঘোষাল অপেরা পার্টির যাত্রাগান। আশেপাশের অন্ততঃ দশখানা গ্রামের নরনারী সেখানে ভেঙে পড়বেই।

অনাথ একসময় নিরর্থক মন্তব্য করলো: মড়া পোড়ানো হচ্ছে।

দেখলাম, ডান দিকে ঘোলোঘর গ্রামের উত্তরে দূরে মাঠের মাঝখানে সত্যিই পাকা শ্মশানে আগুন জ্বলছে। বর্ষাকালে যে শ্মশান জলে ডুবে যায় না এবং যেখানে শান-বাঁধানো চুল্লী তৈরী করা থাকে, বিক্রমপুরে তাকে বলা হয় পাকা শ্মশান বা পাকা চিতা। গ্রামের কোনো কোনো ধনী এই শ্মশান প্রতিষ্ঠাকে পুণ্যকাজ বলে মনে করেন।

খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দু'চারজন লোকের উপস্থিতি ও নড়াচড়া দেখা যায়। চিতার লাল আলো আশেপাশের গাছগুলোকে কেমন ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। রূপালী জ্যোৎস্নার এই ফ্লোরেসেন্ট প্লাবনের মধ্যে যেন দেশী কোম্পানীর সস্তা কার্ব্বনভর্ত্তি বাল্‌ব জ্বলছে। বিরক্তিকর মনে হয়।

কে একজন মারা গেছে। কার ঘর শূন্য করে বেরিয়ে এসেছে খোকা, অথবা খুকু অথবা মা, বাবা, জানি না। কোন নিরবচ্ছিন্ন সুখের নীড়ে এমনি বজ্রাঘাত হয়েছে কে জানে! জ্যোৎস্নাবিধৌত এই অনির্ব্বচনীয় রাত্রি কার অন্তরে সৃষ্টি করছে মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকা, কে তার সংবাদ রাখে! চলিষ্ণু দুনিয়ার ষ্টীম রোলার ধক্ ধক্ করে যখন এগিয়ে চলে, তখন তার নীচে চাপা পড়ে কোন্ অসহায় পিপীলিকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল, তা নিয়ে কোনো দিন কখনো বিন্দুমাত্রও আলোড়ন সৃষ্টি হয় কি?......কেমন অদ্ভুত একটা কথা আমার মনে জাগলো। কে জানে, কাল হয়তো এই পাকা শ্মশানেই আসবে দেলভোগের গণিকাসম্রাজ্ঞী চম্পকরাণীর শবদেহ ময়না তদন্তের পর, রাত্রিকালে এমনি দেশী কোম্পানীর বাল্‌ব জ্বালিয়েই হয়তো তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। কেউ কি স্বপ্নেও একবার ভাবতে পারবে যে, নিজের

অজ্ঞাতে দেশজননীর বেদীতলে এই স্বৈরিণী কী ভাবে আত্মবলিদান করে গেল ?···

মনে পড়ে, ১৯২৫ সালে হাসাড়া স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়বার সময় একবার ঐ শ্মশানে গিয়েছিলাম। দিনে নয়, গভীর রাত্রে। দলবল নিয়ে নয়, আমার এক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে। শ্মশানে যে দুটি কাজে সবাই গিয়ে থাকে—হয় নিজে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে কিংবা কাউকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে—তার কোনোটার জন্যই যাইনি।

গিয়েছিলাম ভূত দেখতে। দেখতে নয় শুধু, ভূতের মোকাবিলা করতে। আমাদের প্রজা গোয়ালাবাড়ীর মদন ঘোষ নাকি তান্ত্রিক সাধক। ভূত-প্রেত নিয়ে নাকি তার কারবার। ঝাড়ফুক, জলপড়া, বাটি চালানো, বাণ মারা প্রভৃতি কাজে সে সিদ্ধহস্ত। বশীকরণ, মারণ, উচাটন ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। কেউ কেউ বলতো সে নাকি শবসাধনা করে অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করেছে। ভূত প্রেতিনী ব্রহ্মদৈত্যেরা নাকি তার হুকুম তামিল করবার জন্য ব্যস্ত চায়ের দোকানে বয়্-এর মতো। ফলে, অনেকেই মদন ঘোষকে যে শুধু সমঝে চলতো তাই নয়, মনে মনে বোধহয় তাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করতো।

আমার এসব সহ্য হলো না। বললাম, এসব বুজরুকি, ভাঁওতা। ভূত বলে কিছু নেই, মনের ভয়। মদন বললো যে, ভূত আছে, ব্রহ্মদৈত্যও আছে এবং খোলোঘরের পাকা শ্মশানেই তাদের এ অঞ্চলের হেড কোয়ার্টারস্। সুতরাং তারিখ ও সময় জানিয়ে ঘোষণা করলাম যে, হেড্ কোয়ার্টারস্ এ হানা দিয়ে ভূত ও ব্রহ্মদৈত্যদের সাথে মোলাকাৎ করে আসবো। মদন আমায় নিবৃত্ত করবার জন্য বহু চেষ্টা করলো, কানও দিলাম না তার কথায়।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বিকেল বেলায় হঠাৎ হাসাড়া থেকে সুন্দরবৌদির ভাই শ্রীনাথ বেড়াতে এল। তাকে বললাম সব। শুনেই লাফিয়ে উঠলো শ্রীনাথ। সেও যাবে। ভালোই হলো। ভূতের আক্রমণ যদি সইতে না পারি, তাহলে একজন হয়তো সরে পড়তে পারবো তান্ত্রিক সাধক মদন ঘোষকে খবরটা দেবার জন্য যাতে করে সে তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের সীজ ফায়ার অর্ডার দিতে পারে।

প্ল্যান শুনে প্রাণ খুলে হাসলেন বৌদিরা। কিন্তু গভীর রাত্রে দক্ষিণের কোঠায় দরজায় আমাদের দু'জনকে বিদায় দেবার সময় কিন্তু ফুলবৌদিকে বেশ গম্ভীর মনে হলো। শ্রীনাথের হাতে হকি স্টিক, আমার হাতে লোহার রড।

স্টিক ও রড্ দেখিয়ে বললাম : এ দুটো ভেঙ্গে না যাওয়া পর্য্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো। সুতরাং যদি আমরা না ফিরি, তাহলে কাল সকালে ফুলদা'কে শ্মশানে পাঠিয়ো ভগ্ন স্মৃতিচিহ্ন দুটি নিয়ে আসবার জন্য।

নিঃশব্দে হাসলাম পাছে টিনের ঘরের দোতলায় বাবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফুলবৌদি কিন্তু হাসতে পারলেন না।

বোধহয় কার্ত্তিকের শেষাশেষি। জ্যোৎস্না রাত, কিন্তু ঘন কুয়াসা। চারিদিকে শুভ্র আস্তরণ, দশ হাত দূরের কিছুই দেখা যায় না। এর আগে কোনোদিন শ্মশানে যাইনি। তাই রাস্তা চিনিনে। শুধু কোন্ দিকে, সে ধারণা ছিল। গ্রামের বাইরে ঘোলোঘরগামী সড়কে দাঁড়িয়ে দিক্ নির্ণয় করছিলাম। প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের পুব-দক্ষিণ কোণে প্রায় মাইলখানেক দূরে সেই শ্মশান।

শ্রীনাথ জিজ্ঞেস করলো : এখান থেকে শ্মশানে যাবার রাস্তা আছে তো?

বললাম : হয়তো আছে, কিন্তু তা চিনিনে। অচেনা রাস্তায় এই কুয়াসা ভেঙ্গে যেতে গিয়ে কোথায় চলে যাবো কে জানে। তার চাইতে চল, সোজা পুব-দক্ষিণ কোণে এগিয়ে যাই। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে না গিয়ে বরং বাঁ দিকে ত্রিশ ডিগ্রিতে যাই। তাহলে সোজা শ্মশানে না পৌঁছুলেও ঘোলোঘর গ্রামে গিয়ে ঠেকবো। তারপর ডান দিকে সরে গেলেই পেয়ে যাবো।

রওনা হলাম। সড়ক ছেড়ে, ক্ষেতের আইল ছেড়ে একেবারে কোণাকোণি। মাঝে মাঝে জলকাদা, কাঁটাগাছ, ছোট ছোট ঝোপঝাপ। পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ্চ আছে বটে, কিন্তু ঘন কুয়াসায় টর্চ্চ দিয়ে কি হবে?……

প্রায় আধ ঘণ্টা চলবার পর গাছপালার আভাস পাওয়া যেতে লাগলো। শ্রীনাথ বললো : এসে পড়লাম বোধহয়।

কিন্তু এ কোথায়? চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ হিজল গাছ আর সেই গাছের নীচে নীচে, এধারে ওধারে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি। একটু চেষ্টা করেই বোঝা গেল ওগুলো আর কিছু নয়, কবর। পাশেই মুসলমানপাড়া। এটা তাদের কবরস্থান। শ্মশানে যেতে গিয়ে কবরস্থানে এসে পড়েছি। তা হোক, শ্মশানে যদি ভূত থাকতে পারে, তাহলে কবরস্থানে জিন-টিন কেউ থাকবে না কেন? সুতরাং আমরা কবরের ওপর উঠলাম, নীচে নামলাম, চারিদিকে বার বার খুঁজলাম, এদিকে ওদিকে শুধু নয়, হিজল গাছেও টর্চ্চ ফেললাম। কিন্তু হায়, কোনো সুমুন্দিরই দেখা পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, তান্ত্রিক মদন ঘোষের

মতো কোনো বরকতুল্লা ফকির জিন নিয়ে বোধহয় কারবার করে না। তাই জিনেরা সব বেহেস্তে বা দোজখে চলে গেছে, কবরের শান্তি নষ্ট করতে আর এখানে বসে নেই।

জিনের আশা ত্যাগ করে আমরা ভূতের উদ্দেশ্যে গ্রামের পাশে পাশে ডান দিকে চলতে লাগলাম। কুয়াসা এবার ফিকে হয়ে এসেছে। মিনিট দশেক চলবার পর হঠাৎ সম্মুখে পড়লো একটি খাল, খালের ওপারেই সেই পাকা শ্মশান। সেই পুঁটিমারা খাল। কার্ত্তিকের শেষাশেষি। জল অনেক নীচে নেমে গেছে। পাড়ে বেশ কাদা। এখান থেকেই টর্চ্চ ফেললাম ওপারের শ্মশানে।

শ্রীনাথ বললো: ওপারে আর গিয়ে কি হবে। ঐ তো শ্মশান। ভূত-টুত থাকলে আলো দেখেই ছুটে আসতো ঘাড় মটকাতে। ওপারে যাবার সাঁকো-টাকোও নেই কিছু।

না থাক্—আমি তৎক্ষণাৎ বললাম: তবুও যেতে হবে। তা না হলে মদন বলবে যে আমরা ভয়ে শ্মশান পর্য্যন্ত যাইনি। পেয়েই যখন গেছি, তখন হেস্তনেস্ত একটা কিছু না করে ফিবে যাচ্ছি না।

শ্রীদাম তবু বললো: কিন্তু কতখানি জল—

কতখানি আর হবে—বাধা দিলাম: না-হয় কাপড় ভিজবে, না হয় সাঁতার কাটতে হবে, এর চাইতে তো আর বেশী কিছু হবে না।

নেমে পড়লাম জলে। হাঁটু ছাড়িয়ে জল ওপরে উঠলো, তারপর কোমর, তারপর আরও ওপরে একেবারে বুক পর্য্যন্ত। হাতিয়ার ও টর্চ্চটি উঁচু করে ধবে এপারে এসে উঠলাম। সম্মুখেই উঁচু শ্মশান। বর্ষাকালে যাতে ডুবে না যায়, তাই এত উঁচু। গট গট করে দু'জনে ওপরে উঠে গেলাম। বোঝা গেল, কোনো বড়লোক এটা নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন বটে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের ভালো ব্যবস্থা নেই। চৌ-চালা একখানা টিনের ঘর শববাহীদের জন্য। হঠাৎ বৃষ্টি এলে এখানে তারা অপেক্ষা করবে। কিন্তু ঘরের কোনো বেড়া নেই, কয়েকখানা খুঁটির ওপর ঘরখানা একপাশে হেলে রয়েছে। মনে হলো, একটা দমকা হাওয়াতেই ভূমিস্যাৎ হবে। চতুর্দ্দিকে প্রায় কোমর-সমান জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ, গোটা কয়েক হিজল ও একটা বট গাছ। গাছে টর্চ্চ ফেলতেই গোটা দুই বিরাটাকার পাখী ঝুপঝাপ শব্দ করে ডালপালা নাড়িয়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল।

বললাম হেসে : শ্রীনাথ, কয়েকটা ব্রহ্মদৈত্য চলে গেল।

আমরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ালাম, প্রায় প্রত্যেকটি গাছের নীচে গিয়েই দাঁড়ালাম, টর্চ্চ ফেলে ফেলে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্যদের অনুসন্ধান করতে লাগলাম, অবশেষে হতাশ হয়ে এসে দু'জনে দুটো বাঁধানো চিতার ওপর বসে পড়লাম। কোথায়-বা মদন ঘোষের ভূত, কোথায়-বা ব্রহ্মদৈত্য! হেড্ কোয়ার্টার্স্ ছেড়ে সবাই পলাতক!......

বাড়ীতে ফিরে এসে নানা রং দিয়ে মুখরোচক করে শ্মশান অভিযানের অভিজ্ঞতা যখন বর্ণনা করতে লাগলাম, ফুলবৌদি তখন হেসেই অস্থির। ভিজে জামা-কাপড়ে তখন শীত ধরে গিয়েছিল। বেশ পরিবর্ত্তন করতে করতে বললাম : কাল দেখো, মদন এসে পায়ে পড়বে। বলবে তার রুজি-রোজগারটা যেন নষ্ট না করে দিই, বুঝলে বৌদি?......

অকস্মাৎ যেন ভূত দেখতে পেলাম! ঘোলোঘর গোয়ালাপাড়া ছাড়িয়ে মাঠের মাঝখানে একটা হিজলবন আছে। সেই বনের মধ্যেই রাস্তাটা একটা মোড় ঘুরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমকোণ সেই মোড়টা যেই ঘুরেছি, অমনি মাত্র ত্রিশ হাত দূরে দেখতে পাওয়া গেল হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে জনকয়েক পুলিশ আর তাদের পুরোভাগে শ্রীনগর থানার দারোগা বা সহকারী দারোগা। ঠিক কে, তা জানা গেল না।

না গেলেও বিপদ যে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তা জানা গেল। কোনো দিকে পলায়নের পথ নেই। দৌড়লেই ওরা ধাওয়া করবে। চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ আর জ্যোৎস্না। সুতরাং ধরে ফেলবেই। ব্যস, তাহলেই বিরাট মামলা আর এদের প্রচুর পুরস্কার লাভ। দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে 'সি' ক্লাস কয়েদী করে শ্রীঘরে পাঠিয়ে ঢাকার আই বি আহ্লাদে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করবে!

কিন্তু চিন্তা করবার সময় কোথায়?

ছড়িটাতে ভর করে অকস্মাৎ আমার পা খোঁড়া হয়ে গেল। অনাথ তাড়াতাড়ি পেছন থেকে রাস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে মূত্রত্যাগে বসে গেল আর মণীন্দ্র চিরকালই হীরা সি-এর মতো বিপদকে থোড়াই কেয়ার করে চলে কিনা; তাই সে ডান হাতখানা শার্টের পকেটে পুরে দিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চললো। অসুবিধে বুঝলেই সে আজ এদের একটিকেও যে আর থানায় ফিরে যেতে দেবে না, সে সত্য আমার অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু বরাবরের মতো ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, তাই দারোগাসহ পুলিশের দল যেমন গট্ গট্ করে এগিয়ে আসছিল, তেমনি গট্ গট্ করেই আমাদের ক্রস করে চলে গেল। কিন্তু বিশ পা গিয়েই বোধহয় ওদের মনে সন্দেহ জেগেছে। দেখলাম, ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখছে। তাড়া করতে পারে, আশ্চর্য্য নেই। মণীন্দ্র তো পকেট থেকে রিভলভারটা বার করেই ফেলেছিল আমার সত্যিকারের দেহরক্ষীর মতোই, আমি বাধা দিলাম। ওদের টেনে নিয়ে আবার রওনা হলাম। পেছন ফিরে দেখলাম, ওরাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমার খোঁড়া পা আবার জোড়া লেগে গেল।

দেলভোগ সাহা বাড়ীর পূব দিককার পুকুর ঘিরে যে পথটি চলে গেছে, সে পথে অগ্রসর হবার সময় বুঝতে পারা গেল, যাত্রাগান পুরো দমে চলেছে। দু'চার জন দর্শকের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ এরা হরলাল দাসকে চিনতে পারবে কী করে? সাহা বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট গেট-এর নীচ দিয়েই পথ। দেখলাম, হুড় হুড় করে তখনো দর্শক গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হাসি পেল, সাহা বাড়ীর যাত্রা চলছে, একটু পরই চাঁপার বাড়ীতে শুরু হবে নাটক। যাত্রার পরিণতি আনন্দময় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু নাটকের পরিণতি কী হবে কে বলবে?···বৌদিকে তো বলেই এসেছি, না ফিরলে সকাল-সকাল ফুলদা'কে শ্রীনগর থানায় পাঠাতে জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্য।

মণীন্দ্রের মনে অস্বস্তি বোধহয় তখনো ধোঁয়া পাকাচ্ছিল। একসময় বলে উঠলো: ও ব্যাটারা যদি কেয়টখালী যায় দাদা?

অনাথ স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। সারাটি পথ একটি কথাও বলেনি সে। মণীন্দ্রের প্রশ্নে হঠাৎ যেন একটা বিপদের প্রশ্ন জাগলো তার মনে। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো: সত্যিই তো, যা বলেছিস্ মণি, কী হবে ওরা যদি গিয়ে থাকে?

সঙ্গে কাকে দেখলে? কোন্ দারোগা?—প্রশ্ন করলাম।

মণীন্দ্র জবাব দিল: নাঃ, কোনো দারোগা নয়। বোধহয় কোনো এ এস আই। তাই বোকার মতো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দারোগা হলে নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ করতো।

বললাম: তাহলে বোকার মতো সে আর কেয়টখালা গাঙ্গুলী বাড়ী যাবে না। আর শত হলেও এ এস আই। যে বাড়ীতে যায় কালীপদ মৈত্রের মতো কই

আর বড় দারোগার মতো কাতলা, সেখানে চুনো পুঁটি হয়ে তার সাহসই হবে না হানা দেবার !

ওরা আর কথা কইলো না, কিন্তু বুঝলাম মনে মনে ওরা দু'জনেই ক্ষুব্ধ হয়েছে। মণীন্দ্র শার্টের পকেটে করে যে বস্তুটি এনেছে, তা ব্যবহার করবার জন্য তার হাত যে নিশপিশ করছে, তা আমি জানি। কিন্তু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের প্রয়োজন যেখানে সীমাহীন, সেখানে ক্রোধ দেখাবার অবকাশ কোথায় ?

গণিকাপাড়ায় প্রবেশ-পথের মুখেই রঙ্গলাল দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে বিপদভঞ্জন। যেতেই বললো : সব মাটি হয়ে গেছে দাদা ! বেটি আবার কোন্ ব্যাটার পাল্লায় পড়ে গেছে যাত্রাগান শুনতে। অবশ্য ঝি-এর কাছে বলে গেছে যে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরবে। সে তো প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও চাঁপা যখন ফিরলো না, রঙ্গলাল তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এতদিনকার পরিকল্পনা সব ভেস্তে যাবে এক অবিমৃষ্যকারিণী গণিকার হঠকারিতায় ? এক বদমায়েস জমিদারপুত্রের মোসাহেব সেজে কী মারাত্মক অভিনয় করে সে সব দিক গুছিয়ে এনেছিল, তা কি এমনিভাবে চুরমার হয়ে যাবে এক মুহূর্ত্তে ? এই ডাকাতি-লব্ধ অর্থে সংগঠনের কাজ কতখানি বাড়িয়ে দেয়া যাবে, তা নিয়ে আমার সঙ্গে সহর্ষ আলোচনায় যে সে একাধিক রাত্রি ভোর করে ফেলেছে ! কেষ্ট কি আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে ?

সত্যিই রঙ্গলাল মরিয়া হয়ে উঠলো। বললো : এসেই যখন পড়েছি দাদা, তখন চল, শেষ না দেখে যাচ্ছি না আজ। কেষ্টর সঙ্গে যাত্রাগান শুনতে ও গেছে নিশ্চয়ই। সেখানে চল। আমায় সে চেনে আর ছোটকোন্‌কেও তার ভোলবার কথা নয়। ছোটকোন্ আর তুমি দর্শকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াবে আর আমি কৌশলে মহিলাদের দিকটাতে ঘোরাফেরা করবো। ওকে দেখলেই ইশারা করবো কিংবা আমায় দেখতে পেলে ও নিজেই উঠে আসবে, দেখো। নগদ পাঁচশো টাকার লোভ সহজে ছাড়তে পারবে না। তারপর ইশারায় ছোটকোন্‌কে দেখিয়ে দিলেই ও বেটি তোমায় দেখতে পাবে। তারপর আমাদের খপ্পরে না এসে ও যাবে কোথায় !

পরিকল্পনা মন্দ নয়। ঝুঁকির মাত্রা একটু বৃদ্ধি পেলেও দারুণ আশঙ্কার কোনো হেতু নেই। আর হত্যার সিদ্ধান্ত যেখানে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা আমাদের বিমুখ করবে কী করে ?

সশস্ত্র যে দলটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিল, তাদের ডেকে আনা হলো। তারপর সবাই রওনা হলাম সাহাদের বাড়ীর দিকে।

কিন্তু বিবাট গেট দিয়ে প্রবেশ কবতেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আর এক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। সাহাদের জনকতক প্রতিনিধি গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিত কোঁচা, ছড়ি ও সোনার চশমা দেখে আমাকে নিশ্চয়ই তাঁদেব মনে হলো অনৈক বিশিষ্ট অচেনা অতিথি; সুতরাং ব্যস্তভাবে দু'তিনজন এগিয়ে এসে একেবারে কলবব কবে অভ্যর্থনা জানালেন: আসেন, আসেন! আমাগো মতো গরীবের বাড়ীতে আপনাগোর মতো মহাশয় ব্যক্তিদেব পদধূলি—আসেন, আসেন!

এই অভ্যর্থনা এমনিভাবে করা হলো এবং বিনয়েব পবাকাষ্ঠা দেখিযে সাহা বাড়ীর প্রতিনিধিবৃন্দ এমনিভাবে আমায় সাদব আহ্বান জানালেন যে, কিছুতেই তাঁদের এড়ানো সম্ভব হলো না এবং একই সঙ্গে জনকতক পুলিশ দর্শকসহ আমায় নিয়ে তাঁবা অগ্রসব হলেন যাত্রা-মণ্ডপেব দিকে। এড়াতে চেষ্টা কবেও শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হলাম এবং এঁদের অভ্যর্থনার বন্যায় আমার সমস্ত আপত্তি তৃণের মতো ভেসে গেল। যখন ধাতস্থ হলাম, তখন দেখি বসে আছি একটি বেঞ্চে ঘেঁসাঘেসি আবও জনকতক পুলিশ দর্শকের সঙ্গে। বিপদভঞ্জন কিন্তু আমাব সঙ্গ ত্যাগ করেনি। দেহরক্ষীর মতোই সে এসে বসেছে আমাব পাশেই।

অত্যন্ত সাবধানে যাত্রার স্টেজেব দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রায় ফিস্ ফিস্ কবে জিজ্ঞেস করলাম: রঙ্গলাল ওরা কোথায়?

বিপদ বললো: কি জানি, দেখছি না তো তাদের একজনকেও।

এরা আমায় চিনে ফেলেছে নাকি?

ফেলেনি এখনও মনে হচ্ছে। তবে একেবাবে একই বেঞ্চে পুলিশেব সঙ্গে—ঝুঁকিটা বড্ড বেশী মনে হচ্ছে দাদা! হবলালেব খোলসটা ওবা চিনে না ফেলে।

বললাম: সহজে পারবে না। ছদ্মবেশে কোথাও ত্রুটি নেই। আর গোঁফজোড়া থেকে যে স্পিরিট গামের গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে আরও নিঃসন্দেহ হবে ওরা।

কিন্তু পরিস্থিতি আদৌ ভালো নয়। পেছনের বেঞ্চে বসে আছেন স্বয়ং যতীন দারোগা, হামেসাই যিনি আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকেন। তাঁর পাশেই এ এস আই রবীন দত্ত। আশেপাশে অন্যান্য অফিসার আর আমাদের বেঞ্চেও

জনকতক পুলিশ। এতগুলো চোখের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে [illegible] পারে? কিন্তু মুশকিল এই যে, বিনা কারণে অকস্মাৎ স্থানত্যাগ করে উঠে গেলেও তো সবার চোখে পড়ে যাবো! কে জানে, হয়তো কাছেই কোথাও অপেক্ষায় আছে অভ্যর্থনাকারী দলের জনৈক সদস্য। উঠে দাঁড়াতেই হয়তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তিনি আবাব অজস্র বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে বলে উঠবেন: এ কি, অখনই চললেন যে বাবু? পালাটা কি ভালো লাগতে আছে না নাকি? আর এক অঙ্ক দেইখা যান।

অনুবোধে হয়তো ঢেঁকি না গিলে পারা যাবে না। বসতে হবে।······

বিপদভঞ্জন বললো: রনুদা'কেও দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ে কোথাও মিশে গেছেন। আমাদেরও হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না। আমাদের দেরি করাও ঠিক হবে না।

একজন লোক এসে আমাদের সবাইকে প্রোগ্রাম বণ্টন করে গেল, আর একজন এসে দিয়ে গেল মিঠে পান। পান খাই না, কিন্তু খেতে হলো। প্রোগ্রামখানি পবীক্ষা করে বিপদ বললো: এই দৃশ্যেই তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবে। কনসার্ট সুরু হলেই আমাদেব সরে পড়তে হবে কিন্তু—

অনুচ্চকণ্ঠে বললাম: অল্ রাইট্।

সাহা বাড়ীর নীচে নেমে আমবা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবলাম। রঙ্গলালদের দেখা নেই। ভেবেছিলাম ভিড়ের মধ্যে ওরা হয়তো গা-ঢাকা দিয়ে আছে, আমাদের বেরিয়ে আসতে দেখেই ওরাও বেরিয়ে এসে যোগদান কববে। কিন্তু কোথায়?···তবে কি চাঁপাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে রঙ্গলাল? কার্যোদ্ধার করবার জন্য ও যেমন পাগল হয়ে উঠেছিল, কিছুই বলা যায় না। হয়তো দেলভোগে ও আমারই অপেক্ষায় রয়েছে। না দেখে তো চলে যাওয়া যায় না।

সুতরাং আমরা আবার এলাম গণিকাপাড়ায়। বিপদভঞ্জন দেখে এল, চাঁপার ঘরে তখনো তালা ঝুলছে। বেশ্যার আবার কথার মূল্য কী? হরলালের জন্য সর্ব্ব আয়োজন করে অবশেষে কেষ্টলালকেই সে হয়তো অভ্যর্থনা জানাবে, এতে আর বিস্ময়ের কী আছে?······

কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে। যাত্রাগানের আসর ভাঙ্গতে যত দেরিই থাক, কিছু সংখ্যক দর্শক নেমে আসছেন

দেখা গেল। গৃহ-গমনেচ্ছুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। যেভাবে ফাঁড়া কাটিয়ে বেরিয়ে আসা গেছে, এর পর আবার অতখানি ঝুঁকি নেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না। তাই বিপদ ও আমি দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হলাম গৃহাভিমুখে।

ম্যান্দার বাড়ীর কাছে এসে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকের আমার কক্ষে আলোরেখা!

সমস্ত ব্যাপারটাই মুহূর্ত্তে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই এ এস আই শ্রীমান্ এসেছে ধূর্ত্তের মতো স্বগৃহে অন্তরীণ রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দেখে যেতে। এসে দেখে সে নেই। ফুলবৌদি বা ফুলদা' বেগতিক দেখে বোধহয় আবোল-তাবোল কিছু বলে ধামাচাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এখন শ্রীমান্ ওত পেতে বসে আছে শিকার ধরবার আশায়।

বিপদ বললো: আমি দেখে আসি দাদা! আপনি এখানে থাকুন।

বলেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি হাত ধরে ফেললাম। ওর পকেট থেকে রিভলভারটি বার করে নিয়ে শান্ত স্বরে বললাম: এবার যাও। ধরা পড়লে একটা গান ধরো। এটা পকেটে থাকলে গানের কথা ভুলে যাবে, Gun-এর কথা মনে পড়বে এবং তখন তোমায় সামলানো যাবে না।

মুহূর্ত্ত পরেই বিপদভঞ্জন ফিরে এল ও হাসিতে সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তুলে আমায় একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো: চলুন!

রঙ্গলালের মুখে যা শুনলাম তা হচ্ছে এই যে, দারোগা পুলিশ সহযোগে সাহা বাড়ীতে আমাদের অভ্যর্থনার বহর দেখে ওরা বুঝে নিয়েছিল যে, আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে। তাই পেছন থেকে ওরা সবাই সরে পড়ে সোজা ছুটে এসেছে বাড়ীতে। আমায় গ্রেপ্তার করবার পর পুলিশ অনতিবিলম্বেই যে এসে হানা দেবে গ্রামের প্রত্যেক ছেলের বাড়ীতে, সে তো জানা কথাই। তাই ওরা এসে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে আপত্তিজনক জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলে সর্ব্বশেষ এসেছে আমার কক্ষে।

সুতরাং হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। ফুলবৌদি আপত্তিকর দ্রব্যের পোঁটলা-বাঁধা বন্ধ করে চুপটি করে ঘটনাটি শুনলেন, এবার বলে উঠলেন: দাও, ক্ষতিপূরণ দাও! সারাটি রাত যে আমার ঘুম হলো না, তার দাম দেবে কে?

সবাই হেসে উঠলো।

পাঁচ

গণিকাশ্রেষ্ঠা চম্পকরাণীর গৃহে হানা দেবার পরিকল্পনা এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছেলেদের সবার মনেই অসম্ভব জিদ দেখা দিল। একটা কিছু তারা করবেই। কী করবে, কোথায় করবে, কেমন করে করবে, তা নিয়ে নাকি মাথা ঘামাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একার। ওরা শুধু চায় অর্ডার, হুকুম। খিজির খাঁর মতো আমি নাকি শুধু হুকুম করে যাবো আর সানন্দে ওরা সবাই তা তামিল করে যাবে কাফুর খাঁর মতো। Theirs' not to reason why—কেন, এ-প্রশ্ন কখনো জাগবে না তাদের মনে। কিসের অভিযান, কোন্ পথে আঘাত হানলে সর্ব্বাধিক সাফল্যের সম্ভবনা আছে, সে আঘাতের ঝুঁকি কতখানি, কার্য্যান্তে প্রত্যাগমনের কোনো পথ খোলা থাকবে কি না, এই সব মারাত্মক প্রশ্ন তাদের কাছে একেবারে নিষ্প্রয়োজন ঔৎসুক্য, অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। ফলাফল হৃষীকেশের হাতে তুলে দিয়ে উৎসর্গীকৃত সন্তানের মতো তারা আত্মবিলোপনে উন্মুখ। আধুনিক যুগের অত্যাধুনিক গণতান্ত্রিক ভার্নিশে পালিশ-করা মন নিয়ে সে যুগের সৈনিক মনোবৃত্তির পরিমাপ করা সহজ নয়। এ যুগে ব্যক্তিকে স্থান দেয়া হয়েছে সবার ওপরে, গণতান্ত্রিক বিধানাবলীর জলসিঞ্চনে সমষ্টিগত দুঃসাহসী প্রস্তাবকে একেবারে ঠাণ্ডা করে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। যুক্তির যাঁতাকলে ফেলে আবেগময় আবেদনকে একেবারে পিষে ফেলা হয়েছে। এ যুগে তাই নেতার অভাব, সঙ্ঘের প্রাধান্য এখন সীমাহীন প্রবল। এ যুগে তাই গণতান্ত্রিক পথে চলে আলাপ-আলোচনা, শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ, পুষ্প-স্তবক বিনিময়, চলে প্রতিনিধি সভা, চলে পত্রালাপ, সাক্ষাৎকার ও সংবাদপত্রে বিবৃতি। কোনো কাজে কাউকে ডাকা যায় না। ডাকলেও সে আসবে না। কারণ, ও-ভাবে ডাকা গণতন্ত্রবিরোধী। ডাকতে হলে সে আহ্বানের একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করতে হবে। তার প্রোপোজার, সেকেণ্ডার ও সমর্থকদের ঘরোয়া বৈঠকে সেই মূল খসড়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যদি কোনো সংশোধন প্রস্তাব থাকে, যথারীতি তা উপস্থাপিত হবে। তারপর হয়তো মূল প্রস্তাব অথবা তার সামান্য সংশোধন সাব্যস্ত হলে প্রস্তাবটির চূড়ান্ত আকার দিতে হবে। তাতেই কাজ শেষ হলো না। এবার প্রস্তাবটি

প্রতিনিধি সভায় পেশের পূর্ব্বে লবীর আলোচনায় কান রেখে বুঝতে হবে যে, যাঁরা গলা বাজিয়ে দু'হাত তুলে ঘরোয়া বৈঠকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, প্রতিনিধি সভায় সত্যিই তাঁরা যোগদান করবেন কিনা, করলেও তাঁদের গলায় সর্দ্দি যাতে বসে না যায় এবং হাতে যাতে বাত না ধরে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

তারপর পয়েন্ট অব অর্ডার, কোশ্চেন, সংশোধনী প্রস্তাব, জুতো ছোঁড়াছুড়ি, ওয়াক আউট, বিধান সভা অভিযান প্রভৃতি হাজারো হার্ডলস্ অতিক্রম করে প্রস্তাবটি যদি অক্ষত অবস্থায় পাশ হয়ে যায়, তবেই—তাহলেই—এবং তখনই কাউকে সেই কাজে ডাকবার অধিকার আপনার করায়ত্ত হলো।

কিন্তু অধিকার মাত্র। সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে কি কাজ, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। কাজের কি উদ্দেশ্য, কি কাজের পদ্ধতি, আশেপাশে সাহায্য করবার জন্য কে কে থাকবে, কি তাদের পূর্ব্ব ইতিহাস, কি তাদের পরিচয়, সাহায্য করবার সামর্থ্য তাদের কতখানি, কাজে এগিয়ে যেতে যেতে সাফল্যপূর্ণ পশ্চাদপসরণের পথ খোলা থাকবে কিনা, কোথায় সে গুরুত্বপূর্ণ পথ, সে পথে ফিরে এলে আজকের সম্মান ও পজিশন অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা—এর প্রত্যেকটি পয়েন্ট চুলচেরা ব্যাখ্যা করে বলবার পর যিনি কাজ করতে এসেছেন, হয়তো তাঁর শ্রীচরণে গতি দেখা দেবে কাদায় ভর্ত্তি মেঠো পথে গরুর গাড়ীর মতো!

Order of the day উচ্চারণ করবার মতো এ যুগে যেমন নেই কোনো বিসমার্ক, কোনো নেপোলিয়ন, তেমনি নেই কোনো হীরা সিং, কোনো লাইট ব্রিগেড! ······

ছেলেরা যখন একটা কিছু করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় হয়ে উঠলো আবেগচঞ্চল, আমি তখন মনে মনে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম আর-একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। চাঁপার গৃহে আর যাওয়া যেতে পারে না। কেষ্টলাল তার ছোটবেলাকার বন্ধু। তার মোহ কাটানো সম্ভব নয়। তাই সে বেশ সহাস্যে ও সহজেই রঙ্গলালের ফাঁদে পা বাড়িয়ে আবার ফস্‌কে গিয়ে ধরা দিল কেষ্টলালের জালে। ওর ঘরে জল-ভরা যেসব বোতল রেখে আসা হয়েছে, এত দিনে নিশ্চয়ই কেষ্ট তার স্বাদ গ্রহণ করে দেখেছে এবং বুঝতে পেরেছে কলকাতার কাপ্তান সংক্রান্ত ব্যাপারে কোথাও গলদ আছে! কাজেকাজেই দেলভোগ আর যাওয়া চলে না।

একদিন বিকেলে শ্রীনগর থানায় সাপ্তাহিক হাজিরা দিয়ে ফেরবার পথে

দেলভোগের হাটের কাছে একটু দাঁড়ালাম। সেদিন ছিল গরুর হাট অর্থাৎ ঐ দিনে শুধু গরু বেচা-কেনা হয়ে থাকে। বিরাট হাট। অসংখ্য গরুর সমাবেশ। অসংখ্য ক্রেতা। বহু হাজার টাকার লেন-দেন হয়। সন্ধ্যার পরও কিছুক্ষণ হাট চলে, তারপর ভিড় ভাঙতে থাকে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল।···পরের সপ্তাহে আবার শনিবারে ঐ হাটে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দু'একটা গাইয়ের দামও যাচাই করলাম নিরর্থক। অপর ক্রেতার প্রদত্ত টাকার পানে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, দেখলাম সরু দীর্ঘ থলিতে নোটের তাড়া পুরে দিয়ে বিক্রেতা সেটা কোমরে এঁটে জড়িয়ে রাখলো।······চলে এলাম।

তার পরের সপ্তাহেই সর্ব্ব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। রঙ্গলাল ও বিপদভঞ্জনকে পাঠানো হলো দেলভোগ গরুর হাটে দুপুর বেলাতেই। ক্রেতা হিসেবে হাটে প্রবেশ করে তারা ঘুরে ঘুরে নানারকম গরুর দাম যাচাই করতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখলো খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য রাখবার জন্য কোন্ বেপারী বেশ মোটা টাকা কোমরে জড়িয়ে রাখছে। অনাথ আর খগেন অপেক্ষা করতে লাগলো হাটের বাইরে মাঠে আর কালাচাঁদকে নিয়ে আমি নিজে অপেক্ষা করতে লাগলাম আরও দূরে পুব দিকে মাঠের মাঝখানে যে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তারই ধারে। ক'জন লোক মাছ ধরছিল ছোট ছিপ ফেলে। পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ। দেখতে ভালো লাগলেও সে দৃশ্য অকস্মাৎ আমাদের কাছে যেন অত্যধিক সুন্দর মনে হলো। তাই আমরা সাগ্রহে দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে। একটি চক্ষু ফাতনার দিকে নিবদ্ধ রেখে অপর চক্ষু প্রসারিত করে রাখলাম হাটের পথে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো তিথি ছিল, বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। সন্ধ্যে হতে না-হতেই খগেন এসে সংবাদ দিয়ে গেল যে, রঙ্গলাল ও বিপদ হাট থেকে রওনা হয়েছে। একটু পরই দেখা গেল, তারা হাসিমুখে আলাপ করতে করতে আরো দশজন পথিকের মতোই হাট থেকে বেরিয়ে এল এবং আমাদের দিকে আড়চোখে একটি অর্থবোধক দৃষ্টি হেনেই এগিয়ে চললো দক্ষিণ দিকের পথ বেয়ে। কিছু দূরে থেকে থেকে আমরাও একে একে তাদের অনুসরণ করলাম।

যে পথটি দেলভোগ হাট থেকে বেরিয়ে খানিকটে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে আবার পুব দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে দক্ষিণে সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের কাছে মুন্সীগঞ্জগামী বড় সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে, আমরা সেই পথে এগিয়ে চললাম।

চলতে চলতে পেছনে পড়ে বিপদ এক সময় এসে চুপি চুপি আমায় জানিয়ে গেল যে, সম্মুখে যে লোকটা ছোট একটা বাছুর নিয়ে চলেছে, অনেক টাকা আছে তার কাছে এবং সে-ই হচ্ছে আমাদের শিকার।

এগিয়ে চলতে চলতে সহগামী পথিকের সংখ্যা ক্রমেই কমে এল এবং এক সময় দেখা গেল কিছু দূরে দূরে জনতিনেক লোক অনেকক্ষণ যাবৎ একই পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি করে গরু বা বাছুর আছে। নিশ্চয়ই বেচা-কেনার পর এটি অবশিষ্ট আছে, তাই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। সবার সম্মুখে চলেছে যে লোকটি, তার মাথায় তেল চপ্‌-চপে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল বেড়িয়ে বাঁধা একটি গাঢ় লাল কাপড়ের টুকরো, সরু গোঁফ, থুঁতনিতে ছোট্ট নূর, হাতে গরু চরাবার পাচন, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। লোকটাকে দেখলেই লাঠিয়াল বলে মনে হয়। তার পশ্চাতে কিছু দূরে যে লোকটি চলেছে, সে একেবারে বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্মশ্রুতে মুখ ঢাকা, ময়লা লুঙ্গি পরিধানে, কাঁধের ওপর ততোধিক ময়লা গামছা। একটি অস্থিচর্ম্মসার বাছুর নিয়ে চলেছে সে। সবার পশ্চাতে যে চলেছে একটি গরুর দড়ি হাতে করে, সে একেবারে অল্পবয়সী কুড়ি-একুশের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

বিপদ আবার পেছনে পড়লো। বললো: দাদা, ঐ বাবরীওয়ালাকে ধরতে হবে। কিন্তু আর দুটো লোকও যে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের কি করা যায়?

বললাম: একজনকে ধরবার কথা ছিল, এবার তিনজনকে ধরতে হবে।

সহজ জবাব পেয়ে সহজ সৈনিক বিপদের মন একেবারে নিশপিশ করে উঠলো! বললো: তাহলে আমি ধরবো ঐ ছোকরাকে, আর বাবরীওয়ালাকে আপনি। কেমন দাদা?

পিঠ চাপড়ে বললাম: ছোকরাটাকে ধরবে খগেন আর তুমি, আর তুমিই হচ্ছ তোমাদের গ্রুপে লীডার। খগেন তোমার নির্দ্দেশ মেনে চলবে।

আরও খুশী হয়ে উঠলো সে। অনুরোধ জানালো: তাহলে ওটা আমার কাছে দেবেন না?

হেসে জবাব দিলাম: তাহলে লোকটা অতি সহজেই প্রাণ হারাবে। খুব ঠাণ্ডা মাথা রাখতে হয় এসব কাজে। পোড়ানো লোহার মতো তুমি যে গরম, ছুঁলেই ও ব্যাটা পুড়ে যাবে। তাই এটা আমার কাছেই থাক।

বিপদ হাসলো।

আরো কিছুক্ষণ হাঁটা গেল। কিন্তু তিনজনের জুটি আর ভাঙবার নয়। আমরাই বা আর কত দূর এদের অনুসরণ করবো? গ্রামের পায়ে-চলা পথ অনেক সময় পাড়ার মধ্য দিয়ে, পুকুরপাড় ঘুরে, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, লাউয়ের মাচার নীচে দিয়ে, অনেক সময় একেবারে উঠানের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলে। এমনিভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হলো অনেক দূর।

আকাশে চাঁদ থাকলেও মেঘও আছে প্রচুর। সঞ্চরমান লঘু মেঘ। তাই চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলেছে বেশ। কি মাস, তা মনে নেই। তবে হেমন্তের শেষাশেষি হবে। শীত একেবারে এসে না পড়লেও তার আমেজ অনুভব করা যায় সন্ধ্যে হতেই। গ্রামের চতুর্দ্দিকে নীরবতা এসে যায় সন্ধ্যের পরেই।

আর দেরি করা সঙ্গত মনে হলো না। পথঘাট ভাল করে জানা না থাকলেও আমরা যে বীরতারা অভিমুখে চলেছি, তা বোঝা গেল। সুতরাং বিপথে যাবার আশঙ্কা নেই।

আমরা ছয় জন, আর ওরা তিনটি। সুতরাং দু'জনের তিনটি দল তৈরী হয়ে গেল। সবার সম্মুখে চলেছে সে বাবরীওয়ালা লাঠিয়াল, সবার পশ্চাৎ থেকে এগিয়ে এলাম আমি কালাচাঁদকে সঙ্গে করে। বৃদ্ধের পশ্চাতে এসে জুটে গেল রঙ্গলাল ও অনাথ। ছোট ছেলেটার কাছাকাছি এসে পড়লো খগেন ও বিপদভঞ্জন। এমনিভাবে আরও কিছুক্ষণ চলবার পর আমরা একটা মাঠে এসে পড়লাম। এবং—

অকস্মাৎ আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাঠিয়ালের চোখের ওপর তীক্ষ্ণধার ছোরা তুলে হুকুম করলাম: এই, কী আছে টাকাকড়ি, বার কর। জলদি—

পশ্চাতের ছেলেরাও তেমনি একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লো শিকারের ওপর।

লাঠিয়াল প্রথমটা হকচকিয়ে গেল, তার পর-মুহূর্ত্তেই পলায়নের চেষ্টা করতেই লাফিয়ে তার সম্মুখে এসে পড়লাম এবং প্রাণপণ শক্তিতে ছুরিকাঘাতের অভিনয় করে শুধু ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটি তার পিঠের ওপর চেপে ধরে কালাচাঁদকে হুকুম করলাম: ছুরি দিয়ে এর পেটের ঝুলি বার করে ফেলতো রহমৎ।

রহমৎ তৎক্ষণাৎ ছোরা বার করতেই লোকটা কম্পিতস্বরে বললো: হুজুর, আমার লগে কিছুই নাই।

সুতরাং ছোরার অগ্রভাগ আরো একটু চেপে গেল মাংসের ভেতর। ধমক দিলাম: চোপরাও বেয়াদপ। কী আছে, বার কর, নইলে টুকরো টুকরো করে ফেলবো তোকে।

লোকটা তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগলো। ছোরার ফলা নিশ্চয়ই ততক্ষণে আধ ইঞ্চি বসে গেছে। প্রয়োজন হলে আধ ইঞ্চি কেন, আধ হাত বসিয়ে দিতেও কসুর করবো না আমি। কিন্তু চরম ব্যবস্থা তখনই গ্রহণ করা হবে, যখন অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই ছোরার ফলাটি আরো একটু বসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলাম পাখীর পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মতো করে। রক্তে লাঠিয়ালের ফতুয়ার একাংশ সিক্ত হয়ে উঠলো।

এবার হুঁশ হলো শ্রীমানের। ধীরে ধীরে কোমর থেকে সরু থলিটা খুলতেই কালাচাঁদ সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটস্থ করে ফেললো। আর যেই আমি ছোরাটি তুলে নিলাম, অমনি সাহসী লাঠিয়াল জমির মধ্য দিয়ে সোজা ছুটে পালাল তাড়া-খাওয়া পাতি শেয়ালের মতো। পড়ে রইলো তার পাচন, পড়ে রইলো তার মাথার লাল বৈজয়ন্তী। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গরুটি।

এবার ছুটে এলাম বুড়ো বেপারীর দিকে। দেখলাম, বিপদভঞ্জন আর খগেনও ততক্ষণে এসে গেছে সেখানে। বুড়োর সাহস দেখা গেল প্রায় অসহনীয়। রঙ্গলাল বার বার ছোরা ঘোরাচ্ছে তার নাকের ডগায়, আর বার বার ধমক দিচ্ছে, কিন্তু সে মিন মিন করে প্রাণভিক্ষা চেয়ে অনর্থক দেরি করাচ্ছে আমাদের। দেরি করবার সময় কোথায়? লাঠিয়ালকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, পালিয়ে গেছে সেই ছোকরা। কাছেই কোনো পাড়াতে গিয়ে উঠলেই কে জানে, লোকজন ছুটে আসতে পারে লাঠি, সড়কি ও লণ্ঠন নিয়ে। অকস্মাৎ মনে হলো বৃদ্ধ খুব হুঁশিয়ার ব্যক্তি, ইচ্ছে করেই এমনি কাঁদুনি গাইছে কালহরণের অভিসন্ধিতে! সুতরাং—

এগিয়ে এলাম আমি। ছোরা বার করে লোকটার কাঁধের ওপর চেপে ধরলাম আর হুকুম করলাম রঙ্গলালকে: ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেল ছমিরদ্দি!

খগেন পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলো ওকে আর রঙ্গলাল অদ্ভুত ঝাঁকুনি দিয়ে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি একেবারে তুলে ধরলো ওর চোখের ওপর।···এবার কাজ হলো। লোকটা কেঁদে উঠলো: দিতেছি হুজুর, দিতেছি।···বলে সে কোমর থেকে সরু থলিটা খুলে ফেলে রঙ্গলালের হাতে তুলে দিল। আমরা ছেড়ে দিলাম ওকে।

কিন্তু কার্য্যান্তে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। কোথা দিয়ে কোন্ অজানা বিপদ এসে পড়বে, কে বলতে পারে!···ডবল্ মার্চ্চ করে রওনা হলাম

জমির মধ্য দিয়েই সোজা উত্তর দিকে। কিছু দূর আসার পরই অদূরে একজন পথচারীকে দেখা গেল। আমরা তাকে অতিক্রম করে চলে আসতেই লোকটা পশ্চাৎ থেকে হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করলো : কারা যায় ?

বিপদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল : Your forefathers !

তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার করে দিলাম : ভুল করলে। লোকে রেগে গেলেই হিন্দী বা ইংরেজীতে কথা কয়। অন্যত্র তাতে কিছু না এলে-গেলেও এই কাজে নেমে খুব সতর্ক হতে হয়। আমরা সাধারণ ও নিরক্ষর মুসলমান ডাকাত সেজে যদি ইংরেজীতে কথা বলি, তাহলে আমাদের ছদ্মবেশ তো ব্যর্থ হবেই, উপরন্তু আই বি এর মধ্যে পাবে স্বদেশীর গন্ধ। বুঝলে ?

লজ্জিত বিপদভঞ্জন ত্রুটি স্বীকার করলো।

বিপদভঞ্জনদের বাড়ীতে এসে দেখি আর এক বিপদ! রঙ্গলাল প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছোরা উদ্যত করবার সময় তা আচমকা লেগে গেছে অনাথের কনুইয়ের নীচে। খানিকটে মাংস উপড়ে কোথায় পড়ে গেছে। প্রবল রক্তপাত হচ্ছে। অনাথের কাপড়-জামা ও গায়ের সাদা চাদরখানা লাল হয়ে উঠেছে। যদিও হাসিমুখে সে বারবার বলছে যে বিশেষ কিছু হয়নি, তথাপি আমি বুঝতে পারলাম, বেশ কিছু হয়েছে। দেরী করা চলে না। খগেন ও বিপদ এক মুঠো কচি ঘাস থেঁতলে নিয়ে এল তাড়াতাড়ি আর রঙ্গলালকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলাম হাঁসাড়া গ্রামে রাজনৈতিক বন্ধু গোপাল সেনের দাদা ডাক্তার বিজয় সেনকে ডেকে আনতে। হোমিওপ্যাথিক হলেও বিজয়বাবুর নামডাক আছে।

ইতিমধ্যে কালাচাঁদ এসে বললো : মোট এক হাজার তিন শো কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে।

অল্ রাইট্।

বিপদদের পুকুরের বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। আকাশে তখনো চলছে চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি খেলা। সঞ্চরমান মেঘ। ঝিরঝিরে হাওয়া ভারী মিষ্টি লাগছে কপালে বুলিয়ে-দেয়া নরম হাতের মতো।......

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ছয়

পূর্ব্বে যে কথা বহুবার বলেছি, বড় গলায় আবারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কখনো কোনো অবস্থাতেই যেমন পুলিশের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত হয়ে কোনো পরিকল্পনার সামান্যতম সংশোধনও আমি করিনি, তেমনি আশ্চর্য্যতম সত্য যে, সহস্র চেষ্টা করেও তারা কোনো দিন হাতে-নাতে ধরতে পারেনি আমায়। সন্দেহ করেছে তারা প্রবলভাবে এবং অনেক সময়ই দেখা গেছে তাদের সন্দেহের পশ্চাতে আছে অকাট্য যুক্তি, কিন্তু সন্দেহের ফলে একজনকে রাজবন্দী করে রাখা চলতে পারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সাজিয়ে যাবজ্জীবন আন্দামানে পাঠাবার জন্য স্টীমার সাজানো যায় না।......

স্কুলগুলি থেকে এই যে জাতীয়তামূলক গ্রন্থরাজি উধাও হয়ে গেল এবং সর্ব্বশেষ পায়ে-চলা পথের ওপর এই যে ডাকাতি হয়ে গেল, পুলিশের সন্দেহ-পঙ্কিল মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগলো না যে, এর মূলে থাকতে পারে কোনো স্বদেশী দলের অদৃশ্য হস্ত! অনাথের হাতের গভীর ক্ষত বিজয় সেনের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সহজেই ও শীঘ্রই সেরে উঠলো। বন্ধু ও সহকর্ম্মী গোপালের দাদা হলেও বিজয় সেনের কণ্ঠের তুলসী মালা ও তাঁর তিরিক্ষি মেজাজকে সর্ব্বদাই সমঝে চলতাম আমি। বৈষ্ণবের কণ্ঠি যখন তাঁর মনে 'মেরেছিস কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না' সঙ্গীতের চন্দন-প্রলেপ বুলিয়ে দিত, তখন সীমাহীন সরল হয়ে উঠে যেমন বিজয় সেন অকাতরে, কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে আমাদের গোপনীয়তম কথাগুলিও একটি একটি করে প্রকাশ করে দিতে পারতেন একেবারে হাটের মাঝখানে, আমি জানি এবং নিশ্চিতভাবে জানি, তেমনিভাবে মেজাজের প্রাইমাস্ স্টোভটি একবার দপ্ করে জ্বলে উঠলেই শুধু যে শব্দব্যঞ্জনায় ও উৎপ্রেক্ষায় অগ্নিদ্রাব ছড়াবেন তিনি তাই নয়, তখন হাতের কাছে একখানা হাতিয়ার পেলে হয়তো রক্তই দর্শন করে বসবেন বিজয় সেন। এমনি লোককে নিয়ন্ত্রণ বোধহয় আমিই একা করতে পেরেছি যতদিন আমার সংস্পর্শে ছিলেন, তত দিন।

ঢাকা শহরে রঙ্গলালকে পাঠিয়ে কিং কোম্পানী থেকে বিজয় সেনের

প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কিনে আনা হলো—যত দূর মনে পড়ে, কেলেণ্ডুলা। প্রতিদিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ীতেই চলতো অনাথের ক্ষত ধোওয়া ও ব্যাণ্ডেজ। গ্রামের মধ্যে এই বাড়ীখানাই ছিল পুলিশের কঠিনতম নেক-নজরে এবং বোধহয় সেই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান ছিল এই বাড়ীটি। গ্রামে আমরা রটিয়ে দিলাম যে, মোহনগঞ্জ হাটে রঙ্গলাল ও অনাথ গিয়েছিল বেড়াতে। সেখানে একটি লেমনেডের বোতল খুলতে গিয়ে অকস্মাৎ তা বিস্ফোরিত হয় এবং এক টুকরো কাঁচে অনাথের হাত কেটে গেছে। গ্রামের লোককে স্বকপোলকল্পিত গল্পে ভুলিয়ে দিলেও পুলিশ বা আই বি এই চুরি ও ডাকাতি সম্পর্কে কেন যে অবিলম্বে আমাদের বাড়ীতে হানা দিল না, তা আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য রয়ে গেছে। সমগ্র বিক্রমপুরের যেখানে যত রাজনৈতিক বা অরাজ-নৈতিক ডাকাতি বা নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির জন্যই আই বি সহযোগে পুলিশ প্রতি সন্ধ্যায় মা কালী দর্শনের মতো একবার করে কেয়টখালী গাঙ্গুলী বাড়ীতে হানা দিতই, অথচ এত কাছে এমনি নিখুঁত ডাকাতির পর একটি বারও তাদের টিকিটিরও দেখা পাওয়া গেল না!

অবশ্য শ্রীনগর থানার দুর্দ্ধর্ষ যতীন দারোগা যে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিয়ে থাকেননি, তা পরে জানতে পারা গেল। ঐ রাত্রেই তাঁরা দেলভোগে চম্পকরাণীর গৃহে সদলবলে হানা দেন। সেখানে একদল বিদেশী গ্রাহক সে রাত্রে চম্পকরাণীর নৃত্যে ও গোলাপী পেয়ালার মধুরসে একেবারে নন্দনকানন সৃষ্টি করছিলেন। যতীন দারোগা সে কমলবনে মত্ত করীর মত প্রবেশ করলেন। মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে তাদেরকে নিয়ে এলেন থানায় এবং পেটেন্ট দাওয়াই প্রয়োগে পেটের কথা টেনে বার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়, সেখানে যে দেশী মালের সমুদ্র—তরঙ্গহীন, অন্তহীন, অতলস্পর্শ! সেখানকার কথা শুধু চম্পকরাণীর ঠুংরী ও গজল।...তাই শেষকালে গলাধাক্কা দিয়ে সে দলকে থানা থেকে বার করে দিয়ে দু'হাত ঝেড়ে ফেললেন যতীন দারোগা।

অতএব বোঝা গেল আমরা পুরোপুরি কৃতকার্য্য হয়েছি। স্কুলের জাতীয়তা-মূলক গ্রন্থরাজি চুরি ও এই ডাকাতি এমনি নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধা করা হয়েছে যে, পুলিশের মগজে এগুলো আদৌ ঘা দেয়নি।...অবশ্য একদিন এঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল, কিন্তু সে বড্ড দেরিতে...সে ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত করবো।

বন্দীশিবিরের রাজবন্দীদের কাছে আই বি দারোগারা সে সময় সদম্ভে ঘোষণা করতেন যে, বিক্রমপুরের বৈপ্লবিক তৎপরতার কণ্ঠ তাঁরা এমনিভাবে দু'হাতে চেপে ধরেছেন যে প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। ঠিক সেই সময় আমার গুপ্ত কার্য্যাবলীর ঝনকানি তাঁদেরকে মাঝে মাঝে এমনি বিভ্রান্ত করে তুলতো যে, আমায় তাঁরা মনে করতেন একটি মারাত্মক বিস্ফোটক। সরকারীভাবে কখনো ঢাকা থেকে কোনো আই বি অফিসারই আসেননি আমাদের বাড়ীতে রঙ্গলাল বা আমার সঙ্গে কথা কইতে এবং কথোপকথনের মাধ্যমে উত্তেজক কিছু নৈবেদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে যোগিনী বসু বা জিতেন ধরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করতে। অথচ পরে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম যে, বে-সরকারীভাবে তাঁদের মধ্যে অনেক ধুরন্ধরই রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন আমাদেরই বাড়ীর আশেপাশে নিশাচর প্রেতের মতো। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ব্লেক ও স্মিথের মতো আমার ও রঙ্গলালের মৃত্যু নেই কোনো কালে।

যাঁরা বলেন আই বি পুলিশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁদের এক্স্-রে আইজ ও শারলক হোমি কর্ম্মতৎপরতার প্রচণ্ড তোড়ে সে যুগের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সর্ব্বপ্রকার সতর্কতার বর্ম্ম একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, আমি তাঁদেরকে বলবো এবং সর্ব্ব দায়িত্ব নিয়েই বলবো যে তাঁরা ভ্রান্ত, শোচনীয়ভাবে অন্ধবিশ্বাসী। যেখানে যত ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে, তার সূচনায় আই বি পুলিশের তদন্তের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটালে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, লিপিবদ্ধ রয়েছে আমাদেরই সহকর্ম্মী ও বিশ্বস্ত সুহৃদের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ককর কাহিনী। প্রকাশ্যে, স্পেশাল ট্রাইবিউনালের এজলাসে দাঁড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায় সমবেত সহকর্ম্মীদের একটি একটি করে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সনাক্ত করে দিয়ে তোতা পাখীর মতো শিখিয়ে-দেয়া বুলি উচ্চারণের মর্ম্মান্তিক সত্য কাহিনী কারুর অবিদিত নেই। রাষ্ট্রবিরোধী পাপকার্য্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে নাকে খৎ দিয়ে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের করুণাভিক্ষার ঘটনাগুলিও নিশ্চয়ই মন থেকে মুছে যায়নি। সেখানে আই বি পুলিশের কৃতিত্ব কোথায়? যতগুলি বৈপ্লবিক গুপ্তকার্য্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে বুক ঠুকে পুলিশ প্রচার করে বেড়িয়েছে নিজেদের দূরদর্শিতা ও কৃতকার্য্যতার কাহিনী তার প্রত্যেকটির মূলে আছে আপনার, আমার, সবার বিশ্বস্ততম সুহৃদের নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা।...পশ্চাৎ

থেকে আমরাই ছুরি মেরেছি আমাদের দেশের বিপ্লবীদের জল্লাদ মীরণের মতো, জগৎশেঠ-উমিচাঁদের নীল রক্ত এখনও অবশিষ্ট রয়েছে আমাদের ধমনীতে। তিক্ততম এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।······

১৯৩৪ সালের জুন মাসের দুই তারিখ।

কি কাজে যেন রাত জেগেছিলাম, উঠতে একটু দেরী হয়ে গেছে। ফুলবৌদিটাও এমনি, ডাকেনি। দক্ষিণের কোঠার দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলাম ততক্ষণে পূর্ব্বাকাশ বেশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আলোকের দ্যুতি সারা আকাশে মেঘের গায়ে গায়ে অসংখ্য মণিমাণিক্য সৃষ্টি করেছে। পাখীদের কলরব শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দক্ষিণ-পুব কোণের শিউলি গাছের ডালে বসে একটা কাক বিশ্রী স্বরে ডাকছে। প্রভাতের শান্ত সৌন্দর্য্যে কর্কশ শব্দ অসহ্য মনে হলো। তাড়া দিলাম কাকটাকে। উড়ে গিয়ে বসলো আম গাছের ডালে, তারপর ছাদের কার্নিশে। ঢিল তুলতে দেখে উড়ে গিয়ে বসলো দোতলা টিনের ঘরের চালে। সেখানেও বিশ্রী স্বরে গলাবাজি করলো বারকতক। অবশেষে, বাড়ী ছেড়ে আকাশে উড়লো।

কিন্তু বাড়ীটা যেন কেমন শান্ত মনে হচ্ছে। এতক্ষণে তো উনুনে আঁচ পড়ে যায়, খোলা জানালা দিয়ে রান্নাঘরে ফুলবৌদিকে দেখা যায়। রান্নাঘরের শিকল তোলা কেন? উচ্চৈঃস্বরে মাকে ডাকতেই দোতলায় ফুলবৌদিকে দেখা গেল। ইশারায় চুপ করতে বলে ওপরে ডাকলেন।

ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, বালাপোশে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে বাবা শুয়ে আছেন আর শিয়রে বসে মা হাওয়া করছেন। বাবা অসুস্থ। জ্বর হয়েছে। শেষ রাতেই এসেছে জ্বরটা। খুব বেশী না হলেও বৃদ্ধের পক্ষে কমও নয়, ১০১ ডিগ্রি। চোখ মেলে বাবা আমার পানে একবারটি চাইলেন। চোখ বুজে যেন সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন: এ কিছু না, কালকের বৃষ্টিতে একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। খানিক পরেই নেমে যাবে।—ফুলবৌদিকে বললেন: পাশ বালিশটা আমার পায়ের নীচে দিয়ে দাওতো বৌমা!

বাবা চুপ করলেন। আমার কিন্তু ভালো লাগলো না। জ্ঞান হয়ে অবধি বাবাকে কোনোদিন অসুস্থ হতে দেখিনি। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ, তেমনি

বুকের খাঁচা, তেমনি চওড়া হাতের কব্জি। মার মুখে শুনেছি ওমনি অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য দেখেই রেল কোম্পানীর সাহেব বাবাকে চাকরিতে নিয়ে নিয়েছিলেন। নইলে রেল কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কাজ করবার মতো বাবার কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। একেবারে নিম্নপদ থেকে নিজের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা দেখিয়ে ইনসপেক্টার অব ওয়ার্কস হয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের বয়স উত্তীর্ণ হবার পর আরও দু'বছর চাকরি ছিল শুধু অটুট স্বাস্থ্য ও অদ্ভুত কর্ম্মক্ষমতার জন্য। বহুকাল বিদেশে বিদেশে কাটিয়ে অবসর গ্রহণের পর আমাদের সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন আমাদের কেয়টখালী গ্রামের বাড়ীতে।

কিন্তু সারাজীবন যিনি কাজ করেছেন, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ট্রলিতে ট্রলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন রেলের কাজে, অসময়ে নাওয়া-খাওয়াই যাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, অকস্মাৎ তাতে ছেদ টেনে দিয়ে গ্রামের বাড়ীতে কর্ম্মহীন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন তাঁর ভালো লাগবে কেন? তাই দেখতাম, চাকর থাকা সত্ত্বেও নিজের রূপো-বাঁধানো হুঁকোটি নিজেই প্রতিদিন তেঁতুল দিয়ে মাজতেন ও নলের মধ্যে শিক চালিয়ে পরিষ্কার করতেন। দেখতাম, আমাদের শত নিষেধ সত্ত্বেও কুমড়ো ঢ্যাড়স লঙ্কা বা পেঁয়াজ লাগাবার জন্য একটা ছোট্ট কোদালি দিয়ে নিজেই মাটি কোপাতেন। দেখতাম, বিকেলের দিকে নিমের ডাল দিয়ে তৈরী লাঠিটা হাতে নিয়ে গ্রামের পথে দিব্যি একাই বেড়াতে বেরোতেন। ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা উৎরে যেত এবং গ্রামের কেউ লণ্ঠন হাতে পৌছে দিয়ে যেত। এই আটষট্টি বৎসরের যুবক-বৃদ্ধকে গ্রামের প্রতিটি কাজে পাওয়া যেত। কি ফুটবল খেলার মাঠে, কি সমাজপতিদের গুরুত্বপূর্ণ সভায়, কি গ্রাম্য যাত্রা, কবিগান বা নাটকের আসরে, কি যুবকদের লাঠি-ছোরা খেলার আখড়ায় সর্ব্বত্র বাবাকে দেখতাম। কিন্তু কোনোদিন শয্যা নিতে দেখিনি।

অজানিত শঙ্কায় বুকটা দুলে উঠলো! সেই নাছোরবান্দা কাকটার কর্কশ ডাক যেন কানে বাজতে লাগলো।

কিছুনা কিছুনা বলে ব্যাধি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাবা কিন্তু উঠে দাঁড়ালেন কোনো ওষুধ ব্যবহার না করেই মাত্র পাঁচ দিন পরই। আমার জ্যাঠতুতো দাদা অবিনাশকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে আমার হাতে দিলেন পোস্ট করতে।

পড়ে দেখলাম এক সময়। মাত্র কয়েক লাইন, কিন্তু এত বাঁকাচোরা অক্ষর যে, দেখেই বুঝতে পারলাম কম্পিত হাত নিয়ন্ত্রণ করে অনেক মেহনত

করে লিখতে হয়েছে। চমৎকার হাতের লেখা তাঁর। অসুখ যদি সেরেই গিয়ে থাকে, তাহলে সে লেখা কোথায় গেল? অত্যন্ত জেদী মানুষ, বয়স সত্তরের কাছাকাছি এসে গেলেও জেদটা রয়ে গেছে সতেরোর। আমার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল।

স্পষ্ট মনে আছে, আট দিনের সকালে আবার তাঁর জ্বর হয়। বৃদ্ধ এবার বোধহয় অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন। আমায় ডেকে বললেন, সবাইকে তাঁর দেখতে ইচ্ছে করছে। তৎক্ষণাৎ আমি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম বড়দা' অবিনাশ গাঙ্গুলীর কাছে, কাশীতে সুন্দরদা'র কাছে, কলকাতায় মেজদা'র কাছে, আরও কয়েকটি স্থানে। মেজদা'র কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে লিখে দিলাম: Father dying, start immediately!

তৃতীয় দিবসে এর জবাবে পেলাম মেজদা'র ফুলদা'কে সম্বোধন করে কড়া ভাষায় লেখা একখানা পোস্টকার্ড: টেলিগ্রাম করলেই টাকা পাঠাবো, আমাদের কি টাকার গাছ আছে?

জবাবে আবার পাঠালাম টেলিগ্রাম: Horrified noticing callousness —start, Father desires to see you!

এদিকে মাঝে মাঝেই বাবা জ্ঞান হারাচ্ছেন। ডাক্তার বিলাস সাহা এসে গেছেন হাঁসাড়া থেকে, বিজয় সেনও এসেছেন তাঁর হোমিওপ্যাথিক বাক্সটা নিয়ে আর পারিবারিক কবিরাজ রসিক তো সারাক্ষণই রয়েছে। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে আবার জ্ঞান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করছেন: কি রে, ওরা সবাই এল? গ্যানা বোধহয় ছুটি পায়নি, ধীরেনেরও নতুন চাকরি—

বাধা দিয়ে বললাম: না, না, তাঁরা টেলিগ্রাম করেছেন—আসছেন।

কিন্তু এই সান্ত্বনা কি ব্যর্থ হবে? আমার জরুরী তারবার্ত্তা কি এমনিভাবে ভুল বুঝবেন দাদারা? মৃত্যুর পূর্ব্বে সাত-সাতটি ছেলে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী সবাইকে দেখে যাবার অন্তিম ইচ্ছা কি বাবার পূর্ণ হবে না?......বিচলিত হয়ে উঠি, ক্ষোভও মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে ওঠে, কিন্তু মনের সমস্ত বেদনা ও সকল আবেগ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে চেপে রেখে আশার কথা শোনাই মৃত্যু-পথযাত্রী বৃদ্ধকে: আসছেন, তাঁরা আসছেন।......

দলে দলে গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ এসে বাবাকে দেখে যাচ্ছেন, মুসলমান প্রজারা আসছে দল বেঁধে, আসছেন গ্রামান্তরেরও অনেকে। অত্যন্ত জনপ্রিয়

ছিলেন এই বৃদ্ধ। সে যুগের অনগ্রসর সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া গ্রামের অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে বাবার আধুনিক মতবাদগুলি বিপ্লবের অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে দিত। হরিসভা থেকে শুরু করে ফুটবল প্রতিযোগিতার তিনিই ছিলেন স্থায়ী সভাপতি। গ্রাম্য যে সমাজের দাপটে সে যুগে দলাদলি ও রেষারেষি অহর্নিশি উত্তাল হয়ে উঠতো এবং যার ফলে গ্রামের সহজ ও শান্তজীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতো অসহ বিড়ম্বনা, আমার বাবা সে সমাজকে আদৌ পরোয়া করতেন না। বরং ঐ সমাজই তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে চলতো।......

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বিকেলের দিকে শেষবারের মতো বাবার জ্ঞান ফিরে আসে। শয্যাপার্শ্বে আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিরে, ওরা সব এসেছে ?

আবারও মিথ্যে প্রবোধ দিতে হলো ঃ লিখেছে কালই এসে পৌঁছোবে।

আর কাল !—বলে চোখ বুঁজলেন বাবা।

তার পরের ঘটনা বেশ সরল। সারা রাত ধরে চললো যমের সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার। টেনে তাকে ফেলে দিতে না পারলেও সে-ও পারলো না জয়লাভ করতে। সারা শরীরে কম্পন জেগেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, ক্ষীণায়মান নাড়ীর গতি, কিন্তু কি গভীর শান্তির দ্যুতি সারা মুখমণ্ডলে !...সারাটি রাত ঠায় বসে রইলেন তিনজন চিকিৎসক—বিলাস সাহা, বিজয় সেন আর রসিক কবিরাজ। বিলাস সাহা দিলেন ইনজেকশন, বিজয় সেন নাকে লাগিয়ে দিলেন আর্সেনিক আর রসিক কবিরাজ জিহ্বায় ঘষে দিলেন কস্তুরীঘটিত ঔষধ। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী যুগপৎ তিনটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধককে ঠেলে ফেলে দিতে পারলো না সর্ব্বজয়ী মৃত্যু অন্ততঃ সেই রাত্রির মতো।...কিন্তু পরদিন ১৯৩৪ সালের ১১ই জুন সকালে সাড়ে ন'টার সময় সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই বাবার ফুসফুসের ক্রিয়া চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল !

মৃত্যুর প্রাক্কালে আবার ছুটে এলেন দেবেন কাকা, অতুল কাকা। বললেন যে, ঘরের মধ্যে মৃত্যু হলে নাকি আত্মা মুক্তি লাভ করতে পারে না। শাস্ত্রে বলে—

বললাম আমি ঃ আপনাদের সে শাস্ত্র আমি মেনে নিতে পারিনে। খাটের উপর যেমন শান্তিতে শুয়ে আছেন তিনি, তেমনি শান্তিতেই যাত্রা করুন পথিক মহাপ্রস্থানের পথে। টানাটানি করে তাঁর শান্তিতে ব্যাঘাত দেয়া অন্যায় হবে।......

বাবা বলতেন ম্যান্দার বাড়ীর শ্মশানেই তিনি দেহ রাখবেন। এ-ও তাঁর জেদ। নইলে, কলকাতা থেকে মেজদা' কতবার লিখেছেন মা ও বাবাকে তাঁর ওখানে গিয়ে থাকতে, কাশী থেকে সুন্দরদা' কতবার তাঁদের শেষ বয়সে কাশীতে গিয়ে থাকবার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, মা রাজী হলেও বাবা তাতে কর্ণপাতও করতেন না। বলতেন: পূর্ব্বপুরুষ যে শ্মশানে দেহ রেখেছেন, তার মতো পবিত্র স্থান আর নেই। সারা জীবন বাইরে বাইরে কাটিয়ে সেখানেই ফিরে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমার ম্যান্দার বাড়ীর কাছে তোর কাশীও কিছু নয়।

সেই ম্যান্দার বাড়ীর শ্মশানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। গ্রামের লোক সেখানে ভেঙ্গে পড়লো। কোথা থেকে একদল কীর্ত্তনীয়া এসে রাম নাম শুরু করে দিল। শেষশয্যার পাশে রইলাম ফুলদা', রঙ্গলাল আর আমি !......

পরদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে সর্ব্বাগ্রে হাজির হলেন সোনাদা'। তখন সব শেষ হয়ে গেছে! খানিকক্ষণ কাঁদলেন তিনি হাউমাউ করে ছোট্ট ছেলের মতো মায়ের কোলে মাথা গুঁজে! মা যেন স্বামী হারাননি, তিনিই বাবা হারালেন!......তারপর চললেন আমায় নিয়ে ম্যান্দার বাড়ীর শ্মশানে বাবার চিতাভস্ম আনতে। সেখান থেকে এসে উঠলেন টিনের ঘরের দোতলায় বাবার শয়নকক্ষে। সব তেমনি সাজানো রয়েছে।—ড্রেসিং টেবিল, তার ওপর হেয়ার ব্রাশ, ব্রাশে গুঁজে রাখা চিরুনি। গদী-আঁটা খাট, তার ওপর প্রসারিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা। মোটা মোটা দুটো পাশ-বালিশ। পায়ের নীচে ভাঁজ করা সুদৃশ্য বালাপোশের চাদর। মাথার ওপর তোলা নেটের মশারি। ব্রাকেটে বাবার ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী, চাদর ও তার নীচেই খুঁটির কোণে সেই বহু স্মৃতি-জড়িত নিমের লাঠিগাছা।

সোনাদা' পরম শ্রদ্ধাভরে ধীরে ধীরে তুলে নিলেন লাঠিখানা। বললেন: এটা আমি নিয়ে যাবো রে! এই সব জিনিসের মূল্য অনেক।......

সোনাদা'র মুখেই তারপর শুনতে পেলাম কলকাতার মর্ম্মান্তিক অধ্যায়। আমার প্রথম টেলিগ্রাম পেয়েই কাশী থেকে সপরিবারে সুন্দরদা' এসে হাজির হন কলকাতায় মেজদা'র বাসায় একই সঙ্গে সবাই চলে আসবেন বলে। কিন্তু

সেখানে তেমন উদ্বেগ না দেখে বিস্মিত হন তিনি। তারপর প্রকাশ পায় আমার প্রথম টেলিগ্রামকে আমলই দেননি সেজদা'! আমল না দেবার যে কোনো কারণ ছিল না, তা নয়। ফুলদা' যেভাবে মাঝে মাঝে কেয়টখালী থেকে লোমহর্ষণকারী পত্রাঘাত করে কলকাতার দাদাদের ব্যস্ত করে দিয়ে টাকা চাইতেন অবশ্য সাংসারিক প্রয়োজনেই, সেজদা' মনে করেছিলেন আমার নামে প্রেরিত এই টেলিগ্রাম সেই বোকামিরই আর একটি শোচনীয়তর নিদর্শন। তাই এর কথা আর মেজদা'কে না জানিয়ে তিনি নিজেই জবাব দেন পোস্টকার্ডে।

আমার দ্বিতীয় টেলিগ্রাম মেজদা'র হাতে পড়ে। এবার তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, বাবার এমনি সংবাদের ওপর আস্থা স্থাপনের ফলে যদি বোকা বনতে হয়, তাও ভালো। তথাপি আর চুপ করে থাকা আত্মঘাতী অন্যায় হবে। সুন্দরদা' বিশেষ কিছু নয় শুনে তখন ফিরে চলে গেছেন কাশীতে, মেজদা'রও সরকারী চাকরিতে ছুটি নিতে দু'দিন দেরী হতে পারে। তাই সোনাদা'ই যাত্রা করলেন সর্ব্বাগ্রে বৌদি ও পুত্রকন্যা সহ।

এই শোচনীয় ভুল বোঝাবুঝির ফলেই মৃত্যুকালের আশা পূরণ হলো না বৃদ্ধের, ছেলেরা, বৌমারা, নাতি ও নাতনীরা অনেকেই এসে পৌঁছোতে পারলো না সময়মতো।······

দ্বিধাহীন চিত্তে শুধু নয়, পরম শ্রদ্ধাভরে আজ স্মরণ করি আমার সোনাদা'কে।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর ছিল একটুখানি ব্যবধান, একটুখানি পার্থক্য, চিরপরিচিত কালিমা-পঙ্কিল স্তরের একটুখানি উর্দ্ধে বিচরণ করতেন তিনি। সাংসারিক কূটনীতিক্ষেত্রে একেবারে অচল ছিলেন তিনি। ওসব কিছুই বুঝতেন না, বোঝবার চেষ্টাও করতেন না। গায়ে পড়ে কেউ বোঝাতে এলে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতেন এবং এক কান দিয়ে যা প্রবেশ করতো, অপর কান দিয়ে তৎক্ষণাৎ তা বেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। ফলে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সুদুঃসহ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু আমি নিজেই দেখেছি দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ণ মার্কেট অঞ্চলে কী জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর! ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বহু দিন বহু লোকের মুখে শুনেছি তাঁর অশেষ গুণাবলীর কথা আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে একটি প্রিয়জন-ব্যথাতুর দরদী দীর্ঘনিঃশ্বাস!······আমি জানি এবং নিশ্চিতভাবে

জানি যে, অনাত্মীয়দের এই সহানুভূতি-সজল দীর্ঘশ্বাস অনাহত শান্তি দেবে তাঁকে পরলোকে, বিধবা সোনাবৌদি ও তাঁর পুত্রকন্যার শিরে এই দীর্ঘশ্বাস আশীর্ব্বাদের শুভ্র ফুল হয়ে ঝরে পড়বে। যে প্রচণ্ড দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী, নীলাঞ্জন গাঙ্গুলীর জীবনে সে দুঃখের হবে সমাধি, সেই দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন রজনীর হবে অবসান !······

অকস্মাৎ একদিন পুলিশ এসে হানা দিল আমাদের বাড়ীতে। দেখা গেল, এবার লাল পাগড়ির সংখ্যা প্রায় জন কুড়ি, যতীন দারোগা একা নন, সঙ্গে এসেছেন সহকারী দারোগা রবীন দত্ত। বোঝা গেল, এবার সত্যিই তল্লাশী হবে। প্রস্তুত হলাম।

যতীন দারোগাকে যেন একটু গম্ভীর মনে হলো। চা দিতে চাইলাম, আপত্তি জানালেন, বললেন : চা খেতে তো আমি আসিনি। যে কাজে এসেছি তাই শেষ করে চলে যাবো।

তথাস্তু। যতীনবাবু আবার বললেন : মহিলাদের একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বলুন দ্বিজেনবাবু! কেউ যেন এখন এই বাড়ী ছেড়ে না যান, আর নতুন কেউ যেন না আসেন। সব দেখা হয়ে গেলে মহিলাদের দয়া করে একটি-বার আমাদের সমুখ দিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে হেঁটে যেতে হবে, আপনি ওঁদেরকে একটু বুঝিয়ে বলুন দ্বিজেনবাবু! ওঁরা আবার কিছু মনে না করেন—

বাধা দিলাম : না, না, এতে মনে করবার কী আছে। আজ নিয়ে বোধহয় বাইশ বার এই বাড়ী তল্লাশী হচ্ছে, একটি ছুঁচও পাওয়া যায়নি কোনো কালে। কিন্তু যতীনবাবু, আজ মহিলাদের সম্বন্ধে এতটা সতর্কতার কারণ জানতে পারি কি? বোধহয় কোনো পলাতক রাজনৈতিক আসামী মহিলা সেজে লুকিয়ে আছে, এই সংবাদই পাঠিয়েছে আই বি কর্ত্তারা?

যতীনবাবু হেসে বললেন : হবে হয়তো।

শুরু হলো তল্লাশী বেশ তোড়জোড় করে। আমি কিন্তু প্রতিবারের মতো নিশ্চিন্তেই ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। একেবারে যে কিছু নেই, তা নয়। একটা রিভলভার, গোটা চারেক ছোরা ও থানদশেক বাজেয়াপ্ত বই আছে।

কিন্তু কোথায়? দক্ষিণের কোঠার দেয়ালে একটি কুলুঙ্গি আছে, তার ওপর চমৎকার করে একখানা বড় ক্যালেণ্ডার-আঁটা। পুলিশের মগজে কুলুঙ্গির কথা আসতেই পারে না, কারণ আর কোনো কোঠায় এমনি কুলুঙ্গি নেই।···আমার নির্লিপ্ততায় যতীন দারোগা যে খুশী নন, তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আমার।

কিন্তু আমার কাঁচের আলমারির বইগুলো তল্লাশীর সময় অকস্মাৎ যেন সাপ বেরিয়ে পড়লো। যতীন দারোগা মহা উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন: Here it is! here it is! যা চেয়েছিলাম, তাই। স্কুল থেকে চুরি-করা বই! রবীন, ভালো করে খুঁজে দেখ, আর কতখানা এমনি ব্লেড দিয়ে স্কুলের সীল-কাটা বই পাওয়া যায়।

চমকে উঠলাম। তাহলে হেনা পূর্ব্বাহ্নেই সব সরাতে পারেনি দেখা যাচ্ছে। কোনোখানাতেই সীল নেই সত্য, কিন্তু মালখানগর, রুসদী, ষোলোঘর, হাঁসাড়া প্রভৃতি স্কুল থেকে যেসব বই সম্প্রতি উধাও হয়ে গেছে, এগুলো যে তারই অন্যতম, সে সত্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।···চোরাই মাল পাওয়া গেছে। সোজা চারশো এগারো ধারা। এবার কোথায় যাবে দ্বিজেন গাঙ্গুলী?···স্পষ্ট দেখতে পেলাম, যতীন দারোগার চোখেমুখে খুশীর হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক আলো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। আর তল্লাশী করে কী হবে? প্রয়োজন কী? এবার শুধু প্রয়োজন চমৎকার করে তল্লাশী-তালিকা তৈরী ও নিখুঁতভাবে রিপোর্ট রচনা। বিশেষ বার্ত্তাবহ মারফত সেই রিপোর্ট ঢাকাতে পাঠাতে-না-পাঠাতেই আসবে গ্র্যাসবি সাহেবের ফরমান্: Arrest that scoundrel! তার পরের ঘটনাগুলো ঘটবে দ্রুতগতি যন্ত্রের মতো—গ্রেপ্তার, তদন্ত, চার্জ্জশীট দাখিল, মুন্সীগঞ্জে বিচার, উকিলের সওয়াল···তারপর গম্ভীরমুখে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কালীপদ মৈত্রের রায়···অতএব, আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই গভর্ণমেণ্ট ও সম্রাটের অনুগত প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার খাতিরে আমি আসামী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারদণ্ডের আদেশ দিতেছি······

একটু চা হবে কি?

আমার প্রশ্নে চমকে উঠলেন যতীন দারোগা। আকাশ-কুসুম রচনায় বোধ হয় বাধা পড়লো! বললেন: চা? না, না, চায়ের প্রয়োজন নেই, এবার তাড়াতাড়ি থানায় যাবার আয়োজন করতে হয়।

উনিশ-শো আটাশ সালে গোবরকে চকিতে চিৎ করে ফেলে দিয়ে অসংখ্য শীল্ড, কাপ ও মেডেল নিয়ে সমবেত জনতার মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনির মাঝে কুস্তিগীর গামা যেভাবে কলকাতার পার্ক সার্কাসের বিরাট মণ্ডপের বাইরে এসে উঠেছিলেন অপেক্ষমান মোটরে, ঠিক তেমনি আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে কোলাহলরত পুলিশদের মধ্য দিয়ে যতীন দারোগা আট-দশখানা বই হাতে নিয়ে গট গট করে এসে উঠলেন তাঁর অপেক্ষমান নৌকোয়। সদলবলে রবীনও গিয়ে তাঁর নৌকোয় আরোহণ করলো। দেবেন কাকা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য জমির কারিগর ছিলেন তল্লাশীর সাক্ষী, সাদা তালিকার নীচে স্বাক্ষর করে তাঁরা সরে পড়লেন। পাড়ার কৌতূহলী দু'চারজন এসেছিলেন দর্শক হয়ে, তাঁরাও নৌকো ভাসালেন।

যতীনবাবুর পশ্চাতে আমিও এসে নৌকোয় উঠলাম এবং পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তমিজদ্দী চৌকিদারের লম্বা দাড়ির ফাঁকে হাসির ছুরি চকচক করছে। এইবার শালা বোধহয় তার ঘরে আগুন লাগানোর প্রতিশোধ নেবে আর পাবে মোটা রকমের বখশিশ।......

বেশ ভারিক্কি সুরে কথা কইলেন যতীন দারোগা: কোথায় পেলেন এই বইগুলো?

উদাস কণ্ঠে জবাব দিলাম: কিনেছি—সে অনেক কাল আগে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথে। যাই বলুন, ভারী সস্তা কিন্তু দারোগাবাবু, মাত্র চার আনা করে।

ভেতরের স্ট্যাম্পগুলো সাবধানে কাটা কেন?

কেন-র যা উত্তর হতে পারে, তাই দিলাম: চোরাই মাল-টাল হবে হয়তো। নইলে জলের দামে দেয় কী করে।—এই দেখুন না, গোর্কির মাদার, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, সঞ্চয়িতা, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—এর এক-একখানার সত্যিকার দাম কত, একবার ভেবে দেখুন!

আমার হাত থেকে বইগুলো ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে নিজের কোলের পাশে গুছিয়ে রাখলেন দারোগাবাবু বিড়ালছানার মতো। তারপর বেশ টেনে উচ্চারণ করলেন: হুঁ—মুস্কিল কি জানেন দ্বিজেনবাবু, কিছু দিন হলো গোটাকয়েক স্কুল থেকে এমনি ধরনের অনেকগুলো বই চুরি গেছে। জানেন না সে সংবাদ?

কই, না তো!

স্কুলগুলির তালিকা দিলেন দারোগাবাবু, তারপর বললেন: বইগুলো আমায় একবার থানায় নিয়ে যেতে হবে, স্কুলের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

প্রমাদ গুণলাম! বেশ বুঝতে পারলাম, থানায় গেলেই সব বেফাঁস হয়ে যাবে এবং এই চুরির মধ্যে স্বদেশীর কটু গন্ধ একবার পেলেই ঝপাঝপ্ গ্রেপ্তার করে ফেলবে ছেলেদের। মামলাও চালাবে নিশ্চয়ই, সাজা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছুই নয়। অবশেষে কি পরাজয় মানতে হবে পুলিশের কাছে?

ঘাবড়ে না গেলেও একটু চিন্তিত হলাম। বোধহয় কোনো সূত্র থেকে সংবাদ পৌঁছেছে শ্রীনগর থানায়। আই বি-র কান অবধি বোধহয় এখনও পৌঁছেনি, নইলে এই তল্লাশী-অভিযানের পুরোভাগে নিশ্চয়ই দেখা যেত সেই বীরপুঙ্গব দলকে। পুরো কেরামতিটা নিজেই গলাধঃকরণ করবার উদ্দেশ্যে বড় দারোগাকে দিয়ে এই তল্লাশীর হুকুম করিয়ে নিয়ে এসেছেন যতীন দারোগা! তাই আজ এত গম্ভীর তিনি সেই শুরু থেকেই। তাই চা—

অকস্মাৎ আবার বললাম হেসে: সে যা করেন, করবেন'খন মশায়। এখন আসুন তো, একটু চায়ের বাটিতে চুমুক দেয়া যাক্—

না, না, চা খাবো না, পেটটা আজ সকাল থেকে খারাপ যাচ্ছে। বাড়ীতেই খাইনি।—বলে একটু অস্বস্তির ভান করলেন তিনি।

বোঝা গেল, আজ আর চা চলবে না। ব্যাটা চালাক হয়ে গেছে।

একথা সেকথা তাই শুরু করলাম ওর মনটা হাল্‌কা করে দেবার জন্য। দেশের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতি থেকে শুরু করে একেবারে আজকের ইলিশ মাছের দর পর্য্যন্ত আলোচনা হলো। কাটলো অবশ্য ঘণ্টাখানেক, কিন্তু দেখলাম, ইলিশ মাছের ঝোল, ঝাল, ভাজা, তেঁতুল সহযোগে পাতলা টক্, এমন কি, সরষে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাতের মধ্যে ভাপে রান্নার সরস উপাখ্যানেও যতীন দারোগার মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হলো না।······

বইগুলো সে নিয়ে যাবেই।

রবীন এসে জানালো: স্যার, বেলা বারোটা বাজে।

এ্যাঁ,—চমকে উঠলেন দারোগাবাবু: বল কি? তাহলে এক কাজ কর। তোমার নৌকোয় সিপাইদের নিয়ে চলে যাও তুমি। আমি পরে আসছি, বলো বড়বাবুকে।

রবীন স্যালুট করে বেরিয়ে গেল। ওদের নৌকো চলে গেল। রইলো গোটাচারেক মাল্লা আর দুটো পুলিশ আর যতীন দারোগা। তমিজদ্দী একটু আড়ালে গেল বিড়ি খেতে। আমার দলবল নিয়ে এ কটা লোককে শায়েস্তা করা কিন্তু আমার কাছে কঠিন কাজ নয়। বইগুলো ছিনিয়ে নিয়ে একবার জলে ফেলে দিতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। বর্ষার স্রোতে কোথায় তলিয়ে যাবে হদিসই তার পাওয়া যাবে না। কিন্তু গায়ের জোর সর্ব্বত্র সমানভাবে নির্ব্বিচারে প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো সময় কব্জির চাইতে মগজের শক্তি বেশী কার্য্যকরী দেখা যায়! এ ক্ষেত্রেও মগজ চালানোই প্রশস্ত মনে হলো। অবশ্য দেখলাম, প্রতিপক্ষও আজ অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ।

তথাপি কালবিলম্ব না করে আসরে নেমে পড়লাম বুদ্ধির ক্ষুরধার তলোয়ার নিয়ে। সে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলায় যতীন দারোগার ম্যাজিনো লাইনের কংক্রীট কচু কাটবার মতো কেটে ফেলতে লাগলাম। সহস্র রকম যুক্তিপূর্ণ কথার পদাতিক সেনা ছড়িয়ে দিলাম পিপীলিকার মতো। দারোগার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ক্বচিৎ জবাবের কামানের অবিশ্রাম গোলার আঘাতে তারা দলে দলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও রক্তবীজের ঝাড় এগিয়ে চললো, যেমন করে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির নেশায় জার্ম্মাণ গুলী-গোলা অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে এগিয়ে চলেছিল ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল।

আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথার হাল্‌কা অবতারণায় যোগ দোব না বলে শপথ গ্রহণ করে দারোগা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকলেও আমার সাঁড়াশি অভিযানের সম্মুখে তাঁর নির্লিপ্ততা কতক্ষণ টিঁকে থাকতে পারবে? তাই ঘণ্টাখানেক প্রতিরোধের পর যতীন দারোগা পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হলেন, ডানকার্কের পুনরাবৃত্তি হলো!······

আমার কম্বুকণ্ঠ যুক্তির অগ্নিস্রাব ছড়িয়ে তখন ধাওয়া করে চলেছে পলায়মান শত্রুকে: এতে আপনার ব্যক্তিগত লাভ কী হবে, সত্যি করে বলুন তো? ওপরওয়ালার কাছ থেকে দু'এক লাইন প্রশংসা-বাণী ব্যতীত আর কী পাবেন? ওতে পেট ভরবে কি? স্ত্রী পুত্র নিয়ে আপনিও তো বাস করেন, মিষ্টি কথার চাইতে দুটো টাকার মূল্য আপনার কাছে বেশী নয় কি?···আর এ একেবারে দুটো নয়, পুরো একশো টাকার কথা বলছি। কাল সকালে গিয়ে আমি একটি একটি করে দশখানা নোট গুণে দিয়ে আসবো আপনার বাড়ীতে।···যতীনবাবু,

আমরা যে কাজে আত্মোৎসর্গ করেছি, সে কাজ তো সমগ্র দেশের, আপনারও। দেশ স্বাধীন হলে শান্তি পাবেন আপনি নিজেও। প্রকাশ্যভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন না সরকারী চাকরি করেন বলে, তা স্বীকার করি। কিন্তু এমনিভাবে যদি কিছু করা যায়, যাতে আমাদের যেমন সাহায্য হয়, তেমনি আপনিও না ধরা পড়ে যান, তাহলে কেন তা করবেন না আপনি? দেশের নামে স্বদেশী দলের পক্ষ থেকে এই অনুরোধটি কি করতে পারিনে আমি আপনাকে?

দুর্য্যোধনের মতো একেবারে উরু ভেঙ্গে পড়বার পূর্ব্বে যতীন দারোগা বিড়-বিড় করতে লাগলেন: তবুও তো জানেন, honesty of profession বলে একটা জিনিস আছে তো—

এবার একেবারে এ্যাটম বোম নিয়ে আকাশে উঠলাম: Honesty of profession? কার কাছে? এই অত্যাচারী বৃটিশের কাছে honesty? ভারত অধিকারের কালো ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠায় আছে কি এদের honestyর কথা? কোথাও দেখিয়েছে কি এরা বিন্দুমাত্র সততা? বেইমান প্রভুর কাছে সাধুতার সার্থকতা আছে কি?—

যতীনবাবু বললেন: কিন্তু ব্যাপার কি জানেন দ্বিজেনবাবু, রবীন জেনে গেছে যে কতকগুলো বই পাওয়া গেছে।

বাধা দিয়ে বললাম: রবীন! ওর সাধ্য হবে এ এস আই হয়ে আপনার মতো একজন senior officer-এর বিরুদ্ধে যাবার?

জানেন না দ্বিজেনবাবু, আমাদের পুলিশ লাইনটাই এমনি হারামির জাত। Boss-এর কানে লাগিয়ে নিজের উপকার কিছু করতে পারুক আর নাই পারুক, পরের অপকার করবার চেষ্টা সব শালাই করে থাকে।

হেসে বললাম: আচ্ছা, তাহলে না হয় ঐ রবীন শালাকেও দোব গোটা পঞ্চাশেক। তাহলে তো আর ভাবনা থাকবে না?

এবারে যতীনবাবুর ভারী ও শক্ত ঠোঁট দু'খানি হালকা ও আলগা হয়ে এল, দু'পাশে খানিকটে প্রসারিত হয়ে পড়লো, খানিকটে ফাঁকও হয়ে গেল আর তার মধ্য দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারলো গোটাচারেক তাম্বুলচর্চ্চিত কালো রংয়ের দাঁতের অগ্রভাগ। যতীনবাবু হাসছেন, রীতিমতো মুচকি মুচকি হাসছেন, অর্থবোধক হাসি তাঁর সারা মুখমণ্ডলে চকচক করছে। বললেন: তা যা বলেছেন দ্বিজেনবাবু,

টাকা পেলে ও শালারা ঢেঁকিও হজম করে ফেলতে দ্বিধা করবে না। এমনি হারামির জাত!

মনে মনে বললাম: আহা, কী আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! পঞ্চাশ নিলে যদি হারামির জাত হয়, তাহলে তার ডবল নিলে কী হয়? কিন্তু, যাকগে—

কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। আমার ফাঁদে গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন দারোগাবাবু। হ্যাঁচকা একটি টান মারলেই একেবারে ফাঁসি, ভল্লুক তখন টুমটুমির তালে তালে নাচবে। এবার তাই সিংহাসনত্যাগী ঔরংজেবের অভিনয় শুরু করলাম: না, না, ভেবে দেখুন যতীনবাবু, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, এ ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। এ পথে আমরা যখন নেমেছি, তখন সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েই এসেছি। কিন্তু তা বলে আপনার ব্যক্তিগত অকল্যাণ আমাদের কাম্য হতে পারে না। ফিরিয়ে নিয়ে যান না বইগুলো, যদি মনে করেন তাই আপনার কর্ত্তব্য। কী আর হবে এর ফলে? জনকতক ছেলে ধরা পড়বে, রাজবন্দীর সংখ্যা কিছু বেড়ে যাবে আর হয়তো আমার সাজা হয়ে যাবে কয়েক বৎসর!—তা হোক না, এখানে থেকে আমি তো সেই শুভদিনেরই প্রতীক্ষায় আছি, দেশের কাজে আন্দামান, ফাঁসি—

মহা অপরাধীর মতো গল্ গল্ করে উঠলেন যতীন দারোগা: ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন দ্বিজেনবাবু! নিন্, এই নিন্ বইগুলো, আজই সরিয়ে ফেলবেন। রবীনকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নোব। আপনি সকাল ন'টার মধ্যেই সোজা আমার বাসায় গিয়ে উঠবেন। মনে রাখবেন, বাবুদের বাড়ী ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে যাবেন, থানার কেউ যেন না দেখে।

বইগুলো নিয়ে ছুইয়ের বাইরে আসতে যতীন দারোগা আবার বললেন: রবীন—তা পনরোখানা নোটই নিয়ে যাবেন দ্বিজেনবাবু, কেমন? সাপের জাতকে বিশ্বাস নেই মশাই! আর আমার ওখানে আপনার চা খাবার নেমন্তন্ন রইলো, বুঝলেন?

বললাম: চা তো আমি খাইনে।

খান না?

না, কারণ আপনি নিজে আজ আমার এখানে চা খেলেন না।

হা হা করে পাগলের মতো হেসে উঠলেন যতীন দারোগা, বললেন: খাবো,

খাবো। শুধু চা কেন, একেবারে পেট ভরে খেয়ে যাবো একদিন। আরে মশাই, তাও কি নিশ্চিন্তে পারবার যো আছে? ঐ আই বি শালাদের কি মশাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানটুকুও থাকতে নেই? Honesty of professionটুকুও তো রাখতে পারে?

মনে মনে হাসি পেল। চোরাই মাল হাতে পেয়ে দেড়শো টাকার লোভে তা ছেড়ে দিয়ে সাধুতার পরকাষ্ঠা দেখালেন উনি। আবার বড়াই হচ্ছে honestyর!

নৌকো ছাড়বার সময় গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতিটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন: আপনার জন্য আমি প্রতীক্ষায় থাকবো কিন্তু দ্বিজেনবাবু! সকাল ন'টার মধ্যেই—

নৌকো ম্যান্দারবাড়ীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই রঙ্গলাল এসে জানালো: প্রায় দুটো বাজে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। শেখরনগর যেতে হবে মনে আছে তো?

...কিন্তু পর দিন, তার পর দিন, তারও পর দিন এবং তারও পর পর করে করে অনেক দিনই চলে গেল, আমার নৌকো কোনো সকাল বেলাই আর বাবুদের বাড়ী ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে চুপি চুপি যতীন দারোগার ঘাটে ভিড়লো না।

বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার প্রতীক্ষা আর শেষ হলো না!

সাত

এমনিভাবে 'এপ্রিল ফুল' হবার পর যতীন দারোগা আর আসেননি আমাদের বাড়ীতে। তাঁর মনের উত্তাপ আমার গায়ে সোজাসুজি এসে না লাগলেও তা টের পেতে দেরি হলো না আমার। থানায় হাজিরা দিতে গেলে সবাই কলরব করে আমায় সম্বর্দ্ধনা জানালেও যতীনবাবুকে দেখতাম অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর, কাগজপত্র ও ফাইলের প্রতি বেশী রকম মনোযোগী খালের ধারে ধ্যানরত বকের মতো। ক্ষুদ্রতম মাছ দেখলেই যে তিনি তৎক্ষণাৎ লম্বা ঠোঁট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তার ওপর, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তাই আমাদের সতর্কতা আরো বৃদ্ধি করা হলো। স্কুল থেকে আনা বইগুলো আর প্রকাশ্যে বার করা হতো না, বাজেয়াপ্ত বইয়ের মতো গোপনে চলতো আদানপ্রদান। ওর মধ্যেই বাছাই করে কতকগুলো বাজে বই ফুলদা'কে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো ইছাপুরায় ফুলবৌদিদের ওখানে। সেখানে সেগুলো একেবারে মাটির নীচে কবর দেয়া হলো। এই গুপ্ত গ্রন্থাগারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দেয়া হলো রাজদিয়ার মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে। বিপ্লবী দলে একদিন আমিই তাকে নিয়ে এসেছিলাম সত্যি, কিন্তু উত্তরকালে প্রখর বুদ্ধি চালনায়, কর্ম্মক্ষমতায়, সংগঠনের দক্ষতায় সে আমাকেও স্তম্ভিত করে ফেলেছে! বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের বোধহয় একজনও সদস্য নেই, যিনি মধুসূদনকে চেনেন না বা তাব নাম শোনেননি। অতি সাধারণ তার চেহারা, কথা কয় সে অত্যন্ত ধীবে অনুচ্চকণ্ঠে, চলাফেরা একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন, শুধু অদ্ভুত তার হাসি। কঠিনতম সংকটময় মুহূর্ত্তেও তার অধরে দেখেছি অপরিম্লান সেই হাসির ঝিলিক। একেবারেই মাটির মানুষ মনে হয়েছে তাকে। রাজদিয়া গ্রামে তাদের বাড়ীকে বলা হতো পণ্ডিতবাড়ী। দাদা ব্রজেন্দ্রদাস কাব্যতীর্থ রাজদিয়া হাই স্কুলের পণ্ডিত। সম্মানিত ব্যক্তি, স্বল্পভাষী ও যুক্তিবাদী। স্কুলের আয়ের ওপব সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না বলেই বাড়ীতে তাঁর একটি প্রেস, নাম হরিদাস প্রেস। সাংসারিক ব্যক্তি হলেও ধর্ম্মভীরু এবং স্বভাবতঃই স্নেহশীল।

মধু দাদার এই স্নেহশীলতার সুযোগ নিয়ে কী যে কাণ্ডকারখানা কবেছে, বাইরের লোক তার কতটুকু সংবাদ রাখে! ঐ হবিদাস প্রেসে কত যে বিপ্লবী

ইস্তাহার ছাপানো হয়েছে, কত যে পলাতক রাজনৈতিক আসামী মধুদের বাড়ীতে রাত্রেই সযত্নে সাজানো এক থালা খাবার পেয়েছেন এবং পেয়েছেন রাত্রিযাপনের মতো বিছানা ও মশারি, আই বি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তা। অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আদৌ হাঁকডাক না করে নীরবে সমস্ত কাজ পরিচালনা করতো ঐ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। তন্তরের সুবোধ চক্রবর্ত্তীর মতোই মধুও বহু ছেলেকে এবং গোটা-কতক মেয়েকেও দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের দলে।

অনেক কাল ছাড়াছাড়ির পর ১৯৪৪ সালে সিকিউরিটি বন্দী হিসেবে রাজসাহী জেলে গিয়ে আবার শুনলাম মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের অদ্ভুত গুণপনার ইতিবৃত্ত। শুনলাম, জেলের সিপাইগুলোকে সে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছিল। বাইরে থেকে আসতো জাতীয়তাবাদী নানারকম বই, দলীয় জরুরী পত্র এবং ভেতরের সব সংবাদ বাইরে যথাস্থানে নিরাপদে গিয়ে পৌছে যেত এই মধুরই সুচতুর ব্যবস্থাপনায়। অসংখ্য দল ও উপদল এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য প্রবল থাকলেও অবিসংবাদিত প্রশংসা শুনতে পেলাম আমার বন্ধু মধুর। আমি জলপাইগুড়ি জেল থেকে রাজসাহী জেলে স্থানান্তরিত হয়ে আসবার ক'দিন পূর্ব্বেই মধুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বক্সা দুর্গে। তাই দেখা হলো না।

কিন্তু ভারী আনন্দ পেলাম। বর্ণের সঙ্গে পরিচয় যার একদিন আমিই করিয়ে দিয়েছিলাম, আর একদিন সে যখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো সহস্রদল মৃণালের মতো, তখন দুনিয়ায় সবার চাইতে বেশী তৃপ্তি পেলাম আমি নিজে। এই শিক্ষকতায় যে কী আনন্দ, তা তাঁরাই শুধু জানেন, যাঁরা এমনি শিক্ষকতা করেছেন।

কূটবুদ্ধি ভীরু গুরু দ্রোণাচার্য্যের মতো শিষ্য একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উপঢৌকন চাইবার শোচনীয়তম মুহূর্ত্ত এতে দেখা দেওয়া দূরে থাক্, এতে আছে সৃষ্টির আনন্দ, ছাত্রের কাছে পরাজয়ের অননুভূত শান্তি, অগ্রবর্ত্তী শিষ্যের উপর্য্যুপরি বিজয়ে রোমাঞ্চকর তৃপ্তি!

কলকাতা এসেও মধু বিপজ্জনক অনেক কাজ করেছে। এক সময় মাসিক পত্রিকা 'বেণু' প্রতাপ চাটার্জ্জী লেনের যে 'যন্ত্রলেখা' প্রেস থেকে ছাপানো হতো, মধুই তার তত্ত্বাবধান করতো দারুণ ঝুঁকি নিয়ে। অনেক গোপনীয় ইস্তাহার সে প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে। অনেক গোপন বৈঠক বসেছে সে প্রেসের

কার্য্যাধ্যক্ষের কক্ষে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের দান অনস্বীকার্য্য!

১৯৩৪ সাল শেষ হয়ে গেল। মনে পড়লো, একটি একটি করে বন্দিজীবনের দীর্ঘ চারিটি বৎসর যেমন কাটালাম, তেমনি বয়সও এসে পৌছোলো পাঁচশের কোঠায়। ধীরেনদা'র উৎকট উৎসাহে বহরমপুর বন্দীশিবিরে থাকাকালীন আই এ পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছি বটে, কিন্তু তারপর বি এ-র বইগুলো আর কিছুতেই ছুঁতে পারিনি। বাইরে এলে যে আমাদের পক্ষে আর পড়াশুনার সময় পাওয়া কঠিন, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এরপর অবশ্য বি কম পরীক্ষা দিয়েছি এবং পাসও করেছি। কিন্তু সে-ও রাজসাহী সেনট্রাল জেলে সিকিউরিটি বন্দিজীবন যাপনের সময় ১৯৪৫ সালে।

১৯৪৫ সালের কথা যখন এসেই পড়লো, তখন রাজসাহী সেনট্রাল জেলে থাকাকালীন একটি মজার ঘটনা না বলে পারছি না।

পূর্ব্বেই বলেছি, ১৯৪৪ সালে মেটেলীতে যখন আমি একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, জলপাইগুড়ির আই বি পুলিশ তখন আমায় গ্রেপ্তার করে এবং আই বি ইনসপেক্টার রহমান আসেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে। মাস তিনেক জলপাইগুড়ি জেলে কাটাবার পর যাই রাজসাহীতে।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে একদিন বিকেলে জেল সুপার এ সি দত্ত আমায় অফিসে ডেকে পাঠান। বগুড়ার জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আমার নামে সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসেবে সমন পাঠিয়েছেন এবং হুকুম করেছেন ২৮শে জুন বেলা দশ ঘটিকায় তাঁর আদালতে উপস্থিত হতে। উপস্থিত না হলে আইন অনুসারে আমার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, সমন-পত্রে ছাপার অক্ষরে তা-ও লেখা আছে।

দত্ত বললেন: একখানা সই করে দিন, আর-একখানা আপনি নিন।

জিজ্ঞেস করলাম: তারপর?

তারপর আর কি? যাবেন কি করে? ও সমনের কোনো মূল্য নেই। বেশ মুরুব্বি চালে মন্তব্য করলেন দত্ত মহাশয়।

মনে মনে হাসলাম। চারখানা দেয়ালের মধ্যে যাঁর আধিপত্য সীমাবদ্ধ,

দেয়ালের বাইরে যে তাঁর মতো বা তাঁর চাইতেও জাঁদরেল আরও কত নবাব আছেন এবং তাঁদের অঙ্গুলিহেলনে যে কত কুরুক্ষেত্র সংঘটিত হতে পারে, সুপার সাহেবের সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। যাকগে, আমার কি! বললাম: তাহলে একটা কাজ করতে হয়। আদালতের হুকুমনামা হাতে পেয়েও যে তা পালন করবার ক্ষমতা আমার নেই, সে কথাটা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিতে হয়। এখনই একখানা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি এইভাবে যে, মহাশয়, আপনার সমন পাইলাম। কিন্তু যেহেতু এক্ষণে আমি রাজসাহী সেনট্রাল জেলে নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক রহিয়াছি এবং যেহেতু জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব আপনার সমন সত্ত্বেও আমাকে যাইতে দিতে নারাজ, সেই হেতু—

দাঁড়ান, দাঁড়ান! বাধা দিলেন দত্ত: আমি যেতে দিতে নারাজ কে বললো?

কেন, আপনিই তো বললেন, ও সমনের কোনো মূল্য নেই। হেসে বললাম: বেশ তো, মূল্য যদি আছেই মনে করেন, তাহলে যেতে দিন, চলে যাই। সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে আসি। বন্দীকে সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব না ছাড়লে সে যাবে কি করে?

দত্ত কোনো জবাব না দিয়ে সমন-পত্রখানা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। না, কোনো ভুল নেই। আমি যে আর মেটেলীতে নেই, বর্তমানে মহামান্য বৃটিশ সরকারের অতিথি হয়ে এই রাজসাহীতে অবস্থান করছি, বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট তা জানেন। তাই সমন-পত্রে মেটেলীর নয়, রাজসাহীর ঠিকানা লেখা। তবে?

দত্ত সাহেবের মাথা-ভরা টাক। সেই টাকেই হাত দিয়ে কল্পিত চুল টানতে লাগলেন নীরবে। আমি ফোঁড়ন দিলাম: ২৮শে জুন বেলা দশটায় না যেতে পারলে আমার নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হবে বলে পরিষ্কার বলা হয়েছে। কিন্তু আমি যেতে না পারলে দায়ী হবেন কিন্তু আপনি, সেটা যেন ভুলবেন না।

এমন সময় সাইকেলে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। তাঁরও হাতে ওমনি দুই কপি সমন-পত্র। একখানাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপারকে লিখেছেন আমার এসকোর্টের ব্যবস্থা করতে এবং অপরখানায় সেই নির্দেশেরই কপি পাঠিয়েছেন জেলের সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে for information and necessary action—

Necessary action ! যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন দত্ত ! কার ওপর, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। বললেন : কি এ্যাকশন নোব আমি ? সরকারী হুকুমে উনি আছেন এখানে, সরকারী হুকুম দাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

ভদ্রলোকটি সহজভাবেই বললেন : ম্যাজিস্ট্রেটের এই মেমোই সরকারী আদেশ স্যার।

মাপ করবেন স্যার। বাধা দিয়ে বললাম : নিরাপত্তা বন্দীরা সরকারের যে স্তরের অতিথি, সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অচল, যাকে বলে, আলট্রা ভায়ার্স। হোম পলিটিক্যাল্ বিভাগের হুকুম ছাড়া আমায় ছেড়ে দিয়ে মিস্টার দত্ত যদি ঝুঁকি নিতে চান, নিন, আমি কিন্তু যাবো না। আমার হোস্টের হুকুম কোথায় ? যান না, আপনার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলুন না গিয়ে আমার নামে একখানা অর্ডার করে দিতে যে, তুমি ২৮শে জুন বগুড়ায় গিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে এস। দেখি, আপনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষ্যামতা !

দত্ত আবার টাকের চুল টানতে লাগলেন। এমনি চুল টেনে টেনেই লোকটা সারা মাথায় টাক সৃষ্টি করেছেন নাকি ?···কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই জটিল। হোম পলিটিক্যালের হুকুমে আমি রয়েছি জেলে। এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেটেব সমন। হয়তো থোড়াই কেয়ার করা যেত সমনকে যদি না আমি সরকারী সাক্ষী হতাম। কিন্তু সমন অনুযায়ী বন্দীকে বগুড়া যাবার হুকুম কে দেবে ? নিশ্চয়ই হোম পলিটিক্যাল। মাঝখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাক গলাচ্ছেন কেন ? যদি গলিয়েই থাকেন, তাহলে স্পষ্ট করেই বলুন না আমায় যে, তুমি বগুড়া যাও ও আবার ঘুবে এস। শুধুশুধি সুপারকে বলে লাভ কি ? হোম পলিটিক্যাল বলেছে until further order বন্দাকে আটকে রাখতে আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন বগুড়া পাঠাতে। এখন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি ?··· টাকে একগাছিও চুল না পেয়ে দত্ত বোধহয় টাকের চামড়াই টানতে লাগলেন।

এমন সময় সাইকেল রিকসায় নামলেন আর একজন ভদ্রলোক। এসেই পরিচয় দিলেন, তিনি আই বি ইনসপেক্টার। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন যথাবিধি ও যথারীতি হোম পলিটিক্যাল বিভাগের অর্ডার। আমার পরিচয় পেয়ে একখানায় আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন, অপরখানা আমায় দিয়ে গেলেন। তৃতীয় একখানা দিয়ে গেলেন দত্ত সাহেবকে।

আই বি ও সেই ভদ্রলোক চলে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দত্ত :

রেডি হয়ে থাকবেন। কাল সকাল দশটায় আপনার ট্রেন। বগুড়া সাব-জেলে আমি একটা message পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জিজ্ঞেস করলাম : সাব-জেলে কেন?

সাব-জেলেই তো নিয়ে যাবে আপনাকে, দত্ত জবাব দিলেন : কাল রাতটা সেখানে থেকে পরশু যাবেন কোর্টে।

মাপ করবেন, তৎক্ষণাৎ বাধা দিলাম : সরকারী হুকুমনামায় আমায় এখান থেকে বগুড়ার আদালতে যেতে বলেছে ও তারপর আবার আপনার এতিমখানায় ফিরে আসতে বলেছে। ওসব সাব-জেল টাব-জেলের নামগন্ধ নেই এতে।

আবার দত্তের মুরুব্বীয়ানা দেখা দিল : কিন্তু রাত্রে তো আর আপনাকে বাইরে কোথাও থাকতে দেয়া যেতে পারে না।

বললাম : সেজন্য যদি আপনার মাথা গরম হয়ে থাকে, তাহলে দিন না, একখানা অর্ডার দিন না আমায় যে, কাল রাতে আমায় সাব-জেলে থাকতে হবে।

এঁ্যা! আবার টাকে হাত দিলেন দত্ত : আমি অর্ডার দোব কি!

আর বুদ্ধিতে কূল পেলেন না, ডাকলেন জেলারকে। জেলার বললেন : কথাটা ঠিকই। সাব-জেলে যেতে উনি বাধ্য নন। গভর্নমেণ্ট বলছে ওঁকে সাক্ষ্য দিয়ে আসতে। সাব-জেলে পাঠাতে হলে গভর্নমেণ্ট-অর্ডার আসতো। আমরা কি করে সেখানে পাঠাবো?

ব্যস, আবার জটিল প্রশ্ন। নাঃ, দত্তের টাকের চামড়া বুঝি আর থাকে না!······

পরদিন সকালে এসকোর্ট পার্টি এলে তাদের কমাণ্ড সার্টিফিকেটেও দেখা গেল লেখা রয়েছে to escort him to the Court and back to jail আর মুখে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসকোর্ট পার্টি রীতি অনুযায়ী আমায় ঠিক এসকোর্ট করবে না, শুধু ফলো করবে। কারণ, আমার এই যাওয়া-আসা কোনো ট্রান্সফার নয়। অতএব—

অতএব ২৭শে জুন সকাল দশটার ট্রেনের একটি ইণ্টার ক্লাস কামরায় আমি দিব্যি উঠে বসলাম এবং বগুড়ার উদ্দেশে রওনা হলাম মেটেলীর ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররূপে। ম্যানেজারের কথাটা বললাম এজন্য যে, আমার ব্যাঙ্কে একটি জাল চেক ভাঙ্গাতে চেষ্টা করা হয়। ভাঙ্গানোও হয়ে যায়, কারণ যার এ্যাকাউন্ট

তার স্বাক্ষরের সঙ্গে অফিসে রেকর্ড-করা স্বাক্ষরের হুবহু মিল ছিল। জালিয়াৎ তার পরে ধরা পড়ে বগুড়ায়। তাই সেখানে সেই চেক জালের মামলা শুরু হয়েছে, আমি যাচ্ছি সাক্ষ্য দিতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররূপে।

আমায় ফলো করবার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত, তারা হলো দু'জন সশস্ত্র হিন্দুস্থানী সিপাই আর একজন আই বি-র এ এস আই। প্রথম সম্বোধনেই এ এস আই যখন আমার চাইতে অন্ততঃ বছর দশেকের বড় হয়েও আমায় 'দাদা' বলে ফেললো, তখনই বুঝলাম এর মাথায় শুধু কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া কেন, এর পুরো মাথাটাই চর্ব্বণ করে ফেলা মোটেই কঠিন হবে না। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি একজন সরকারী সাক্ষী এবং সরকারী হুকুমমতো বর্ত্তমানে স্বাধীনভাবে বগুড়ায় যাচ্ছি। ফলো করতে এসে আমায় বেশী ঘাঁটালে সুবিধে হবে না।

ভাইটি আমার দাদার কথায় তৎক্ষণাৎ তথাস্তু করে মাথা নীচু করলেন। কড়া মেজাজ দেখাবার পর কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যারোমিটারের পারাটা নামিয়ে আনতে লাগলাম, দু'এক টুকরো হালকা মন্তব্য বেরিয়ে পড়তে লাগলো এবং এক-আধ ঝলক মুচকি হাসিও উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো এবং ঘন্টা চারেক পর দাদা দ্বিজেন গাঙ্গুলী ও ভাই মন্মথ দত্ত একই ছড়া থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে মর্ত্তমান কদলী ভক্ষণ করতে লাগলো। যেন রাম আর লক্ষ্মণ!······

সন্ধ্যেবেলায় বগুড়ায় নেমে কোথায় গিয়ে উঠলাম জানেন? আজ্ঞে না, সাব-জেলে তো নয়ই, কোনো হোটেলে বা কারুর বাড়ীতেও নয়, সোজা একেবারে পুলিশ ক্লাবে। পুলিশ অফিসাররাই শুধু মফস্বল থেকে এসে দু'দিনের জন্য সেখানে ওঠেন, সেখানে এসে আস্তানা গাড়লেন নিরাপত্তা বন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

বন্দী হলে কি হবে, তখন আমি সরকারী সাক্ষী। সুতরাং ধমক দিলাম চাকরকে বাথরুমে জল কম আছে বলে, ধমক দিলাম রাঁধুনী ঠাকুরকে রান্না ভালো হয়নি বলে, ধমক দিলাম সিপাই দুটোকে আমার ঘরের মেঝেতে শুতে চাইছিলো বলে, ধমক দিতে হলো লক্ষ্মণ-ভ্রাতা মন্মথকেও তার অহেতুক চাকরি হারাবার কথা বার বার বলছে বলে।

সবাইকে ধমকে-ধামকে সচকিত, চমকিত ও আতঙ্কিত করে দিয়ে রাত প্রায় বারোটায় মশারির মধ্যে ঢুকে পড়লাম ও অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাক্ষ্য-টাক্ষ্য তেমন কিছু নয়, দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু

রাজসাহী থেকে বগুড়া আসা ও যাওয়া এবং শহরে এক রাত্রি যাপনের বাবদ রাহা-খরচ ও ভাড়া বাবদ যা পাওয়া গেল, তা মন্দ নয়। আমি যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররূপে সাক্ষ্য দিতে এসেছি, সুতরাং মাইনে ও স্ট্যাটাস অনুযায়ী আমি পেলাম রেলের সেকেণ্ড ক্লাসে যাতায়াতের ভাড়া এবং এক রাত্রি হল্টের জন্য সাড়ে সাত টাকা।

রাস্তায় বেরিয়েই বললাম : মন্মথবাবু, চলুন, বাজারে যাই। বন্ধুরা বলে দিয়েছেন তাঁদের জন্য কিছু নিয়ে যেতে। চলুন, কিছু আম, লিচু ও কিছু চকোলেট ও লজেন্স কিনে আনি।

ঘাবড়ে গেলেন মন্মথবাবু : বাজারে আর কেন দাদা, এই তো এই রাস্তার ধারেই সব পাবেন, এখান থেকেই কিনে নিন।

আপনি বড্ড ভীতু, ধমকের সুরে বললাম : হাজার বার বলেছি, এমন কিছুই করবো না যাতে আপনার চাকরি নিয়ে গোলমাল হতে পারে, তবুও আপনার ভয়। আরে মশাই, একদিনকা সুলতানের মতো যখন জেলের বাইরেই আসতে পেরেছি, তখন স্বাধীনতাটা বেশ ভালো করেই উপভোগ করা যাক্‌না। এতে আপনার ক্ষতি কি ?—আবার কবে বাইরে আসতে পারবো, কত বছর পরে, কে জানে! কণ্ঠস্বর বেশ ভারী করে কথাগুলো উচ্চারণ করে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখেই বিষণ্ণমুখে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম ভ্রাতাটির প্রতি! আহা, দাদার সেই করুণ মুখখানি কি ভাইটি সইতে পারে ? বললেন মন্মথবাবু : তাহলে চলুন রিকসায় যাই।

তথাস্তু।……

সারা বগুড়া শহর চষে ফেললাম। বড় রাস্তা, অলিগলি, কাণা গলি ঘোরা-ঘুরি করে, যেখানে-সেখানে নেমে চা ও মামলেট খেয়ে এক বস্তাবোঝাই আম ও ঝুড়িবোঝাই লিচু ও কয়েক পাউণ্ড চকোলেট ও লজেন্স কিনে নিয়ে যখন শহরতলীর দিকে রিকসা চালাতে বললাম, তখন বিকেল চারটে বেজে গেছে। মন্মথবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন : দাদা, ঠিক ছ'টায় আমাদের ট্রেন।

বললাম : আজ আর যাবো না। তার চাইতে চলুন ছ'টার শো-তে সিনেমায় যাই।

সিনেমায়! মন্মথবাবু কেঁপে উঠলেন : দাদা, তাহলে আমার চাকরি যাবে। আজ ছ'টার ট্রেনে যদি না যাই—

বলে দেবেন ডেটিনিউ তার শরীর খারাপ লাগছে বলে শুয়ে রইলো, ওদিকে ট্রেনের সময় গেল পার হয়ে। আবার ধমক দিলাম : আপনি মশাই, বড্ড ভীতু। আপনি তো আমায় এসকোর্ট করছেন না, শুধু ফলো করছেন। সুতরাং যা বলি ও করি, শুধু ফলো করে যান। যদি দরকার হয়, না-হয় লিখে দোব আমি যে, মন্মথবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও আমি বিকেলের ট্রেনে যাইনি, তাহলেই হবে তো?

অত্যন্ত নিমরাজী হয়ে মন্মথবাবু আমার সঙ্গে পুলিশ ক্লাবে ফিরে এসে সিপাই দু'জনকে কি বলে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমরা পরদিন সকালের ট্রেনে উঠবো এবং আমরা দু'জনে একটু ঘুরেফিরে রাত ন'টায় ফিরবো। ঠাকুর ও চাকরকেও জানানো হলো ও বকশিশ বাবদ গোটা চারেক টাকা তাঁর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

কোন্ সিনেমায় গিয়েছিলাম, আজ আর মনে নেই। তবে মনে আছে সিনেমাগৃহের পাশেই একটি বড় পুকুর এবং দু'খানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে আমরা দু'জন সেই পুকুরের ধারে বসে বেশ গল্প করছিলাম। আমার প্রতি মন্মথবাবুর বিশ্বাস গত দেড় দিন মেলামেশার পর বেশ দৃঢ় হয়েছে বোঝা গেল, কারণ সিনেমা শুরু হতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরী আছে দেখে তিনি বাজার থেকে গোটাকতক কলাই-করা বাটি ও গেলাস কিনে আনবার প্রস্তাব করলেন। আমিও পুনরায় তাঁকে নির্ভয় হবার উপদেশ দিয়ে বিদায় দিয়ে সিনেমাগৃহের লাউঞ্জের দিকে অগ্রসর হতেই একেবারে মুখোমুখি রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রহমান, মানে, জলপাইগুড়ির সেই আই বি ইনসপেক্টার রহমান। মেটেলীতে আমায় যিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন। দেখেই অসীম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করলেন : আরেঃ, দ্বিজেনবাবু, আপনি এখানে? আপনাকে রিলিজ করে দিয়েছে নাকি?

পাল্টা প্রশ্ন করলাম : আপনি এখানে কেন?

আমার বাড়ী যে এখানে, জবাব দিলেন রহমান : দশ দিনের ছুটিতে এসেছি, কালই চলে যাবো। তারপর আপনি আমাদের দেশে কেন?

সিনেমা দেখতে এসেছি। হেসে জবাব দিলাম।

সিনেমা দেখতে! হাঁ করে চেয়ে রইলেন রহমান। সবই খুলে বললাম

তাঁকে। রহমানও বললেন যে, মাসিক একশো টাকা এ্যালাউন্সের জন্য সুপারিশ করেছেন তিনি। তাঁদের খাতায় নাম নেই এমনি আমায় যখন শুধু কলকাতার রিপোর্টের ওপরই কনফারমড্ করে দেয়া হলো, তখন আমার এ্যালাউন্স-এর পরিমাণটা যাতে মোটা হয়, সেজন্য আমার কেস-টা খুব জোরদার করে লিখেছেন তিনি।

অকস্মাৎ দূরে মন্মথবাবুকে দেখা গেল এবং আমার সামনে রহমানকে দেখে তাঁর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হলো। তিনি এগোবেন, না পেছোবেন বুঝতে না পেরে একেবারে অহল্যার মতো পাথর হয়ে গেলেন!

বোঝা গেল, রাজসাহীর আই বি-র লোক হয়েও জলপাইগুড়ির আই বি রহমানকে উনি চেনেন। কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানের আই বি অফিসার ও কর্ম্মীর মধ্যে যোগসূত্র থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক জায়গার আই বি অফিসারের রিপোর্টে যে অপর জায়গার আই বি কর্ম্মচারীর চাকরি নিয়েই বিভ্রাট দেখা দিতে পারে, মন্মথবাবুর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা দেখে বেশ অনুমান করতে পারলাম। তাই লক্ষ্মণ-ভ্রাতার জন্য অবশেষে সরাসরি আসরে নামতে হলো। অভয় দিয়ে হাতের ইশারায় ডাকলাম তাঁকে।

বলির পাঁঠার মতো কাছে আসতেই রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম: এই ভদ্রলোককে চেনেন?

যথেষ্ট।

বললাম: ইনিই আমায় ফলো করে এসেছেন এবং কাল সকালের ট্রেনে ফলো করে আবার রাজসাহী নিয়ে যাবেন। আমার মতো বিশ্বাসী রাজবন্দীকে এখানে রেখে কিছু সওদা করতে গিয়েছিলেন।—ঐ দেখুন, হাতে কলাই-করা বাটি। এখন ব্যাপারটা কি জানেন রহমান সাহেব—একেবারে আসল কথাতেই এসে পড়লাম: সিনেমার দু'খানা টিকিট কিনেছি। আমাদের সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে।

না, না, এ বই আমি দেখেছি। রহমান আপত্তি জানালেন।

হেসে বললাম: দেখুন রহমান সাহেব, আপনাদের, আই বি-দের বিশ্বাস করা কঠিন। কে জানে, হয়তো জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়েই সোজা কর্ত্তার নামে একখানা কনফিডেনসিয়াল ছেড়ে দিলেন শীলমোহর করা খামে—বগুড়ায়

দেখিলাম সিকিউরিটি প্রিজনার দ্বিজেন গাঙ্গুলী ও রাজশাহীর এ এস আই মন্মথ দত্ত একসঙ্গে সিনেমা দেখিতেছে।—ব্যস, চাকরিটি খোয়ালেন ইনি।

কি যে বলছেন, বাধা দিলেন রহমান : গায়ে পড়ে ওমনি চুকলি করা আমার স্বভাব নয়।

তা জানি, তৎক্ষণাৎ মেনে নিলাম : তবু আমার অনুরোধে বিশেষ এই চাকুরে ভদ্রলোকের নিশ্চিন্ততার জন্য আপনাকে আমাদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে হবে। নিজেও সিনেমা দেখে, শুধু উনি আর আমি দেখেছি, এমনি কথা কিছুতেই বলবেন না আপনি, এ বিশ্বাস আছে।

রহমান হেসে ফেললেন, তারপর বললেন : আচ্ছা বেশ, আপনার অনুরোধে বসবো আপনাদের সঙ্গে। তবে সত্যিই আমার কাজ আছে, কিছুক্ষণ বসেই চলে যাবো। আর বললাম তো, এ ছবি আমি দেখেছি পরশু দিন।

মন্মথবাবু, আর-একখানা টিকিট—

না, না, আমার টিকিট লাগবে না, বললেন রহমান : আমার এখানে টিকিট লাগে না। রহমান জবাব দিলেন।

তারপর তিনজন গিয়ে সিনেমা গৃহে প্রবেশ করলাম। দু'জন আই বি-র লোক, একজন ইনসপেক্টার আর একজন এ এস আই এবং সে-যুগের অন্যতম ঝঞ্ঝাটে নিরাপত্তা বন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলী। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেড় দিনের এই স্বাধীনতা এমনিভাবে উপভোগ করবার সৌভাগ্য ক'জন রাজবন্দীর হয়েছিল জানি না।

অভিভাবকেরা কিন্তু ভাবলেন, এই অবসরে যদি বিবাহের শৃঙ্খলে আমায় একবার বেঁধে ফেলতে পারেন, তাহলেই তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। পরাক্রান্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আতিথ্যেরও একদিন শেষ আছে, কিন্তু বিবাহের বন্ধন একেবারে অটুট ও অবিনশ্বর!

গোপনে চললো তাঁদের সলা-পরামর্শ, উদ্যোগ-আয়োজন। গুপ্ত সমিতির বিশিষ্ট সদস্য আমি নিজে, বাঘের ঘরে ঘোগের মতো আমাকেই ফাঁকি দিয়ে চললো তাঁদের গোপন অভিযান। ধীরে ধীরে একটি দলই পাকিয়ে ফেললেন তাঁরা। মরণি পিসিমা নিয়ে এলেন কয়েকটি মেয়ের সংবাদ, আরও অনেক

শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়ে এলেন আরো অনেক মেয়ের সংবাদ অর্থাৎ কেয়টখালী গ্রামের প্রায় সব মেয়ের পক্ষ থেকেই অলিখিত আবেদন-পত্র গোপনে এসে অন্ততঃ একবার করে নিবেদিত হলো মার কাছে।

কিন্তু আমায় জানাবে কে? বিবাহ তো করতে হবে আমাকে। সুতরাং আমার তো মেয়েগুলোর ইতিবৃত্ত জানা দরকার। কিন্তু কার স্কন্ধে দশটা মাথা আছে যে, এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়?···অনেক ইতস্ততঃ, অনেক সঙ্কোচ ও অনেক দ্বিধার পর সাহসে ভর করে স্বয়ং মা-ই এসে একদিন সন্ধ্যায় হাজির হলেন আমার কক্ষে।

মাকে আমি দুঃখ দিয়েছি অনেক, বোধহয় তার সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতাম মা-ই আমায় ভালবাসেন সবার চাইতে বেশী। অপরেও জানতো। বোধহয় সে জন্যই মাকেই পাঠানো হলো আমায় ঘায়েল করবার জন্য। সব খবরই ছিল আমার নখদর্পণে; তাই মা যেই ভূমিকা শুরু করলেন, আমি আসল প্রসঙ্গে এসে পড়লাম: কিন্তু আমায় কে বিয়ে করবে বল! এমনি বোকা মেয়ে এখনো আছে নাকি?

মা বললেন: মেয়ে আছে অনেক, তবে তারা একটিও বোকা নয়। একবার রাজী হয়ে যা দেখি, তার পরের সব ব্যবস্থা আমি করবো'খন।

প্রসঙ্গ হালকা করে ফেলতে চেষ্টা করলাম: নাম দাও তো মেয়েগুলোর, একবার আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে আসি। সবাই কি এই কেয়টখালীর, না দূরের মেয়েও আছে?

মা গম্ভীর হলেন: না, শোন্, তুই আর আপত্তি করিস না। বিয়ে করবি, এই কথাটা শুধু আমায় দে বাবা। আমার শেষ বয়সের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দে।—বলে মা আমার মাথায় হাত রাখলেন।

বিচলিত বোধ করলাম। হাত ধরে অনুরোধ জানাবার মতো মা আমার মাথা স্পর্শ করেছেন। শেষ বয়সের আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথাটি এমন ধরা গলায় উচ্চারণ করলেন যে, সহসা তার জবাব খুঁজে পেলাম না। বাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমায় ডাক্তারী পড়াবেন, আমায় বিলেতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনবেন, আমায় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তৈরী করবেন। মনে আছে, আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই মেজদা'র কাছ থেকে অনেকগুলো লিখিত হিসাব সংগ্রহ করেছিলেন তিনি, কোন্ লাইনে পড়াতে কত খরচ, ভর্তির উপায়

কি এবং ভবিষ্যতে কেমন উন্নতি হতে পারে ইত্যাদি। তাঁর একটি আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করতে পারিনি। আটষট্টি বৎসর বয়সে আমার সম্বন্ধে হতাশা নিয়েই চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। বিয়ের প্রস্তাব তাঁর কাছেও বহুবার গেছে এবং সে আজ থেকে নয়, আমার বড় দু'জন দাদার বিয়ে হবার আগে থেকেই। কিন্তু বাবা বেশ ভালো করেই জানতেন তাঁর অবাধ্য ছেলেকে। তাই অনেক সময়ই দোতলায় শুনতে পেতাম তাঁর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ : তা যান না, যান না ঐ দক্ষিণের ঘরে। আগে ওকে রাজী করিয়ে আসুন। মেয়ে-দেখা ও দেনা-পাওনার কথা তার পর হবে। কেউ আর আমার কাছে আসতে সাহস করেনি। বাবাও কোনোদিন ভুলেও বিয়ের কথা তোলেননি। মার মুখে আমার মনোভাব জানতে পেরে ক্ষোভে চুপ করে থাকতেন।……

আজ এসেছেন মা। শেষ বয়সের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দাবী জানাচ্ছেন। না, দাবী নয়, অনুরোধ। মাথায় হাত রেখে কাতর অনুরোধ! আত্মীয়েরা, প্রতিবেশীরা, গ্রামবাসীরা সবাই মিলে একই অনুরোধ জানাচ্ছেন, বিয়ে কর, সংসার ধর্ম্ম পালন কর, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা দিয়ে পরিবার গড়ে তোল। কিন্তু এঁরা সবাই মিলে কি আমায় হত্যা করতে চান? যে একটিমাত্র পথ জীবনে বেছে নিয়েছি, সে-পথে চলতে গিয়ে পদে পদে দুঃখ দিয়েছি অনেককে। আমার মেধা ও বুদ্ধির ওপর তৈরী করা অনেকের অনেক রঙীন পরিকল্পনার কুতুবমিনার ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছি। শুধু দীর্ঘশ্বাসের কালো মেঘ নয়, অশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণে পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। তথাপি—তথাপি এগিয়ে চলেছি আমরা দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন বুকে নিয়ে দুর্জ্জয় সাহস আর অন্তরে নিয়ে অপরিম্লান আশা……আমাদের এই সুকঠিন তপশ্চর্য্যা অবশেষে কি গৌরী এসে ভেঙ্গে দেবে?

তাই যুক্তির আশ্রয় নিতে হলো : তুমি বুঝছো না মা, তোমাদেরই শান্তি দিতে পারলাম না কোনো দিন, এর মধ্যে আবার আর একজনকে কেন টেনে আনতে চাও বলতো! বিয়ে করবার সময় কোথায় আমাদের? আর জোর করে জুটিয়ে দিলেও সে ঝামেলা পোহাবে কে? সে দায়িত্ব পালনের অবসর কোথায়? বৃথাই আর একটি পরিবারের শান্তি নষ্ট করা হবে মাত্র।

মা তবু ছাড়তে চাইলেন না : বৌমা তো হবে আমার মেয়ে, আমার হেনার মতো। তোমার আবার ভাবনা কি? দায়িত্ব তোমার নিতে হবে না কিছু।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্তও আমার সঙ্কল্পে অটল রইলাম আমি, মা ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন। এর পর ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন সত্যিই বিয়ে করলাম, তখন আর মা বেঁচে নেই। মা শুধু ফটোই দেখলেন তাঁর ভাবী পুত্রবধূর, হেনার মতো আর-একটি মেয়েকে আর কাছে আনতে পারলেন না।......

সে কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত করবো।

আট

বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই একটি করে ড্রামেটিক ক্লাব আছে, যার সদস্যদের পেশা আদৌ নয়, নেশা হচ্ছে প্রতি বছর একবার বা সম্ভব হলে একাধিকবার নাটকাভিনয় করা। কোনো কোনো গ্রামে হয়তো কোনো বড়লোকের পক্ষপুটচ্ছায়ায় এই ক্লাব গড়ে ওঠে ও টিঁকে থাকে। বড়লোকটিরই চণ্ডীমণ্ডপের বিপরীত দিকে মঞ্চ বাঁধবার উপযোগী করে তোলা একটি টিনের ঘর আছে। সিনগুলো গুটিয়ে ওপরে বাঁধা থাকে আর উইংগুলো থাকে মাথার ওপর তোলা। ছ'-তিন বাক্স পোশাক-পরিচ্ছদও আছে, সযত্নে তা রক্ষিত হয় ঐ বড়লোকেরই গৃহে। উনিই ক্লাবের আজীবন সদস্য ও সভাপতি এবং কার্য্যতঃ ডিকটেটার। কারণ অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয় একাই বহন করেন উনি নিজে। আর যে গ্রামের ড্রামেটিক ক্লাব গরীব অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য যাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের চাঁদার ওপর, সেখানে প্রায়ই হানা দেওয়া হয় কারুর চণ্ডীমণ্ডপে অথবা সুবিধেমতো কোনো ঘরেই। হয়তো কখনো অস্থায়িভাবে একখানি একচালা খাড়া করা হয়, আবার অভিনয়ের পর তা ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়।

আরো দরিদ্র নাটুকে দল আছে, যাদের সঙ্গতির দৈন্য ঢাকা পড়ে যায় সদস্যদের সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রাবল্যে। মঞ্চ বাঁধবার জন্য এরা হয়তো কারুর শোবার ঘরেরই বেড়াগুলো খুলে ফেললো, হয়তো গোটা দুই খুঁটিই খুলে ফেলে দিল এবং গোটাকয়েক তক্তাপোশ জুড়ে তৈরী করে বসলো বিরাট রঙ্গমঞ্চ। এরা বাঁশ ও দড়ি থেকে শুরু করে সিন, উইংস্, পোশাক-পরিচ্ছদ, গোঁফ, দাড়ি ও মেয়েদের চুল—সবই ধার করে নিয়ে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে।

মুসলমান মাঝিরা নৌকো চালনার লগি ও পাল দিয়ে সানন্দে সাহায্য করে থাকে আর মেয়েরা ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্—সাহায্য করে থাকেন শাড়ী ও ব্লাউজ দিয়ে।

গ্রামের অভিনয়ের আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভূমিকালিপি নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে পার্টগুলো লিখে ফেলা হয় এবং সেগুলো বন্টন করা হয় শিল্পীদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই থাকেন বিভিন্ন শহরে কর্ম্মব্যপদেশে। তাতে কোনোই অসুবিধে হয় না ড্রামেটিক ক্লাবের। কারণ বিদেশে অফিসে কলম চালাবার ফাঁকে ফাঁকে নায়ক বা সহকারী নায়ক যখন রামের পার্ট মুখস্থ করতে থাকেন, তখন গ্রামে চলতে থাকে পুরোদমে মহলা। সেখানে প্রক্সি দিয়ে রাম বা লক্ষ্মণ চালানো হয়। এমনিভাবে ঢাকা, কলকাতা," ময়মনসিংহ বা বরিশালে হয়তো প্রস্তুত হতে থাকেন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও সীতা। অবশেষে ক্যাজুয়েল লীভ অথবা তাতে সুবিধে না হলে প্রিভিলেজ লীভের সুযোগ নিয়ে একদিন ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল থেকে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এসে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হন। অভিনয়ের দু'চারদিন পর আবার এঁরা নিজেদের চাকুরীস্থলে ফিরে যান। এমনি নাটকের নেশা বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই আছে।

কেয়টখালী গ্রামের এই নাটুকে দলের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন—আজ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি—ডাঃ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিসপেনসারি ছিল বটে একটা বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়দের বৈঠকখানা ঘরে কিন্তু তার আলমারিগুলো যেমন খালি তেমনি প্রায় সময়ই তার দরজায় ঝুলতে থাকে বড় একটি তালা। ডাক্তারবাবুর জায়গা-জমি যা আছে, তাতেই চলে যায় তাঁর সারা বছর। চিন্তাভাবনা যখন তেমন কিছু নেই এবং অবসর যখন প্রচুর, তখন স্বভাবতঃই গ্রামের নাটুকে দলের সভাপতির আসন পাবার যোগ্যতম ব্যক্তি তিনি। মহলা হতো তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও উপস্থিতিতে। একটি হুঁকো হাতে করে একখানা চেয়ার নিয়ে এক কোণে বসে থাকতেন তিনি সজাগ দৃষ্টি মেলে। কারুর ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। মহলায় নিয়মিত উপস্থিতির জন্য ডাক্তারবাবুর বানরসেনার একটি অক্ষৌহিণী ছিল। দশ মিনিট দেরি হলেই এরা এসে একেবারে বাড়ীতে হাজির হতো এবং ঘাড়ে চেপে বসে থাকতো যতক্ষণ না শিল্পী-আসামী এসে হাজির হতো মহলা-কক্ষে।

আরো বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে নিজের নাতিদীর্ঘ ও

অপুষ্ট দেহের সুযোগ নিয়ে ডাক্তারবাবু একেবারে ব্যালাড গার্লের ভূমিকায় নেমে পড়তেন এবং রীতিমতো যৌন-আবেদনময় লাস্য নৃত্যে আবহাওয়া একেবারে সরগরম করে তুলতেন। মাথার চুল বা গালের দাড়ি একগাছিও কালো ছিল না তাঁর, তথাপি অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ ও চটুল নৃত্যে ঐ অঞ্চলে নর্ত্তকী ডাক্তার উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না বলা চলে। সংলাপ উচ্চারণ করা তাঁর অবশ্য একটু শক্ত কাজ ছিল, কারণ পূর্ব্ববঙ্গীয় বিশেষ একটা টান প্রায় প্রতি শব্দেই এত স্পষ্ট হয়ে ধ্বনিত হতো যে, দিল্লীর দরবারে মতি বাঈয়ের কথা শুনে বার বারই মনে হতো বুঝি ঢাকা থেকে আমদানী করা হয়েছে তাঁকে। নিজে আবার ছিলেন নৃত্যশিক্ষক। ছোট ছোট ছেলেদের রিক্রুট করে মজুমদার বাড়ীর মণ্ডপে এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন করে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। অভিভাবকরা এতে এতটুকুও আপত্তি করতেন না, কারণ ডাক্তারবাবু নাটক-পাগল হলেও নীতিরক্ষায় তিনি ছিলেন একেবারে পাথরের মতো কঠিন!······

কেয়টখালী গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় আমাদের বাড়ী। গ্রামের নাটুকে দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়েও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নাটকাভিনয় করবার অধিকার ছিল আমার। প্রত্যেকটি অভিনয়ের পশ্চাতে আমাদের রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন একটা অভিসন্ধি ছিল বলেই এই অধিকার খুব ঘন ঘন প্রয়োগ করতাম আমি, বিশেষ করে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা কালে। ১৯৩৫ সাল পড়তেই আমরা মহলা শুরু করলাম মন্মথ রায়ের "কারাগার" নাটকের। ভূমিকাগুলো বণ্টন করা হলো এমনি সব ছেলেদের মধ্যে, এক দিকে যেমন তাদের অভিনয়ের যোগ্যতা আছে, তেমনি দলে টানবারও উপযুক্ত তারা। আমাদের বাড়ীতেই মহলা শুরু হলো নিয়মিতভাবে।

সরস্বতী পুজোর রাত্রে অভিনয় হবে ঠিক করা হলো। রাজদিয়ার হরিদাস প্রেস থেকে বাকিতে ছাপিয়ে নিয়ে আসা হলো নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রোগ্রাম। কংসের ভূমিকায় অবতরণ করবো আমি নিজে। আমাদের বাড়ীর পুব দিকে আমাদের শরিকদের পরিত্যক্ত বাড়ীতে মঞ্চ নির্ম্মিত হলো। বছিরদ্দী মুসলমান-পাড়া থেকে অসংখ্য বাঁশ, দড়ি ও নৌকোর পাল এনে দিল। হাঁসাড়ার বান্ধব সম্মিলনী ধার দিলেন সিন ও উইংস। পূর্ব্বেই বলেছি, অভিনয়ে আমার খুব সুনাম

ছিল। তাই শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, আশেপাশে অনেকগুলো গ্রামের দর্শকেরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সরস্বতী পুজোর রাত্রিটির জন্য।······

ঠিক আগের দিন। দক্ষিণের কোঠায় সকাল বেলা নর্তকীদের নৃত্যের মহলা শুরু হয়েছে সঙ্গীত পরিচালক রঙ্গলালের পরিচালনায়। শুরু হয়ে গেছে সঙ্গীত:

ফুলবাড়ীতে ফুটলো যে ফুল
খায় মধু তার ফুলটুকি—

রঙ্গলাল নতুন-শেখা বেহালায় ছড় টানছে, আমি বাজাচ্ছি হারমোনিয়াম, রসিক কবিরাজ ঠুক ঠুক করে করতালে ঠোকা দিচ্ছে আর তার ভাই উমেশ বাজাচ্ছে তবলা। ছোট ছোট আটটা ছেলে ঘুঙুর বাজিয়ে, কোমর দুলিয়ে, হাতে নানারকম মুদ্রা দেখিয়ে চীৎকার করে গান শুরু করেছে:

ভ্রমর-বঁধু পালিয়ে গেছে
মধুহারার মুখ শুঁকি।

এমন সময় একেবারে এ্যাটম বোমা নিয়ে গট্ গট্ করে এসে হাজির হলেন স্বয়ং যতীন দারোগা। সঙ্গে মাত্র একজন পুলিশ। যেন ক্ষুদ্র স্টেশনে অপেক্ষা করছেন তুফান এক্সপ্রেসের জন্য। থামবে মাত্র এক মিনিট, তারই মধ্যে উঠে পড়তে হবে। এমনি স্মার্ট!

গড় গড় করে বললেন: I am extremely sorry Dwijen Babu—

বাধা দিলাম: কেন?

There is a transfer order by the Government—আপনাকে আবার Village internment-এ যেতে হবে, একেবারে মেদিনীপুর, কেশিয়াড়ী থানায়।

বলেই তিনি দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানা সরকারী হুকুমনামা বার করলেন। ছাপানো ফরম, মাঝে মাঝে ফাঁকগুলো টাইপ করে পূরণ করা। স্বাক্ষর যাঁর পেয়েছিলাম, তাঁর নাম—যত দূর মনে পড়ে, গদাধর সিংহ রায়। স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের অন্যতম সেক্রেটারী।

ভারী খুশী দেখলাম যতীন দারোগাকে। এতদিন পর তাড়াতে পেরেছেন বিক্রমপুর থেকে দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে। এবার সুনিদ্রা হবে তাঁদের। সুখে ঘরকন্না করতে পারবেন। আমি একটু চিন্তিত হলাম বৈ কি! এতগুলো নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়া হয়ে গেছে, স্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে, বিশেষ ধরনের দৃশ্যগুলোর জন্য বিশেষ

সব জানালা ও দরজা ও কারাগার তৈরি করা হয়েছে মুলি বাঁশের বাতা দিয়ে ফ্রেম করে তাতে রঙীন বা সাদা কাগজ সেঁটে। শহর থেকেও দু'চারজন শিল্পী আসছেন, সঙ্গে আসছেন তাঁদের দু'চারজন বন্ধু কংসরূপী দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দেখতে। সমস্ত আয়োজন শেষ, ঠিক এমনি সময় এসে যতীন দারোগা যেন নিক্ষেপ করলেন হিরোসিমার ওপর এ্যাটম বোমা!···

হারমোনিয়াম বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র, নর্ত্তকীদের বিদায় করে দেয়া হলো এবং যতীন দারোগা আমার আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই সোজা ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং একখানি চেয়ার দখল করে বসলেন। চোখেমুখে যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতির বেপরোয়া ভাব!

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে রটে গেল। বিক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে সবাই এসে হাজির হলেন। পাড়ার কাকারা, কাকীমারা, ছেলেরা, মেয়েরা, বছিরদ্দী ও তার সাকরেদের দল, পুব পাড়ার খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জন—গ্রামের অনেকেই। খোকা কোলে করে দেখলাম রেণুও এসেছে, এসেছে সুহাসিনীও।

সাহসে ভর করে রসিক কবিরাজ জিজ্ঞেস করলো: একদিন পরে গেলে হয় না দারোগাবাবু? আমাদের নাটকের এমনি আয়োজন—

না, হয় না। সরকারী হুকুম অমান্য করবার সাধ্য আমার নেই।—সংক্ষেপে সেরে দিলেন দারোগাবাবু।

রঙ্গলাল বললো: কিন্তু সাধারণ নিয়মে বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখবার পর তো ছেড়ে দেওয়া হয়।

তা হয় আমিও জানি। কিন্তু আপনার দাদার ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। কারণ আপনার দাদার ব্যাপার সাধারণ নয়, অসাধারণ।—বলে কাষ্ঠ-হাসি হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বিপদ যুক্তি দেখালো: কিন্তু সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে যে—

মুরুব্বি চালে বললেন দারোগাবাবু: তা সরকারী আদেশের কথা বলে সবার কাছে মাপ চেয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

বোঝা গেল, কোনো উপায় নেই। দেখলাম মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সবার সঙ্গে। আমি হেসে বললাম: মা, যাক, কিছুদিনের জন্য বিয়ের অত্যাচার থেকে বাঁচা যাবে।

মা কোনো কথাই কইলেন না। কী-ইবা আর বলবেন। এত কাল বলে

যেখানে কোনো দিন কোনো কথাই থাকেনি, সেখানে মিছে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? সন্তানবৎসল মা-বাবার কোনো কথাই, শুনিনি কোনো দিন, বরং সারাটি জীবন আমাদের কথাই জোর করে চাপিয়ে দিয়েছি তাঁদের ওপর !......

উপায়ান্তর নেই। তাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। বহরমপুর বন্দী শিবিরে থাকতে প্রকাণ্ড একটা চামড়ার ট্রাঙ্ক কিনেছিলাম, তাতেই সব ভরে ফেললাম। আর পেছনে চেয়ে লাভ নেই, আর মায়া করে কাজ নেই। প্রায় দু'বছর বাড়ীতে কাটালাম। এই দু'বছরে কাজ যা করেছি, তার হিসাব করবে তারাই, যাদের রেখে গেলাম। সারা বিক্রমপুরে যে বীজ ছড়িয়ে গেলাম, আশা করি একদিন সেই বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং ফল ধরবে। আমার অনুপস্থিতি তখন আর অনুভূত হবে না, কারণ পূর্ব্ব-সূরীদের কাছ থেকে রিলে হয়ে বিপ্লবের ঝাণ্ডা উত্তর-সূরীদের হাতেই যায়। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। এক দল দেহরক্ষার প্রাক্কালে আর-এক দলের হাতে দিয়ে যায় হাতিয়ার। অনির্ব্বাণ অলিম্পিক বর্ত্তিকার মতো !......

গরম গরম মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে বাইরে এসে দেখি জনসমাবেশ আরো বেড়ে গেছে ততক্ষণে। প্রায় ভিড় বলা চলে। আমার চামড়ার ট্রাঙ্কটা সটান মাথায় তুলে নিয়ে বছরদ্দী বললো: লন, আমি স্যুটক্যাসটা থানায় পোছাইয়া দিয়া আসতে আছি।

বললাম: সে কি রে, সে যে প্রায় চার মাইল।

চল্লিশ মাইলেরেও ডরাই না কর্ত্তা! আমাগো যা কইরা থুইয়া গেলেন, খোদাই তা জানে।—বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বছিরদ্দী।

সর্ব্বাগ্রে মাকেই প্রণাম করবার রীতি হলেও কাকাদের, কাকীমাদের, বৌদি ও পাড়ার দিদিদের সবাইকে প্রণাম করে সবার শেষে মার কাছে গেলাম। মায়ের পায়ে হাত রাখতেই টপ করে এক ফোঁটা জল আমার কাঁধের ওপর পড়লো। মাথা তুলে আর তাঁর মুখের পানে চাইতে সাহস হলো না। মা কাঁদছেন! হাউমাউ করে কাঁদছেন। কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। ফুলবৌদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখেও জল।

না, আর দেরী করা নয়। আবহাওয়া প্রথমটায় ছিল ক্ষুব্ধ, তারপর করুণ, এবার সজল হয়ে উঠেছে। এর পর হয়তো একেবারে অসহ হয়ে উঠবে।

তাই তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে বাড়ীর নীচে নেমে এলাম। অকস্মাৎ দেখি ম্যান্দারবাড়ীর নীচে হিজল গাছটার পাশে একান্তে দাঁড়িয়ে রেণু, কোলে খোকা। কথা কইলাম না, বোধহয় কইতে পারলাম না। কিন্তু এগিয়ে গিয়েই মনে হলো পা দু'খানা ভারী হয়ে গেছে, আর চলছে না। থমকে দাঁড়ালাম। পেছন ফিরে দেখি দুটি নিষ্পলক কালো চোখ, চোখের সমুদ্রে উদ্বেলিত অতলস্পর্শ মায়ার তরঙ্গ! দু'পা এসে জিজ্ঞেস করলাম : কিছু বলবে আমায়?

মুহূর্ত্ত কাল চুপ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো রেণু পাথরের প্রতিমার মতো, তারপর পাথরের ঠোঁট দুটি থেকে উৎসারিত হলো দুটি মাত্র কথা : মনে রেখো।

গট্ গট্ করে এগিয়ে চললাম শ্রীনগর থানার উদ্দেশ্যে সম্মুখে ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে বছিরদ্দী, আর পশ্চাতে এ্যাটম বোমা যতীন দারোগা।

পশ্চাতের অপেক্ষমান জনতার পানে ফিরে চাইতে পারলাম না।······

সেদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ সাল।

নয়

নিয়ম হচ্ছে, কোনো রাজবন্দীকে জেলা থেকে স্থানান্তরিত করবার সময় জেলার পুলিশ সুপার সাহেবের সমক্ষে তাকে একবার উপস্থিত করা হয়। চেহারা নিরীক্ষণ ও দু'চারটে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে সাহেব বিচার করতে চেষ্টা করেন বন্দিত্বের যাঁতাকলের চাপে বন্দীর পূর্ব্বেকার গোঁ কমেছে কি না এবং কতোখানি কমেছে। আবার যে জেলায় তাকে স্থানান্তরিত করা হলো, সেখানেও অমনি জেলার কর্ত্তা অতিথির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার গুরুত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন, কারণ রোগ বুঝে ও তার বিশেষ লক্ষণগুলো দেখে যথাযথ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা যে তাঁকে করতে হবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের মতো।

কিন্তু নিয়ম হলেও হামেশাই এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। হয়তো বন্দীকে জাঁদরেল গোছের জনৈক ইনসপেক্টারের কক্ষেই আনা হলো, চা ও খাবার দিয়ে আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলগোছে দু'একটি প্রশ্ন করা হলো। জবাব পাওয়া গেল, ভাল; আর না পাওয়া গেলেও সুপার সাহেবের ডায়েরীতে কিন্তু স্পষ্ট করে লেখা হয়ে রইলো: The detenu was produced before me, I had an hour's talk with him and I was convinced that he had not shaken off those abominable views and practices···সুতরাং আরও কয়েক বছর তাকে আটকে রাখলে ভালো হয়। এমনি সুপারিশ করা সুপারের পক্ষে ভারী সহজ, বিশেষ রাজবন্দীদের বেলায়, যাদের মেয়াদের কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমা নেই। বৃটিশ গভর্ন্মেন্ট কাগজে ও কলমে ভারী দুরস্ত—গলদ ধরবার উপায় নেই।···

শ্রীনগর থানার সহকারী দারোগা রবীন দত্ত সহযোগে রমনার আই বি অফিসে এসে উঠতেই যোগিনীবাবু রবারের মতো একেবারে কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন বিয়ে বাড়ীর কনের বাপের মতো: আসুন দ্বিজেনবাবু! পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?—বসুন।

এই মামুলী প্রশ্ন জবাব আশা করে না, তাই যোগিনীবাবু বলে চললেন: ফেব্রুয়ারী হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা, কি বলেন? রবীন, যাও তুমি পোশাক

ছেড়ে হাতমুখ ধোও গে, যাও। আর এখনি দ্বিজেনবাবুর হাতমুখ ধোয়ার বন্দোবস্ত করে দাও।—দ্বিজেনবাবু, সাহেব একটু বেরিয়ে গেছেন। এলেন বলে। আপনাকে যে একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাই!—দাদা আমার যেন মহা অপরাধীর মতো কথা কইলেন।

বললাম : তাতে আর কী হয়েছে।

রবীন, চা ও খাবার জল্‌দি।—বলেই জল্‌দি বেরিয়ে গেলেন যোগিনীবাবু।

এই দ্বিতীয়বার এলাম ঢাকার আই বি অফিসে। ১৯৩১ সালে প্রথম গ্রেপ্তারের সময় অফিস ছিল আদালতের পেছনে, এবার উঠে এসেছে রমনায়। ছোট দোতলা বাড়ী। পারিবারিক গৃহকে অফিসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সমুখে পিচ-ঢালা রাস্তা, ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ। জেলা আই বি-দের কাছে আমি 'টেরর' বলেই সর্ব্বদাই ওরা আমার সর্ব্বদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় আই বি-দের ওপর। তাই আমার ওপর কড়া নজর রাখা ব্যতীত জেলা আই বি অন্যান্য ব্যাপারে আমায় কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের বন্দী হিসেবে গণ্য করে। জেলার বাইরে একবার পাঠাতে পারলেই এদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। এরা বাঁচবে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা ও জলখাবার এসে গেল। সোফায় বসে দিব্যি তার সদ্ব্যবহার করবার সময় লক্ষ্য রাখলাম সম্মুখের বারান্দার দিকে। যারা যাওয়া-আসা করছে, সবগুলোই স্পাই না-ও হতে পারে, কিন্তু যেভাবেই হোক্ আমাদের আপ্রাণ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যই যে তারা বদ্ধপরিকর, সে কথা মিথ্যে নয়। তাই তাদের মধ্যে যত বেশী সংখ্যককে চিনে রাখতে পারা যায়, কাজের পক্ষে ততই ভাল।

কিছুক্ষণ পরই বাইরে মোটর এসে থামবার শব্দ পাওয়া গেল এবং সর্ব্বত্রই যেন একটু চাঞ্চল্যও লক্ষ্য করলাম। বুঝতে দেরি হলো না যে, ওদের সাহেব এসেছেন।

কয়েক মিনিট পরই শশব্যস্তে ফিরে এলেন যোগিনীবাবু। বললেন : চা খেয়েছেন? আসুন তাহলে দ্বিজেনবাবু! সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করবেন, আসুন।

দোতলায় উঠেই যোগিনীবাবু অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, হেসে প্রশ্ন করলেন : সঙ্গে আবার কিছু নেই তো?—আসুন, নিয়ম রক্ষা করবার জন্য পকেটগুলো একবার দেখে নিই।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিলাম : মাফ করবেন যোগিনীবাবু! আপনাদের সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি লালায়িত হয়ে উঠিনি, ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আপনারা বা আপনাদের সাহেব নিজে। আপনাদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে দেহতল্লাশী যদি অপরিহার্য্য বিধি হয়ে থাকে, তাহলে এখান থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি তাঁকে।—চলুন, নীচে যাই।

মহা বিপদে পড়লেন যোগিনীবাবু : এই তো, আবার হাঙ্গামা করছেন শুধু শুধু। কী হবে ভাই একটুখানি নামকোওয়াস্তে—

সেটা আপনাদের কাছে হতে পারে দাদা! আমাদের কাছে ওটা অবমাননাকর, নীতির পরিপন্থী। যেখানে নীতির কথা, সেখানে আমরা এক ইঞ্চিও হেলিনে কখনো। হয়তো ভেঙ্গে যাবো, কিন্তু নুয়ে পড়বো না। বুঝলেন ?

কী বুঝলেন, তা যোগিনীবাবুই জানেন। দেহতল্লাশীর জন্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না। গ্র্যাসবি সাহেবের কক্ষের দরজায় পৌঁছে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন নীরবে।

গ্র্যাসবি সাহেবের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বয়স যে খুব বেশী তা নয়। তবে চোখেমুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ দেখলাম বেশ স্পষ্ট। বড় বড় দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নাকের পাশে ক্ষতের দাগটি এখনও মিলিয়ে যায়নি, যেখানে রিভলভারের গুলী আটকে ছিল। আমি চেয়ারে বসতেই বোধহয় কটিবন্ধ থেকে বা ড্রয়ার থেকে দুটো রিভলভার বার করে শ্রীমান্ টেবিলের ওপর দু'হাতের সামনে রাখলো। তারপর চোখ দিয়ে আমায় বিঁধতে চেষ্টা করে প্রশ্ন করলো : ভারী গণ্ডগোল শুরু করেছ তুমি।

আকাশ থেকে পড়লাম : কই, না!

ঝুট বাৎ বলছো।—বলে সাহেব মিঠিয়ে মিঠিয়ে বলতে লাগলো : মেদিনীপুরে যারা ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করলো, তারা সব তোমার দলের লোক আছে, তাই না ? I know your party is B. V.—সত্য গুপ্ত, যতীশ গুহ, সুপতি রায়, ভূপেন রক্ষিত সব তোমার দলের লোক। তাই না ?

আমি চুপ করে রইলাম।

মুহূর্ত্ত নীরব থেকে গ্র্যাসবি আবার বললো : All right, we shall find out all your activities—এর মধ্যে সবই জানতে পারবো আমরা but in

the meantime you will have to rot in village domicile—আর তোমার ছাড়া পাবার উপায় দেখি না। অন্ততঃ দশ বরষ।

তবুও আমি নীরব।

সাহেব ঘন্টা বাজালো। যোগিনীবাবুর প্রবেশ। ইশারা করতেই আমায় নিয়ে নীচে নামলেন যোগিনীবাবু। আমার escort party এসে গেছে ততক্ষণে। দু'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সৈন্য, একজন সহ-দারোগা।

ঢাকা স্টেশনে ট্রেনে আরোহণ করে যাত্রা করলাম নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে। নারায়ণগঞ্জে এসে চেপে বসলাম গোয়ালন্দগামী মেল স্টীমারের রিজার্ভ-করা ইন্টার ক্লাস কামরায়। কিন্তু একটু পরেই সঙ্গী সহ-দারোগার সঙ্গে আমার বেশ এক পশলা বচসা হয়ে গেল।

লোকটার বয়স চল্লিশের নীচে নয়। ভারী অলস ও বদমেজাজী। ইন্টার ক্লাসের লম্বা বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ব্যাটা আমায় সতর্ক করে দিলেন যেন আমি কোথাও না যাই।

কেন—প্রশ্ন করলাম।

জবাব দিলেন: সিপাইরা কি আপনার পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?

বললাম: না ঘুরে বেড়ায়, তারা আপনার মতো লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুক। কিন্তু তাই বলে আমার চলা-ফেরা বন্ধ করে রাখতে হবে আপনাদের আরামের জন্য এতখানি রাজভক্তি আশা করবেন না।

আপনি যদি নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালান?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম: তা পালাবার সুযোগ পেলে হয়তো সদ্ব্যবহার করবো। কিন্তু আপনার উর্বর মস্তিষ্কে এই বুদ্ধিটা কি আসছে না যে, home internment-এ থেকে যে পালালো না, village internment-এ বদলির বেলায় সে পালাবে? কেন, সেখানে কি আমায় ফাঁসিতে লটকাতে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি? সেখানে পালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে না?

লোকটা মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করলো: আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে, শুধু বলে দিচ্ছি, আপনি অনর্থক স্টীমারে ঘোরাঘুরি করবেন না।

রাগ হলো। গ্র্যাসবিকে ঘোল খাইয়ে এলাম, আর এ কোথাকার টুনটুনি! বললাম: সে কৈফিয়ত আমি আপনার কাছে দিতে রাজী নই।

তাহলে কিন্তু বাধা দিতে হবে আমায়।

উঠে দাঁড়ালাম, চ্যালেঞ্জ জানালাম : পারেন, বাধা দিন।

বাধা যে ওরা দিতে পারে এবং বেশ ভালোভাবেই দিতে পারে ও দেবার সময় তার মাত্রাজ্ঞান ওরা বেশ সহজেই হারিয়ে ফেলতে পারে, এ সত্য আমার অজানা ছিল না। কিন্তু যেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন, সেখানে বিপ্লবীদের কাছে দুটি মাত্র পথ আছে খোলা—হয় সম্মান অটুট রাখা, নয় তো প্রতিরোধ করা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বিপক্ষ যদি অমিতবিক্রম হয় তাহলে রণক্ষেত্রেই শেষ শয্যা রচনা করা। মধ্যবর্ত্তী পন্থার কোনো সম্ভাবনা নেই, নেই আলোচনা ও আপস-রফার সুযোগ। আত্মসম্মানের প্রশ্ন উঠলে বিপ্লবীরা ক্ষমাহীন নিক্ষিপ্ত শায়কের মতো হয়। সোজা ভেদ করে বেরিয়ে যায়, নইলে প্রতিপক্ষের ইস্পাতের বর্ম্মে ঠোক্কর খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ভায়া-মিডিয়ার সুযোগ নেই সেখানে। হয়তো একটুখানি পাশ কাটালেই বা একটুখানি পাশ দিলেই একটা বড় রকমের সংঘর্ষ এড়ানো যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে কোনো স্ট্র্যাটেজি নেই, এক পা পেছিয়ে এসে দু'পা এগিয়ে যাবার tactics নেই! আত্মসম্মানবোধ সীমাহীন তীব্র বলেই নিজের দেশমাতার সম্মানরক্ষার জন্য বিপ্লবীরা বিলিয়ে দেয় প্রাণ হেলায় ফেলায় ঝড়ো হাওয়ার মুখে এক মুঠি ধূলির মতো!……

গাড়োয়ালী সেনাদের বন্দুক দুটি যে একেবারে মিলিটারী রাইফেল, বেয়নেটে যে আছে ক্ষুরের ধার এবং সহকারী দারোগার কোটের নীচে যে আঁটা আছে একটি সার্ভিস রিভলভার, এ সত্য আমার অজানা ছিল না। কিন্তু চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার সময় রাইফেল বা রিভলভার বিপ্লবীদের কাছে সমানই তুচ্ছ বস্তু।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম এবং চলন্ত স্টীমারে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। দারোগা তার অন্যতম সহকারীকে পাঠালো আমার পেছনে ফেউয়ের মতো।

ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাণ্ডা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। স্টীমারের একেবারে সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগে। হু হু করে এগিয়ে চলেছে স্টীমার প্রচণ্ড বেগে দু'পাশে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করে। বাতাসের বেগে সেই জলরাশির অজস্র ঠাণ্ডা কণা এসে গায়ে লাগে। মাঝে মাঝে দু'এক ঝলক জলও স্টীমারের ওপর উঠে আসে যেন বিক্ষোভ জানাবার জন্যই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই উদ্যত ফণা তাদের লুটিয়ে পড়ে, নিষ্প্রাণ হয়ে তারা গড়িয়ে পড়ে আবার সেই নদীতে।

ট্রেনের মতো তীরের দিকে তাকিয়ে কিন্তু স্টীমারের গতি নির্ণয় করা যায় না। প্রথমতঃ, তীর বেশ দূরে, লাইনের ধারে ধারে ঝোপঝাপের মতো নয়। তারপর জলের মধ্যে চাকা চালিয়ে এগিয়ে যেতে হয় স্টীমারকে। ট্রেন ছুটে চলে মসৃণ লাইনের ওপর দিয়ে শুধু বাতাসের বাধা ঠেলে। স্টীম থেকে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে স্টীমারের প্রপেলার হু হু করে ঘুরিয়ে দেয়, সেই শক্তি রেল লাইনের ওপর চলমান কোনো বাষ্পীয় যানে সংযোজিত করলে তার গতিবেগ কতখানি হতে পারে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরর্থক তাই কল্পনা করতে লাগলাম। জলকণা মাঝে মাঝে এসে শরীরে তুষারকণার মতো বিঁধলেও বেশ ভালো লাগছিল এমনি গতিবেগ নিরীক্ষণ করতে।

মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পুজো। সরস্বতী পুজো আমাদের দেশে আমাদের গ্রামে ঘরে ঘরে হয়ে থাকে। সারটি বছর একেবারে বই না স্পর্শ করলেও এই দিন ছাত্রছাত্রীরা অকস্মাৎ অতীব ভক্তিভরে বইখাতার ধুলোবালি ঝেড়ে নিয়ে কালির দোয়াতে দুধ পুরে তার মধ্যে কাশদণ্ড দিয়ে তৈরী কলম গুঁজে বাণীদেবীর সম্মুখে পরিপাটি করে সাজিয়ে দেয়। তারপর মুখে অঞ্জলির মন্ত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করলেও মনে মনে বোধহয় নিবেদন করেঃ হে মা সরস্বতী, সারাটি বছর তো ফাঁকি দিয়ে চলেছি। এবার অন্ততঃ পাস মার্কের ব্যবস্থা করে দাও মা! নইলে বাবা যে আর রক্ষে রাখবেন না!···

সরস্বতী পুজোর দিন বাজার থেকে ইলিশ মাছ আসবেই। ইলিশ সেদিন আর সাধারণ মাছ নয়; সেদিন সে মর্ত্তে আগত স্বর্গের দেবীবিশেষ। একা আসেন না, আসেন জোড়া বেঁধে। বাড়ীতে এসে পৌঁছোবার পূর্ব্বেই এয়োরা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই তাঁরা এগিয়ে আসেন হুলুধ্বনি করে। পরিষ্কার করে ধোওয়া একটি কুলোর ওপর তাদের শুইয়ে দিয়ে একখানা ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে আলগোছে আঁশ ছাড়িয়ে ফেলা হয়। যেন ব্যথা না লাগে! তারপর স্নান করানো হয় তাদের কলসীর তোলা শীতল জলে, তারপর এয়োরা ভক্তিভরে পরিয়ে দেন এঁদের কপালে সিঁদুরের টিপ। ধূপদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি করে সারি বেঁধে নিয়ে যান একেবারে বাড়ীর প্রধানতম কক্ষে। সেখানে তাঁদের উৎসর্গ করা হয় তীক্ষ্ণধার বঁটির কাছে। শুধু হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না করা সেদিনকার ইলিশ মাছ মনে হয় যেন অমৃত!··· এই অমৃত-ইলিশ আজ আর জুটলো না আমার ভাগ্যে। সরস্বতী

পুজো আর সে উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আনন্দ এ বছর মাঠেই মারা গেল দেখছি।

চলনদার যদি কৃপণ হন, তাহলে রাজবন্দীদের সাধারণ নীতি হচ্ছে একেবারে দিলদরিয়া বনে যাওয়া। বৃথা ও বাজে পয়সা ব্যয়ই তখন নীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাই, দ্বিপ্রহরে আহারের কথা উঠতেই একই সঙ্গে ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের খাদ্যের হুকুম ছেড়ে দিলাম অবলীলাক্রমে। দোতলায় পেছন দিকে খাবার ঘর। লম্বা টেবিলের ওপর বিছানো রঙ্গীন ক্লথ। বাবুর্চ্চির সাদা পোশাক তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে স্বয়ং রাঁধুনী মিঞাই এসে গেলেন পরিবেশন করতে। সাদা ধবধবে ভাত, একটির সঙ্গে অপরটির সান্নিধ্য থাকলেও সংযোগ নেই। কিন্তু দেখা গেল ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন, শাক ও মুগের ডালের পরই এসে গেল একেবারে ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছের ঝাল। চট্টগ্রামী ঝাল মানে সত্যিকার গলা-জ্বালানো ঝাল। তাতে যেমন অজস্র পেঁয়াজ ও রসুন আছে, তেমনি আছে 'অষ্ট গণ্ডা লঙ্কা!' কোথায় হলুদ আর কাঁচালঙ্কার ঝোল আর কোথায় পেঁয়াজ আর রসুনের ছালন্!

তবুও ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে খাদ্য বিভাগীয় মিঞাদের উদ্দেশ্যে। কারণ সরস্বতী পুজোর দিনটিতে ইচ্ছেয় হোক্ বা অজানতেই হোক্, ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাসের খাদ্য-সূচী শেষ হয়ে গেলে এল ফার্ষ্ট ক্লাসের মেনু—মুরগীর কোর্ম্মা।...আহারটি বেশ পরিতোষ সহকারেই শেষ করা গেল।

শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে ট্যাক্সিতে সোজা আমায় নিয়ে যাওয়া হলো হাওড়া স্টেশনে। মেদিনীপুরগামী ট্রেন অপেক্ষা করছিল, তার একখানি ইণ্টার ক্লাস কামরা জাঁকিয়ে বসলাম আমরা। এতখানি পথ একটিও পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। চেষ্টা করেছিলাম এবং আশাও করেছিলাম। রিভলভার দুটি যে কোথায় রেখে এসেছি, সে সংবাদটি অন্ততঃ যথাসম্ভব সত্বর যথাস্থানে পাঠানো একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমার ঘরের কুলুঙ্গিতে যে আর নেই তারা। এই সব নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনো একটি স্থানে বেশী দিন জমা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বৌদিরা এই গুপ্ত স্থানের অস্তিত্ব টের পাওয়ামাত্রই তার আশ্রয়স্থল পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। পুব দিকের ভূতের বাড়ীর বেতঝোপের মধ্য দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। পরিধি কম, বসে বসে প্রবেশ করতে হয়। প্রায় ত্রিশ গজ সোজা চলে যাবার পর একটি ধুতুরা ফুলের গাছ

আছে। তার গোড়াকার মাটি তুলে ফেললেই প্রায় আঠারো ইঞ্চি নীচে থেকে বেরুবে একটি গ্লাক্সোর বড় টিন। সেই টিনের মধ্যে ছোট সাইজের দুটি রিভলভার আছে। কেউ জানে না, একা আমি ব্যতীত !......

মেদিনীপুর শহরে এসে পৌঁছোলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। উঠলাম বোধহয় পুলিশ ক্লাবে। ক্লাব মানে বাইরে থেকে বলা উচিত ডাক-বাংলো। তবে এখানে এসে থাকতে পারেন শুধু মফস্বল থেকে শহরে আগত পুলিশ অফিসার ও ঐ বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা। খাবার ব্যবস্থা আছে, চার্জ্জ বাজারের চাইতে কম।

মেদিনীপুরের পুলিশ-সুপার তখন ছিলেন সি. উইলী। সেকালের কথা যাঁদের মনে পড়ে তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, ইনি অত্যন্ত কড়া মেজাজী ও মিলিটারী সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন। এই সদ্‌গুণের জন্যই তাঁর ওপরওয়ালা পরবর্ত্তী কালে তাঁকে বোধহয় একেবারে পুলিশের ইনসপেক্টার জেনারেল অথবা কলকাতায় কেন্দ্রীয় আই বি অফিসে একেবারে ডেপুটি কমিশনার করে পাঠান। ঠিক মনে পড়ছে না। আমায় কিন্তু আব উইলীর কাছে যেতে হলো না। নিশ্চয়ই তাঁর ডাইরীতে নির্জ্জলা সত্য কথাটি লেখা হয়ে গেল—The Detenu was produced before me. He said he had his full meals in the journey and had no complain ইত্যাদি।

তারপর আবার ট্রেনে চড়লাম। এবার সঙ্গে এলেন মেদিনীপুর জেলা আই বিব লোক। নামলাম এসে কাঁথি রোড স্টেশনে, সেখান থেকে মাইল আটেক গরুর গাড়ীতে এসে অবশেষে পৌঁছোলাম কেশিয়াড়ী থানায়। তখন বেলা বারোটা হবে। বড়বাবু থানায় নেই, কোন্ মামলার তদন্তে মফস্বলে গেছেন। অভ্যর্থনা জানালেন সহকারী দারোগা অবিনাশবাবু। বললেন : আসুন, আসুন। মালপত্রগুলো সব ডেটিনিউবাবুর ঘরে নিয়ে যাও তো, রামভরসা সিং ! চাবি দেখ দেয়ালে আছে মালখানার। এই বেলায় আর আপনার পক্ষে রান্না করা সম্ভব হবে না ডেটিনিউবাবু, আমার এখানেই দুটো ডালভাত—

কী যে বলেন !—বলে মৃদু হাস্য করলাম।

দশ

আমার ঘরখানার পরিধি দশ ফুট চওড়া ও দশ ফুট লম্বা হবে। খড়ের ছাউনি, ঝাঁপের দরজা ও জানালা। মাথার ওপর 'সিলিং' বলে কিছু নেই, একবারে চালের নীচে বাঁশের কাঠামো দেখা যায়। ছিটে-বেড়ার ওপর মাটি লাগিয়ে সেটা দেয়ালের মতো তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছে, জানালার শিকগুলো বাঁশের, মাটির মেঝে। সম্মুখে আবার কয়েক ফুট চওড়া বারান্দা। সম্মুখেই একটি টিউবওয়েল সর্ব্বসাধারণের জন্য। ওপারে আমার রান্নাঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার বাইরেই একটি ফুলের বাগান। শোনা গেল, আমার পুর্ব্বেকার রাজবন্দীর নিজের হাতের তৈরী বাগান। সারাটি দিন বাগান নিয়েই পড়ে থাকতেন তিনি। গাছে জল দেবার ব্যবস্থাটি কিন্তু চমৎকার। টিউবওয়েলের জল সরে যাবার ড্রেনটি টেনে নিয়ে বাগানের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সারাটি বাগান ঘুরে সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

টিউবওয়েলে স্নান সেরে নিয়ে এসে তক্তপোশের ওপর বিছানাটা বিছিয়ে নিয়ে বসলাম। দেখা গেল তক্তপোশের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। কেন সেটা সাত ফুট হলো না, সে ইতিহাস পরে জানতে পারলাম। ঘরে আছে একখানা টেবিল ও একখানা হাতলহীন চেয়ার। একখানা ধুতি ভাঁজ করে পরিপাটি করে বিছিয়ে দিলাম টেবিলের ওপর টেবিল-ক্লথের মতো। 'বি' টাইম-পিস্‌টা বসিয়ে দিলাম তার ওপর।

একটু পরেই এল খাবার ডাক। অবিনাশবাবুর ওখানে পাশাপাশি খেতে বসে থানার ইতিবৃত্ত মোটামুটি সংগ্রহ করা গেল।

অবিনাশবাবুর চাকরি হয়েছে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। সরাসরি সহকারী দারোগার পদে নিযুক্ত হয়েও কেন তিনি আজও দারোগা পদের জন্য ওপর-ওয়ালার মনোনয়ন পেলেন না এবং কী করে সেদিনকার ছোকরা এল সি-গুলো বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মতো চড়চড় করে বেড়ে উঠলো দেখতে দেখতে ও সিনিয়রদের টপকে একেবারে দারোগা, এমন কি, অফিসার-ইন-চার্জ্জ হয়ে বসলো, তারই সকরুণ কাহিনী বিবৃত করে তিনি বললেন: মুশকিল তো ঐখানেই দ্বিজেনবাবু, পুলিশের চাকরি করি বলে ওদের মতো বিবেক তো আর খোয়াতে

পারলাম না আর সেটাই হলো আমাদের মস্ত অপরাধ। এই তো ধরুন না, আমাদের এই ক্ষীরোদবাবুর কথাই। মাত্তর তো আট বছরের নোকরি। লাল পাগড়ি মাথায় বেঁধেছিস্ তো পুরো পাঁচটি বছর। বন্দুক কাঁধে ঘাস-বিচালি করেছিস তো পুরো দুটি বছর! তারপর যেই শুরু হলো সিভিল ডিজওবিডিয়েন্স, তখন কর্ত্তারা চোখে দেখলেন সরষে ফুল আর গরু ভেড়া ছাগল সবাইকে রাতারাতি জমাদার করে থানায় থানায় পাঠালেন ভলান্টিয়ারদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে।

বলেই অবিনাশবাবু অকস্মাৎ নেপথ্য পানে তাকিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন: কেন, কী হয়েছে তাতে? সত্যি কথা বলবো, তাতে আবার ভয় কীসের? দ্বিজেনবাবু সবে এলেন, এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ওঁর সব জানা থাকা ভাল।

বুঝলাম স্ত্রীর আপত্তি আছে। আমার আপত্তি কিন্তু আদৌ নেই। পশ্চিম-বঙ্গীয় পেটেন্ট ঝালবিহীন রান্না যতই বিস্বাদ লাগুক না কেন এবং সেই সঙ্গে অবিনাশবাবুর আত্মপ্রচার যতই বিশ্রী ঠেকুক না কেন, থানার পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করাই যে আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য যত শীঘ্র পালন করা যায়, ততই আমার পক্ষে সুবিধে।

হেসে বললাম: বৌদি বুঝি ভয় পাচ্ছেন?

জবাব দিলেন অবিনাশবাবু: ভয়? ভয় কীসের? আমি ক্ষীরোদেরটা খাই, না পরি? বদমাশকে বদমাশ বলবো না তো কি বলবো রামকৃষ্ণ পরমহংস? শুনুন দ্বিজেনবাবু, বললে হয়তো হাসবেন মনে মনে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তাই এখানকার সব কথা জানিয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

বলে অবিনাশবাবু আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে বোধহয় নেপথ্যের নীরব সমর্থন নিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই যে, ক্ষীরোদবাবু মহিষাদল থানায় এ এস আই থাকাকালীন এক সত্যাগ্রহীদের সভায় গুলী চালিয়ে তেরো জনকে আহত ও দু'জনকে নিহত করে এস আইয়ের অফিসিয়েটিং পেয়েছে এবং একেবারে থানার কর্ত্তা হয়ে এসেছে এই কেশিয়াড়ীতে। জানা গেল, ক্ষীরোদ অতি বদলোক, মাতাল, ঘুষখোর ও চরিত্রহীন। মফস্বলে গেলেই নিত্য নতুন সাঁওতালী মেয়ে তার চাই-ই। আর এখানে থাকতেও—না, না, তুমি যতই বারণ কর, সব আমি বলবোই। সত্য কথা বলবো, তাতে ভয় কীসের শুনি!

নেপথ্যে চুড়ির আওয়াজ ও শাড়ীর খসখস শোনা গেল এবং একটু পরেই অবিনাশবাবুর স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সম্মুখ দিয়ে বড় ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। কণ্ঠস্বর এবার খাটো করে বলতে লাগলেন অবিনাশবাবু : মশাই, ডাকে বৌদি বলে, অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া, যখন-তখন বেড়াতে আসে, হাসি-পরিহাসও করে। আমি তেমন আপত্তি করি না, কারণ আমরা জানি মেয়েরা মায়ের জাত আর বৌদি তো মায়ের তুল্য। বেশ তো, ঠাট্টার সম্পর্ক থেকে থাকে, তা কর্ না, তাতে কি যায় আসে। কিন্তু মশাই, সেই মাতৃসমা বৌদিকে কিনা আড়ালে পেয়ে বলে, বৌদি, তোমার ফিগারটা কী সুন্দর! বলুন তো দ্বিজেনবাবু, শুনেছেন কোনো দিন এমনি লম্পট দেওরের কথা? শালার সাতপুরুষের ভাগ্যি যে, আমি সদরে গিয়েছিলাম সে রাত্রে, নইলে জুতিয়ে শালার মাথা থেঁতলে দিতাম—না, না, ও কি, মাথাটা খান দ্বিজেনবাবু। এ কিন্তু বরফের মাছ নয়, একেবারে জটাধরবাবুর পুকুরের, পাকা রুই যাকে বলে।

তৃপ্ত মনে মাথাটা টেনে নিলাম। প্রথম দিনেই মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই থানার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো বলা চলে। দারোগার নিন্দে করতে গিয়ে যে সহকারী দারোগা একেবারে প্রথম সাক্ষাতেই সাঁওতালী মেয়ে ও বৌদির ফিগারের গল্প করে বসতে পারে, তার সম্বন্ধেও আমার প্রাথমিক ধারণাটা বিশেষ ভালো হলো বলতে পারিনে। একে অর্বাচীন ব্যতীত সরল মানুষ কিছুতেই বলা যেতে পারে না।......

কিন্তু সে যাই হোক্, দারোগা আর জমাদারের এই কোন্দল খুশী মতো কাজে লাগানো যাবে। লিপ্সাকে লেলিয়ে দেয়া, হিংসাকে খাদ্য দেয়া, অত্যাচারকে প্ররোচনা দেয়া, এরই নাম চাণক্যের রাজনীতি!...

পরদিন সকাল বেলাতেই বহুপ্রতীক্ষিত লম্পট দেওর, দারোগা-পুঙ্গব ক্ষীরোদ দত্তের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অনেক রাতে ফিরেছেন মফস্বলের কাজ শেষ করে, তাই টের পাইনি। নতুন জায়গা প্রদক্ষিণ করবার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি থানার বারান্দায় টেবিলে বসে নিবিষ্ট মনে ডাইরী লিখছেন। যেতে হলো এবং কাছে আসতেই বললেন : বসুন। কাজটা সেরে নিই, তারপর কথা বলছি।

সুপুরুষ নিশ্চয়ই বলতে হবে। যেমন ফর্সা রং, তেমনি বলিষ্ঠ দেহ। মাথায় কুঞ্চিত কেশ, পুলিশী স্টাইলে ছাঁটা। সরু করে কামানো গোঁফ। আড়চোখে

দেখলাম, হাতের লেখাটিও সুন্দর। দু'পৃষ্ঠার মাঝে কার্ব্বন লাগিয়ে ফাউন্টেন পেন দিয়ে চেপে লিখছেন। লিখতে লিখতেই সিগারেটের টিনটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন। বললাম : আমি খাইনে।

কাজ সেরে প্রথম প্রশ্ন হোল তাঁর : আপনি কদ্দিন ধরে ডেটিনিউ হয়ে আছেন ?

জবাব দিলাম : তা—প্রায় সাড়ে তিন বছর হবে।

ঢাকা জেল থেকে আসছেন ?

জেল নয়, ঢাকা জেলা। হোম ইণ্টার্ণ ছিলাম।

আপনার এরিয়াটা দেখেননি নিশ্চয়ই।—জমাদারবাবু !

শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন জমাদার অবিনাশবাবু ঘর থেকে। নেপথ্যে অজস্র আস্ফালন দেখালেও এখন কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ বা নিঃশঙ্ক ভঙ্গিমার আভাস পেলাম না এতটুকুও, বরং দেখলাম স্পষ্ট এম ও এস-এর একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র।

ক্ষীরোদবাবু তাঁর দিকে না তাকিয়েই হুকুম দিলেন : ডেটিনিউবাবুকে তাঁর এরিয়াটা আজই একবার দেখিয়ে দেবেন।

এই এরিয়া নিয়েই প্রথম মতভেদ ও মনোমালিন্য শুরু হলো আমার ক্ষীরোদ-বাবুর সঙ্গে। কেশিয়াড়ী গ্রামের পূব দিকে যে হাট আছে, সপ্তাহে তা দু'দিন বসে—সোমবার ও শুক্রবার। ঐ হাটই আমার পূব দিকের সীমারেখা। হাট-বাজারের সুবিধে দিতে হবে বলে ঐ ব্যবস্থা। উত্তর দিকে ঘন জঙ্গল, কাঁটা বাঁশের ঝোপে ভর্ত্তি। সেদিকে দেওয়া হয়েছে একেবারে কেশিয়াড়ী গ্রামের শেষ সীমানা। দক্ষিণেও নলিনী রাউতের মণিহারী দোকানের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের সীমানা নিয়েই গোল বেধে গেল। ক্ষীরোদবাবুর মতে ওদিকে জটাধর সেনাপতি মশাইয়ের বাড়ীর উল্লেখ থাকলেও বাড়ীটা সীমানার মধ্যে নয়, বাইরে। অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর পূব দিকের সীমানা আমার এরিয়ার পশ্চিম দিকের নিশানা।

বললাম যে, তা হতেই পারে না ; পূব দিকে বা দক্ষিণ দিকে কেশিয়াড়ী হাট বা নলিনী রাউতের দোকান লেখা থাকলে যদি সে দুটো স্থান আমার এরিয়ার অন্তর্গত হয়, তাহলে পশ্চিমের সীমানা বলে উল্লিখিত জটাধর সেনাপতির গৃহ বাইরে থাকবে কোন্ যুক্তিতে ? হয় সবগুলোই আমার এরিয়ার অন্তর্গত,

নইলে সবগুলোই বাইরে। ক্ষীরোদবাবুর খুশীমতো কোনোটা বাইরে ও কোনোটা ভেতরে হতে পারে না।

ব্যাস্, লেগে গেল দারোগার সঙ্গে। বেদম কথা কাটাকাটি হবার পর কথা বন্ধ। বিকেল পাঁচটায় থানায় গিয়ে তাঁকে দেখেও যেন দেখতে পাইনে আমি। ভেতরে গিয়ে অবিনাশবাবুর টেবিলের পাশে বসি, ছ'মিনিট বসে আবার বেরিয়ে যাই।

মনে মনে অবিনাশবাবু ভারী খুশী। যাক্, দারোগা তাহলে পারেনি আমার হাত করতে। তিনি না থাকলে তো বিকেলের চা ও জলখাবার ওখান থেকে আসবেই, দুপুরেও আসবে ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, বৌদির হাতের তৈরী গজা ও অন্য কিছু। ক্ষীরোদবাবু আবার বড্ড বেশী মফস্বল-প্রিয় ছিলেন এবং একবার গেলেই দু'চারটে রাত বাইরে কাটিয়েই আসতে ভালোবাসতেন। জমাদারবাবুও তাই চাইতেন। কারণ তাহলেই রাত্রে এসে পড়তো আমার নেমন্তন্ন দুটো ডালভাতের। কিন্তু দেখা যেত প্রকাণ্ড থালার ঠিক মাঝখানে দুটো ভাত এভারেস্টের মতো পরিপাটি করে সাজিয়ে থালাখানা বেষ্টন করে সাজানো একই আকারের বাটি, নানারূপ ব্যঞ্জনে, মাছে ও মাংসতে ভর্ত্তি। খেতে বসে একথা-সেকথার মধ্য দিয়ে কখন এসে পড়তো ক্ষীরোদ-প্রসঙ্গ : বুঝলেন মশাই, এমনি বাটি সাজিয়ে ঐ শালাকেও অনেক দিন খাইয়েছি। আদর কি কম করেছি মশাই, না আপনার বৌদি পর ভেবেছে কখনো? কিন্তু কি করা যাবে, শালা আদরের কদর বুঝলো কই? আরে, বৌদিকে আমরা জানি মাতৃস্বরূপা ; তাঁকে বলিস্ ফিগার সুন্দর—কিন্তু ও কি, তুমি চললে কোথায়? দ্বিজেনবাবু যে তাহলে না খেয়েই পালাবেন। বসো বসো—

কিন্তু বৌদি বসলেন না। নিজের ফিগারের বিশদ আলোচনায় যোগদানের ভিগার বোধহয় আর ছিল না তাঁর। তাই দরজার আড়ালে গিয়ে স্থান নিলেন।

সংবাদ সংগ্রহ করলাম যে, অবিনাশবাবুর ইনি তৃতীয় পক্ষ এবং কতকটা আধুনিকা। তাই ক্ষীরোদ ঠাকুরপোর তারিফটাকে তিনি খুব সহজভাবে গ্রহণ করে স্বামীর কাছে উল্লেখ করে একটু আমোদ করতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। ব্যস্, তাতেই দাদা একেবারে ফায়ার।...আধুনিকা হলেও কিন্তু সূর্য্যের মুখ দেখবার আর উপায় নেই তাঁর। জমাদারবাবু শ্যেনদৃষ্টি মেলে সর্ব্বদা পাহারা দেন। দু'মাস কেটে গেলেও আমার সঙ্গে তেমন হাল্কা সম্পর্ক কিছুতেই

স্থাপিত হলো না। ঘোমটাও দিতেন না, কথাও কইতেন, কিন্তু সে কথা বৌদি ও ঠাকুরপোর নয়, পাঞ্জাব মেইলের সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীর সঙ্গে যাত্রিণীর নীরস ভদ্রতাব্যঞ্জক কথা মাত্র!······

কিন্তু দারোগা-জমাদারের এই বিরোধ সুবিধেমতো আমার কাজে লাগাতে কসুর করলাম না। দারোগার সঙ্গে মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে সিনেমার ভিলেইনের মতো এঁর কথা ওঁর কানে এবং ওঁর কথা এঁর কানে লাগিয়ে কৌশলে এঁদেব কান বেশ ভারী করে তোলা গেল। ফলে দু'জনেই আমায় পরম সুহৃদ্ ও শুভানুধ্যায়ী মনে করতে লাগলেন পৃথক্‌ভাবে। কিন্তু দু'জনেই থানায় থাকলে আমি পেছন দিক্‌কার গেট্ দিয়ে বেরিয়ে যেতাম, সদরের দিকে ফিরেও চাইতাম না। ক্ষীরোদ দত্তের মুখেই শুনলাম যে, অবিনাশবাবুর স্ত্রীর পরিচয় নাকি রহস্যাবৃত, শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ কোনো দিন আসেনি এখানে, বৌদিও কখনো যাবার নামটি করেন না। এমন কি, কোথায় তাঁর শ্বশুরবাড়া. সে প্রশ্নের কোনো যুক্তিসহ জবাব তিনি দিতে পারেন না। এই রহস্যময়ী নারী অকস্মাৎ ক্ষীরোদ-বাবুকে দেবরাধিক আদরআপ্যায়ন করে তাঁকে এত আপনার করে নেন যে, ক্ষীরোদবাবু সত্যিই তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা, জমাদারবাবু যখন সদরে গিয়েছিলেন একটা মামলায় সাক্ষ্য দিতে, তখন—বলতে বলতে দারোগা কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন: সে ঘটনা আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না আপনাকে, দ্বিজেনবাবু! তবে কথাপ্রসঙ্গে এসে গেল বলেই বলছি। আর কাউকে বলবেন না যেন। কেমন আমাব ফিগারটি, বল তো ঠাকুরপো—বলে বৌদি আমার মুখের সামনে এগিয়ে এসে এমনি একটা বিশ্রী ভঙ্গী করে দাঁড়ালো যে—

বাধা দিলাম: থাক্, সে ঘটনা আমার আর শুনে কাজ নেই।

এরিয়া নিয়ে যে মতভেদ, তার মীমাংসা করবার জন্য কড়া দরখাস্ত পাঠালাম সদরে। যথারীতি তার কোনো জবাব এল না। আমি এবার লিখলাম, জটাধরবাবুর বাড়ীতে আমি যাবোই। এতে আইনভঙ্গ হয়ে থাকলে মামলা কর আমার নামে। তারও জবাব নেই। এদিকে ক্ষীরোদ দারোগা গোপনে পাঁয়তারা কষতে লাগলেন যে, গ্রেপ্তারের হুকুমটা একবার এলেই হয়। এল সি সুধীর সংবাদটা গোপনে জানিয়ে দিল।

থানার বাইরে একটু দূরেই দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানকার ডাক্তার

রামমোহনবাবু বেশ ভদ্র ও অমায়িক। ডাক্তারী বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা কতখানি, সে বিচার করবার সুযোগ অবশ্য আমি পাইনি, তথাপি প্রায়ই সকালবেলা সেখানে গিয়ে বসে বসে নানারকম রোগীর সমাগম দেখতাম শুধু সময় কাটাবার জন্যই। ডাক্তারবাবু বাস করেন সপরিবারে, কিন্তু কম্পাউণ্ডার বাস করেন একা। স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যা গেছেন বাপের বাড়ীতে অনেক দিন। এত দিনে অবশ্য ফিরে আসা উচিত ছিল, কিন্তু মাইনে যা পান, তাতে করে চালানো দুষ্কর। আর দেশে বৃদ্ধা মায়ের পরিচর্য্যার জন্য একজনকে অপরিহার্য্য-ভাবে প্রয়োজন। তাই আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধকল্ সইবার মতো শক্তি অর্জ্জন করতেই বিনোদবাবু স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়ের কাছে।

ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেলে প্রায়ই বিনোদবাবুর কোয়ার্টারে বসে গল্প করতাম। স্পষ্ট মনে পড়ে আজও বিনোদবাবুর অমায়িক বন্ধুত্বের কথা। অত্যন্ত নিরাহ প্রকৃতির লোক, প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তি। যে সব নিরাহ ও নির্লিপ্ত লোক দেখে সাধারণতঃ করুণার উদ্রেক হয়, বিনোদবাবু তেমনি ক্ষুদ্র নন; এঁকে দেখলেই কেন জানিনে এঁর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কইতে ইচ্ছে করে হাতের কাজ ফেলে রেখে এবং দু'চার দিন মেলামেশা করলেই এঁর দরদী অন্তরের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

দেশের কাজের কথা উঠতেই বিনোদবাবু বলেন: কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে কাজ হবে বলে মনে হয় না আমার। কারণ আর্জ্জিতে যতই যুক্তি দেখাই না কেন তার ফলে Boss কখনো চেয়ার ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। আর যেতে পারেন না যে! আমার দেশের টাকা দিয়ে যার সংসার চলে, দু'বেলা উনুনে হাঁড়ি চড়ে, সে কি এমনি আত্মঘাতী উদারতা দেখাতে পারে কখনো? তাহলে আমরাই যে তাকে বোকা বলবো।

সুযোগ পেয়ে গেলাম। মেদিনীপুরে বি ভি-র শাখা তো স্থাপিত হয়েছে বহু পূর্ব্বেই, যার ফলে পর পর তিনটি সাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হয়েছে। তাই মন্ত্র ছড়িয়ে যেতে ক্ষতি কি? শাখার সঙ্গে পরে সংযোগ স্থাপন করে দিলেই চলবে। প্রশ্ন করলাম: তাহলে কোন্ পথটি আপনি সুপারিশ করেন?

বিনোদবাবু উত্তর দিলেন: শুধু সুপারিশ নয় দ্বিজেনবাবু, সে পথ একেবারে অব্যর্থ বলে মনে হয় দ্রোণাচার্য্যের তীরের মতো। কিন্তু তার কথা ভাবতেই

যে আমার বুক কেঁপে ওঠে। বার্জ্জকে মারবার সময় আমি ছিলাম শহরে। খেলার মাঠেও গিয়েছিলাম সেদিন বেড়াতে বেড়াতে। সত্যিই কষ্ট হলো বেচারাকে দেখে। একেবারে কুকুরের মতো গুলী খেয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধুলোয়!......তাই ভয় হয় আপনাদের দেখে। জীবনের মায়া একেবারে করেন না।

কিন্তু কার্য্যতঃ ভয় আদৌ আর রইলো না। কেশিয়াড়ীতে কম্পাউণ্ডার বিনোদবাবুই হয়ে উঠলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অবিনাশ জমাদার এতে আপত্তি করলেন না। এল সি সুধীরবাবু তো আহ্লাদে আটখানা আর থানার অন্যান্য সিপাইও একবাক্যে বললো যে, কম্পাউণ্ডারের মতো আদমী এ তল্লাটে আর নেই। শুধু গোপনে সংবাদ পেলাম যে, ক্ষীরোদ দারোগার এটা ভালো লাগেনি। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ডেটিনিউ কেন মিশবে এত? ওরা তো কয়েদী!

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, দারোগা ও জমাদারের মনোমালিন্য আমি কাজে লাগাতে শুরু করলাম। ফলে, মাস চারেক কেটে যেতেই অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, ক্ষীরোদবাবু একবার মফস্বলে গেলেই ব্যস্, সারা থানার মালিক তখন হয়ে বসি আমি। দিব্যি সন্ধ্যের পর থানার বারান্দায় বসিয়ে দিই তাসের আড্ডা কিংবা বিনোদবাবুর কোয়ার্টার্সেই রাত কাটিয়ে আসি, নইলে কোনো সিপাইয়ের সাইকেল নিয়ে গ্রামের মেঠো পথে খুশীমতো ঘুরে বেড়াই। ঘুণাক্ষরেও দারোগার কানে যাবার আশঙ্কা নেই আর।

বিনোদবাবুর নামে এনভেলপে বিক্রমপুর থেকে পত্র আসে। তাতে সেখানকার সংবাদ পাই সবই—কীভাবে কাজ চলছে, কোন্ গ্রামে বা স্কুলে টোপ ফেলতে পারা গেছে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা—আমিও তার জবাব লিখে পাঠিয়ে দিই একেবারে কলকাতায় মতি সাহার সঙ্গে। মতি সাহারই একমাত্র ফলের দোকান কেশিয়াড়ীতে। প্রতি সপ্তাহেই তাকে কলকাতায় যেতে হয় নানারকম ফল কিনে আনতে। বিনোদবাবুর মারফত তাকেও দলে টেনে নেয়া গেল।

এই ১৯৩৫ সালেই স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের গভর্নমেন্ট কয়েক হাজার বিপ্লবী কর্ম্মিকে কারাগারে বা অন্তরীণে পাঠিয়ে যখন সদম্ভে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছিল যে, বাংলা দেশের টেরোরিস্ট মুভমেণ্ট তারা শুধু কন্ট্রোলই করেনি, প্রায় ওয়াইপ আউট

করে ফেলবার ব্যবস্থা করেছে, তখন ঘোষণাকারীদের মুখে চূণ-কালি লেপন করে দিয়ে এই ১৯৩৫ সালেই বাংলা দেশে অনেকগুলো বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল। এবং সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, এই বৎসরই ৮ই মে দার্জ্জিলিংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠ লেবং-এ স্বয়ং গভর্নর স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের ওপরই বিপ্লবীর রিভলভার গর্জ্জে উঠেছিল এবং সেই স্মরণীয় অভিযান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্ম্মিবৃন্দ।

লেবং-এর ঘটনার পূর্ব্বে অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটে, তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি। যাঁরা এই সব ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজন ব্যতীত কারুরই নাম উল্লেখ করলাম না।

জানুয়ারী মাসে বীরভূমে একটি ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়। ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার দু'জন পলাতক রাজবন্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীরভূমের একটি পরিত্যক্ত চালের কলের মধ্য থেকে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। বরিশালের ঝালকাঠিতে একটি দোকানে পাওয়া যায় গোটাকতক তাজা বোমা। রংপুরের একজন উকিলের বাড়ী তল্লাশী করে পাওয়া যায় একটি লাইসেন্সবিহীন বন্দুক।

নলডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম ও হিলি ডাকাতির মামলার রায় বেরুবার পরই মার্চ্চ মাসে রংপুর জেলায় বিপ্লবীদের তৎপরতা একটু বেশী দেখা দেয়। শহরের দেয়ালে দেয়ালে, ল্যাম্প পোস্টে ও গাছের গায়ে বৈপ্লবিক ইস্তাহার আঁটা দেখতে পাওয়া যায়। ১৭ই মার্চ্চ জনকয়েক যুবককে রাস্তার মধ্যে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করে দুটি বন্দুক উদ্ধার করা গেলেও যুবকেরা সবাই পালিয়ে যায়। ১৯শে মার্চ্চ কলকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলমবাজারে জনৈক মহিলার গৃহ তল্লাশী করে পুলিশ হস্তগত করে দুটি অটোমেটিক পিস্তল। বরানগরে একটি গৃহসংলগ্ন বাগানে মাটির নীচে একটি সাবানের বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় একটি রিভলভার, একটি পিস্তল ও অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ। বরিশালে স্থানীয় কলেজের জনৈক অধ্যাপকের গৃহ ও প্রাঙ্গণ তল্লাশীর ফলে পুলিশ হস্তগত করে অনেকগুলো বোমার খোল, অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ, দুটো ছোরা, দুটো পিস্তল ও স্তূপীকৃত বিপ্লবী ইস্তাহার।

এপ্রিলের প্রথম দিকেই বালিতে জনৈক জমিদারের গৃহে গ্রেপ্তার হন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পলাতক আসামী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী,

বাংলার দলনির্ব্বিশেষে বিপ্লবীদের কাছে যিনি চিরকালের 'বিপিনদা'। ১৯৩১ সাল থেকেই তিনি গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। ১৬ই এপ্রিল ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে দু'জন মুসলমান যুবককে রেলওয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের মালপত্র তল্লাশী করে পাওয়া যায় একটি পাঁচঘরা রিভলভার। সরিষাবাড়ী থানার অন্তর্গত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তল্লাশী করে পুলিশ হস্তগত করে কতকগুলি রিভলভারের কার্তুজ। ২৮শে এপ্রিল তমলুক থেকে আগত জনৈক যুবককে কলকাতার স্যাণ্ডেল স্ট্রীটে গ্রেপ্তার করা হয়, তার সঙ্গে ছিল একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও কতকগুলো কার্তুজ।

এ ছাড়া আরও অনেকগুলো ছোটখাটো ঘটনার পর এল স্মরণীয় সেই ৮ই মে, ১৯৩৫ সাল।

গ্রীষ্মকাল, বাংলার জবরদস্ত গভর্নর স্যার জন এ্যাণ্ডারসন সদলবলে গ্রীষ্মাবাস দার্জ্জিলিং-এ এসেছেন। শহরের নীচে লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ৮ই সেখানে ঘোড়দৌড় হচ্ছে। এই সময় দার্জ্জিলিং শহরে প্রায়ই ধনী লোকের আমদানী হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাংলার রাজা-মহারাজারা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য রাজ্যের হাজারো গুরুতর কাজ ফেলে রেখেই ওপরে উঠে আসেন এবং ঘোরাফেরা করেন বিলিতি গভর্নরের আশেপাশে যেমন করে রেস্তোরাঁর বয় ঘুব ঘুব করে ঘুরে বেড়ায় টেবিল থেকে টেবিলে একখানা রূপোর থালা হাতে করে হুকুম তামিল করবার জন্য।

তখন অপরাহ্ন, দৌড় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গভর্নরের আসন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে সময়োপযোগী রাজকীয় পোশাক পরিধান করে সমাসীন স্যার জন এ্যাণ্ডারসন। Governor's Cup দৌড় হচ্ছে এবার। প্রত্যেকের সর্ব্বমনোযোগ সেই দিকে। হুজুরের কাপ!......অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ও দেহরক্ষীর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই রাজা-মহারাজার মাঝে নিঃশব্দে এসে উপবেশন করেছে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের দু'জন কর্ম্মী—ভবানী চক্রবর্ত্তী ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিধানে চক্চকে সাহেবী পোশাক আর গৌরবর্ণ চেহারা, সুতরাং সন্দেহ হলো না কারুরই মনে।

দৌড় শেষ হয়ে গেল। ঘোড়াগুলোকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে ঘেরা জায়গায়, এবার জিন ও লাগাম খুলে ওদেরকে একটু বিশ্রাম করবার সুযোগ

দিতে হবে পায়ে হেঁটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। প্রত্যেকের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ, যেদিকে চেয়ে আছেন তাদের হুজুর!

ভবানী অনুচ্চস্বরে বললো: This is the time, let us start. Let both of us go to the front at point-blank range—চল্‌!

কিন্তু গভর্নরের সম্মুখে না এসে রবি এল তাঁর দক্ষিণ দিকে এবং এসেই গুলী নিক্ষেপ করলো গভর্নরের আসনের রেলিংয়ের ওপর হাত রেখে। একবার, দু'বার, তিনবার, এমন সময় বিহারের বারোয়ারীর জমিদার ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর, ধরে ফেললেন তাকে। ঠিক সেই সময় পুলিশ সুপার ও দেহরক্ষীদের নিক্ষিপ্ত গুলীও রবির শরীরে এসে বিদ্ধ হয়েছে। জোর করে তার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নেয়া হলো!

ভবানী কিন্তু এদিকে ফিরেও চাইলো না। কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সে, সহকর্ম্মীর দুঃখের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তিলমাত্র অবসর তার কোথায়? রবির পশ্চাতে একেবারে সোজা সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গভর্নরের আসনের সম্মুখে, একেবারে point-blank range থেকে গুলী নিক্ষেপ করলো সে। প্রাণের ভয়ে গভর্নর রেলিংয়ের নীচে শুয়ে পড়লেন, লাথি খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর যেমন করে পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে কেঁউ কেঁউ শব্দ করে। প্রথম গুলী ব্যর্থ হওয়ায় ভবানী আবার উঁচিয়ে ধরলো আগ্নেয়াস্ত্র, এমন সময় অকস্মাৎ তাকে পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলেন পি ডবলিউ ডি-র ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ট্যাণ্ডি গ্রীন। ভবানীও গ্রেপ্তার হলো।

······তারপর চললো পুলিশের বৈদ্যুতিক অভিযান······ঘিরে ফেলা হলো সমগ্র ঘোড়দৌড়ের মাঠ, দার্জ্জিলিং স্টেশনে ছুটলো পুলিশ, ছুটলো মোটরবাসের স্ট্যাণ্ডে, আটক করলো শিলিগুড়িগামী সমস্ত প্রাইভেট মোটর ও ট্যাক্সি এবং লরী, মাঝপথে থামিয়ে ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরা তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চললো, পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে পড়লো আই বি ও পুলিশের দল একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের দুর্গন্ধ পেয়ে।······কিন্তু এদের সর্ব্বসতর্কতা ও প্রহরার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে একেবারে দার্জ্জিলিং শহর থেকে ভবানী ও রবির সহগামী যাঁরা নেমে এলেন কলকাতা শহরে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বি ভি-র বিপ্লবিনী কিশোরী উজ্জ্বলা মজুমদার।

এই মামলার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাই জানেন, ক্রমে ক্রমে পুলিশ

অনেককেই গ্রেপ্তার করে—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, নান্টু ঘোষ এবং আরো জনকতক বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য এবং অবশেষে উজ্জ্বলা মজুমদারকেও। মামলাব সওয়াল করতে গিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যাঁদের বুদ্ধি কাজ করেছে, তাঁদের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন কামাখ্যা রায়ের নাম, যতীশ গুহের নাম। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের এই তু'জনকে অতিবুদ্ধি দেখিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ করে এবং বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়ে কী মারাত্মক আত্মঘাতী ভুলই না করেছিল তখনকার বাংলার আই বি, সে সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে তারা উপলব্ধি করলো।

পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বলার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোমলপ্রাণা নারীও যে তুষ্ট লোকের প্রবোচনায় ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে কীভাবে নরহন্ত্রী হয়ে উঠতে পাবে, এই কিশোরীই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাক্ষ্য ও দলিল থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, যতীশ গুহের পবিকল্পনা কার্য্যে পবিণত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে নান্টু ঘোষ, মধু তাকে সাহায্য করে দক্ষিণ হস্তের মতো। তারপর যে ক্ষুদ্র দলটি দার্জ্জিলিং যাত্রা করে প্রস্তুত হয়ে, উজ্জ্বলাই ছিল সে দলের নায়িকা। সাধারণের মনে যাতে বিন্দুমাত্রও রাজনৈতিক সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেজন্য আধুনিকা বেশধারিণী এই স্মার্ট কিশোরী কিশোর সহকর্ম্মীদের নিয়ে এসে ওঠে একটি ব্যয়বহুল হোটেলে। সেখানে একই কক্ষে এরা বাস করতো। রাত্রে হোটেলের সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লে এই বিপ্লবিনী নায়িকা দার্জ্জিলিংয়ের শীতের প্রকোপে পাছে অকেজো হয়ে যায়, তাই রিভলভারের কার্তুজগুলো আগুন জ্বালিয়ে সেঁকে নিত, সহকর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিত কীভাবে কাজ শেষ করতে হবে।……

স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনালের বিচারে ভবানীব ফাঁসির হুকুম হয়। উজ্জ্বলাও ফাঁসি থেকে রেহাই পেত না। পেয়ে গেল শুধু মহিলা বলে।

আমার মাসিক ভাতা পঁচিশ টাকা প্রথম সপ্তাহেই আসতো নিয়মিতভাবে মেদিনীপুর আই বি অফিস থেকে মনিঅর্ডাবযোগে। ১৯৩৫ সালের অবস্থা এখন কিন্তু কল্পনা করা কঠিন। সে যুগে ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করে কলকাতা শহরে খুব স্বচ্ছন্দে না হলেও বিনা

দুঃখেই দিন কাটাতে পারতেন। একশো টাকা মাইনের বর সে যুগে অত্যন্ত মহার্ঘ মনে করা হতো।

আমার কিন্তু কিছুতেই চলতে চাইতো না। কি করে, কোথা দিয়ে সব টাকা শেষ হয়ে যেত তৃতীয় সপ্তাহেই। গিয়েই যে চাকরটা পাওয়া গেল, ব্যাটা একদিন আমার ফাউন্টেন পেন নিয়ে সরে পড়লো। তারপর জমাদার যেটাকে জুটিয়ে দিলেন, সেও একদিন চম্পট! ফলে, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রায়ই বিভ্রাট লেগে যেত। জমাদারের বাড়ীতে এমনি খাওয়া ভদ্রতাসূচক দেখায় না বলেই হাট থেকে মাছটা, মিষ্টিটা কিনে পাঠিয়ে দিতে হতো। তাই হতো ব্যয়বাহুল্য। কিন্তু উপায় কী? জীবনে মেসে খাইনি, রান্নাও করতে জানিনে।

ক্ষীরোদবাবু মফস্বল থেকে প্রায় সাত-আট দিন পর ফিরে এসে আমার দুরবস্থার কথা শুনলেন। আমি দু'বেলা অবিনাশবাবুর বাসায় খাই শুনে আমার অব্যবস্থার জন্য তাঁর দরদ যেন অকস্মাৎ একেবারে উত্তাল হয়ে উঠলো। বললেন: বলেন কি, আপনার চাকর পলাতক? তাহলে তো ভারী কষ্ট হচ্ছে আপনার!

বলতে চেষ্টা করলাম: না, না, কষ্ট কিসের? অবিনাশবাবুর ওখানে বেশ যত্নেই তো খাচ্ছি একেবারে নিজের বাড়ীর মতো।

দারোগা কণ্ঠস্বর খাটো করে বললেন: দেখবেন, গৃহকর্ত্রী আবার আপনাকে বেশী আপনার না ভেবে বসেন। চেহারাখানা তো আপনার ভালো নয়, তাই সে আশঙ্কা—

বাধা দিলাম: না, না, ওকি কথা বলছেন, দারোগাবাবু! তবে হ্যাঁ, আদর-যত্ন খুব করেন বৌদি!

দারোগা হেসে উঠলেন।

তারপর রামভরসা সিংকে কোথায় পাঠিয়ে ডেকে আনালেন একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে। বললেন: দ্বিজেনবাবু, চাকর-বাকর এখানে কিছুতেই পাবেন না। আমরাই পাই না, পাই তো রাখতে পারি না। শালারা কোথাও দু'দিন টিঁকে থাকে না। তার চাইতে এক কাজ করুন, এই মেয়েছেলেটিকে রাখুন। ভালো রাঁধতে পারে, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনি একা মানুষ, ও-ই সব কাজ করে দেবে। আর বাড়ী এই কাছেই, আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে কাজকর্ম সেরে রাত্রে বাড়ী চলে যাবে।—কি রে হরিমতী, থাকবি ডেটিনিউবাবুর বাসায়?

দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। মুখখানা আধখানা ঘোমটায় ঢাকা। দারোগার প্রশ্নের

জবাবে কোনো সাড়া না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লো। মনে হলো, ভারী লাজুক। কাজ হয়তো ভালই করবে, অন্ততঃ দারোগার ভয়ে না-ও পালাতে পারে।···কিন্তু মেয়ে রাঁধুনী—

বললাম : চাকর-বাকর কি এদেশে একেবারেই মেলে না দারোগাবাবু ?

হ্যাঁ, মিলবে না কেন,—দারোগা সোৎসাহে জবাব দিলেন : তবে কি জানেন, প্রায়ই দেখবেন গায়ে চকরওয়ালা। রামমোহন ডাক্তারের ওখানে তো নিশ্চয়ই দেখেছেন এমনি অসংখ্য রোগী। ম্যালেরিয়া আর সিফিলিস, এই হচ্ছে এ দেশের বৈশিষ্ট্য !

আঁৎকে উঠলাম ! সিফিলিস !···

দারোগা বলতে লাগলেন : তার চাইতে জানা লোক নেয়া অনেক ভাল। ভাবছেন বুঝি ঝি বলে। তাতে দোষ কী ? মিথ্যে বদনাম অন্ততঃ রাজবন্দীদের কেউ দিতে সাহস করবে না। আর করলেই কি আপনারা তাই কেয়ার করে চলবেন ?

সত্যিই তো, মিথ্যাকে কীসের পরোয়া ?···থানা কক্ষের অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতেই দেখলাম অবিনাশবাবু তাঁর কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা বড় বড় চোখ দুটো মেলে যেন আমায় জ্বালিয়ে দিতে চাইছেন রোদে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মুখে নারকেলের ছিবড়ের মতো।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। ক্ষীরোদ দারোগার বক্তৃতার তোড়ে আর 'না' করবার সুযোগই পেলাম না। হরিমতী বহাল হয়ে গেল। ঘোমটা কমিয়ে স্মার্ট মেয়ের মতো এগিয়ে গেল সে আমার ঘরের দিকে। বোকার মতো চেয়ে রইলাম সেদিকে।

শ্রীমতী হরিমতীর মতিগতি ভবিষ্যতে কি রকম হয়ে দাঁড়ায়, কে বলবে !······

এগারো

অদ্ভুত এই কেশিয়াড়ী গ্রামটি। এর ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি করুণ। পরিধি দুই বর্গমাইল হবে। এককালে ঘন বসতি ছিল। জটাধর সেনাপতির বাবা ছিলেন এই গ্রামের ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে নাকি জল পান করতো। প্রকাণ্ড হাট, তখন সপ্তাহে বসতো তিন দিন। হাটের দিকের সুবিশাল দীঘিতে গদাধর জমিদার অসংখ্য পোনা ছাড়তেন। পশ্চিম দিকের বট গাছটার নীচে ছিল হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালার আখড়া। মাছ পাহারা দিত সে রাত্রিকালে সাত ব্যাটারীর টর্চ্চ জ্বালিয়ে। গদাধরের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ চলতো আর সাঁওতাল ও উড়িয়া প্রজাদের অন্ততঃ হাজারখানা পাতা পড়তো। গদাধর নিজে যেমন দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সমাদর করে খাওয়াতেন, তেমনি সালের খাজনা একটি পয়সা বাকি পড়লে বা জমির ধান একটি সের কম হলে খড়ম নিয়ে ধেয়ে আসতেন দোতলা থেকে। রক্তারক্তি কাণ্ড একটা হতোই বকেয়া খাজনা বা ধানের ব্যবস্থা না করলে। অথচ পুলিশ এতে নাক গলাতো না। গদাধরের দপ্তরখানার ফরাশে বসে টিনের পর টিন সিগারেট উড়ে যেত আর সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোও সব হয়ে যেত ধোঁয়া!

তারপর চাকা ঘুরতে লাগলো সেদিন থেকে যেদিন ম্যালেরিয়ার মশা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে ডিম ছাড়তে শুরু করলো। পচা ডোবা, নালা, বাঁশঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল একেবারে ছেয়ে গেল এ্যানোফিলিস মশার ডিমে। বারো মাস মড়ক লেগে রইলো ম্যালেরিয়ার। বাড়ীতে বাড়ীতে কান্নার রোল আর থামতে চাইলো না। ভয়ে আতঙ্কে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় করে, পুরুষানুক্রমে যারা বাস করে আসছে এই গ্রামে, তারা দলে দলে ভিটেমাটি ছেড়ে হারা-উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো শুধু বাঁচবার প্রত্যাশায়।

গদাধর সেনাপতি শুধু সরকারী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে সেনাপতির মতোই যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কালান্তক যম মশার বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারলেন না, ধরাশায়ী হলেন চিরদিনের মতো। মাত্র সাত দিনের জ্বরে বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

গদাধর বিদায় নেবার পর সুবিশাল দীঘিতে কচুরীপানা দেখা দিল, শেওলা জমতে লাগলো তার বিরাট ঘাটলায়। পাহারাওয়ালার আখড়া মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। হাটে আর বেচাকেনা নেই। তিন দিন থেকে এখন হাট এসে ঠেকেছে দু'দিনে। সেনাপতির বাড়ীর নাটমন্দিরে কবুতর আর চামচিকের রাজত্ব, দোলমঞ্চে জঙ্গল, সিংহদরজার পাট খসে পড়ে গেছে।···স্যানিটারী ইনসপেক্টর প্রেমতোষ সেনের কাছ থেকে কেশিয়াড়ী গ্রামের এই মর্ম্মন্তুদ ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় ট্রের ওপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো ভৃত্য। বিকেল তখন গোটা চারেক হবে, সুতরাং চা ও খাবারে আপত্তি থাকবার কোনো কারণ নেই। প্রেমতোষ কিন্তু বক্তৃতার সুযোগ পেয়ে তখনো বলে যাচ্ছেন: বর্ত্তমান অবস্থা হচ্ছে এই গ্রামে মৃত্যুর হার জন্মের চেয়ে বেশী অর্থাৎ যে হারে লোক মরছে, বছর দশেক পর এ গাঁয়ে থাকবে শুধু বাঁশঝোপ আর কাঁটা গাছ।

জিজ্ঞেস করলাম: কিন্তু ম্যালেরিয়া তাড়াবার ব্যবস্থা গভর্নমেণ্ট কী করছেন?

চেষ্টার তো ত্রুটি নেই। আমাদের যথাসাধ্য আমরা করছি।

চা খেতে খেতে নানারকম আলাপআলোচনা হতে লাগলো। আমার দেশ কোথায়, বাড়ীতে কে কে আছেন, কবে গ্রেপ্তার হয়েছি ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে একসময় রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। প্রেমতোষ বললেন: যাই বলুন দ্বিজেনবাবু, দুটো সাহেব মেরে দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। কংগ্রেসের 'স্বদেশী পর' নির্দ্দেশ আমার খুব পছন্দ হয়। ওদের মালপত্র বয়কট করলেই ব্যাটারা ভাতে মরবে। তখন না পালিয়ে পথ থাকবে না।

কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের মতবাদ নিয়ে এঁর সঙ্গে কী আর তর্ক করবো! ছোরা-ছুরি বা খুন-জখমের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ আঁৎকে উঠবেই। কিন্তু কী করে বোঝাবো এঁদের যে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। অস্ত্রোপচার যেখানে অপরিহার্য্য, সেখানে মিকশ্চারের ফাঁকা প্রবোধ কার্য্যকরী হবে কি করে? আজ্জির আঘাতে কাউকে কাবু করতে পারা গেছে বলে রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।······

অকস্মাৎ প্রেমতোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন: রয়েল সার্কাস দেখতে যাননি দ্বিজেনবাবু?

চমকে উঠলাম। এ প্রশ্ন কেন? ক্ষীরোদবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই সার্কাস প্রায় রোজই দেখেছি আমি। স্যানিটারী ইনসপেক্টরকে দেখিনি সেখানে। পাল্টা প্রশ্ন করলাম: কেন আপনি দেখেননি?

না, ভাই। আমি গিয়েছিলাম সদরে। অনেকগুলো Adulteration-এর মামলা ছিল।—বলে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন: আর দারোগাবাবুও তো ছিলেন না। কাজে কাজেই থানা তো আপনারই ছিল, কি বলেন?

কি রকম?

প্রেমতোষ বললেন: রকম আর কি! দারোগাবাবু না থাকলে কে আর আপনাকে বাধা দেবে বলুন? কেন বাধা দিতে যাবে? তা ভালোই করেছেন দ্বিজেনবাবু! এখানে সার্কাস হবে আর আপনি তা দেখতে পাবেন না, এ আমার ভালো লাগে না। কিন্তু কেমন সার্কাস বলুন তো? দেখবার মতো তো?

বললাম যে, একেবারে গ্রাম্য নয়। তবে প্রায় খেলাই balancing-এর খেলা। টাকা-পয়সা বোধহয় তেমন পায়নি, কারণ দেখা গেল সবই বিনে পয়সায় দেখবার গ্রাহক। সার্কাসের গল্প হতে হতে প্রেমতোষ আরও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বসলো যে, জটাধর সেনাপতির তাসের আড্ডায় আমি যাই কিনা, সেখানকার অপূর্ব্ব পান ও দামী সিগারেট আমার ভাগ্যে জুটেছে কিনা। আফিম ভেণ্ডার গোপাল রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে কিনা, প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় পোস্ট অফিসের মাস্টার নীলরতন জানা কেমন লোক, কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী কবে আসছেন ইত্যাদি। এমনিভাবে প্রেমতোষের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অকস্মাৎ মনে খট্‌কা বেধে গেল, লোকটির ঔৎসুক্য এত বেশী কেন? কারণ কী?

সতর্ক হতে যাবো, এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। চেয়ে দেখি মাথার ওপর ঝোলানো রয়েছে পেতলের একটি মাঝারী আকারের ঘণ্টা, যেমনটি থাকে মন্দির-প্রবেশদ্বারে—দর্শনেচ্ছুরা ওটা বাজিয়ে দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। দেখলাম, দোলকটির সঙ্গে সরু দড়ি বাঁধা, আর তার অপর প্রান্ত বেড়ার ফাঁক দিয়ে অন্দরের দিকে চলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম: ও কি, ঘণ্টা কিসের প্রেমতোষবাবু?

সহাস্যে জবাব দিলেন প্রেমতোষ এবং সগর্ব্বে: হার একসেলেন্সি কলিং।

অর্থাৎ প্রায় সময়ই এখানে এত লোকজন থাকেন যে, শ্রীমতী প্রয়োজন হলে আমায় আর ডাকতেই পারেন না এখানে এসে। তাই ঘন্টা করে দিয়েছি, দরকার হলেই দড়িতে টান দেয়—ভালো ব্যবস্থা হয়নি দ্বিজেনবাবু?

এবার উচ্চৈঃস্বরে না হেসে পারা গেল না। বললাম: আপনি একজন অফিসার। আপনি এমনিভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকবেন বেয়ারাকে। আর তা নয়, আপনাকেই তলব করবার জন্য এই ব্যবস্থা? যাঁরা থাকেন, সবাই বেশ উপভোগ করেন না এই ঘণ্টাধ্বনি?

প্রেমতোষ ছাগলের মতো হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন: কিন্তু কেমন অরিজিন্যালিটি বলুন তো?—কিন্তু বসুন ভাই, এক মিনিট, আসছি। আমার বড় সাহেব নয়, বড় মেমের আহ্বান কিনা—বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

ঘন্টাটির দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে যেতেই নজরে পড়লো একখানা অকৃটো ফটো—প্রেমতোষের আটরকম ভাবের অভিব্যক্তি। নানারকম মুখ-বিকৃতির মধ্য দিয়ে কি ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, তা স্বয়ং প্রেমতোষ ব্যতীত আর কারুর পক্ষে বোঝবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হলো না। কিন্তু এই মুখবিকৃতির নিদর্শন এমনিভাবে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘটা করে একেবারে বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রেখে আত্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে অভিনেতার ক্ষুদ্র মনের যে পরিচয় পেলাম, আদৌ ভালো লাগলো না তা। অথচ, হয়তো এই রকম লোকদের সঙ্গেই এখানে কাটাতে হবে কয়েকটি বছর। ভাবতেই মনটা যেন কতকটা দমে গেল।......

পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। থানায় একবার হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে যে আমি বেঁচে আছি এবং পলায়ন করিনি। ক্ষীরোদবাবু নেই, সুতরাং সময়ানুবর্ত্তিতার কড়াকড়িও নেই।

অবিনাশবাবু দেখেই বললেন: আসুন, আসুন! রামভরসা সিং, ঐ চেয়ারখানা ডেটিনিউবাবুকে এগিয়ে দাও।

বসলাম। ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধু সুধীর এক পাশে বসে কি লিখছে। আর দরওয়াজা রামভরসা বারান্দায় একটু আড়ালে টুলের ওপর বসে পাহারায় রত। কিংবা বিড়ি টানছে। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন: আপনাকে তো মশাই একান্তে আর পাওয়াই যায় না। আর

আজকাল হরিমতীর আদরযত্নে আমাদের কথা বোধহয় আর মনেই পড়ে না, তাই না দ্বিজেনবাবু ?

ভালো লাগলো না কথাটা ! জিজ্ঞেস করলাম : আদরযত্ন মানে ? ঝি, মাসের শেষে পাঁচ টাকা মাইনে দিই, পেটের দায়ে খাটে, তার আবার আদরই বা কি, যত্নই বা কি ?

হেঁ হেঁ শব্দ করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলেন অবিনাশবাবু। লক্ষ্য করলাম সুধীরের অধরেও হাসির ঝিলিক। ভালো লাগলো না এবং আরও খারাপ লাগতে লাগলো তখন, যখন অবিনাশবাবু সবিস্তারে, সবিল্লাসে, টীকা ও টিপ্পনী সহযোগে শ্রীমতী হরিমতীর গৌরবোজ্জ্বল অজ্ঞাত ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলেন ! যৌবনে হরিমতী ছিল এ তল্লাটের ক্লিওপেট্রা। শ্রীক্ষেত্রের মতো প্রসাদ বিতরণে কার্পণ্য ছিল না তার কোনো দিন এবং সেকালে গদাধর সেনাপতি থেকে শুরু করে গোপাল রায় পর্য্যন্ত সবাই একাধিক বার হরিমতীর গৃহে পদার্পণ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন। তারপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রাম যেমন ছারখার হয়ে গেল, তেমনি দীর্ঘদিনস্থায়ী রোগে উর্ব্বশী হরিমতীর যৌবনের বিভা অকালে নিষ্প্রভ হয়ে এল। ফলে পসার গেল কমে।···তারপর এলেন দারোগা ক্ষীরোদবাবু। ডুবুরির মতো রত্নটিকে খুঁজে নিতে অবশ্য তাঁর দেরী হলো না। এখন ক্ষীরোদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের সোল এজেন্সী নিয়েছে এই হরিমতী। অবিনাশবাবু বললেন : আপনার এখানে চাকরি হওয়াতে বেশ সুবিধেই হয়েছে দারোগাবাবুর। আর্জ্জেণ্ট অর্ডারগুলো বেশ তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় আর মালের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় সহজেই। কি বল সুধীর ?

সুধীর টিপ্পনী কাটলো : তা ডেটিনিউবাবুকেও কোন্ দিন বঁড়শীতে গেঁথে ফেলবে কে জানে !

জিজ্ঞেস করলাম : এ্যাদ্দিন বলেননি কেন ?

বলবো কি মশাই ! আপনি তো এখন ক্ষীরোদবাবুর কথাই বেদবাক্য মনে করেন। আমাদের মতো চুণোপুঁটী জমাদার আর সুধীরের মতো চ্যাংটাকি এল সি-কে তো আর চোখেই দেখতে পান না। কি বল সুধীর ?—বলে অবিনাশবাবু আবার হাসতে লাগলেন।

দরওয়াজা এসে একখানা আর্জ্জি জমাদারের হাতে দিয়ে জানালো, বাইরে দুটো মরদ আর দুটো মাগী এসেছে দেখা করতে।

উঠে পড়লাম। ঘরে এসে বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম। জানালার ঝাঁপ তোলা ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ আর সেই টুকরো-টুকুর মধ্যে আঁকা একখানি বেশ বড় চাঁদ। চাঁদের আলোয় চারিদিকের বাঁশ ঝোপ ও জঙ্গলের শীর্ষদেশ উদ্ভাসিত। দূরে কোথায় সাঁওতালদের মাদল বাজছে। থানার সীমানার বাইরে গোটাকয়েক ধানের ক্ষেতে চাঁদের আলো ঝিরঝির করে কাঁপছে। আমার বাগানে ফুটেছে অজস্র বেলফুল ও রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ আর যুঁই। চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে। এমনি চাঁদ যেন অনেককাল দেখিনি আর এমনি ঝিরঝিরে হাওয়াও এত মিষ্টি লাগেনি।

আমার গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের কেয়টখালী গ্রাম।

সে কি আদর্শ গ্রাম? সে কি বাংলা দেশের সেরা গ্রামের মধ্যে একটি? গ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত এই গ্রামটি কি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে? না, তা নয়, একেবারেই নয়। দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ক্ষুদ্র এই গ্রামে নেই কোনো ভালো পাঠশালা, হাইস্কুল নেই, নেই ভালো ডাক্তার বা দাতব্য চিকিৎসালয়, নেই দৈনিক বাজার, এমন কি, হাটও বসে না এই গ্রামে। একান্তভাবে পাশের গ্রামের মুখাপেক্ষী এই গ্রাম। গ্রামে বাঁধানো কোনো সড়ক নেই, ঘাটলা-বাঁধানো কোনো দীঘি নেই, নেই কোনো বারোমেসে খাল। অথচ, বর্ষাকালে নদীর জল এই গ্রামে এসে হানা দেয় শুধু নয়, গ্রাম ডুবিয়ে দেয়, খানাডোবা ছোট ছোট জলাশয় সব ভাসিয়ে দিয়ে জল এসে আঙ্গিনায় ওঠে, ঘরেও প্রবেশ করে কোনো কোনো বছর। সব একাকার হয়ে সারা গ্রামখানাই যেন জলের ওপর আধ-ডোবা হয়ে ভেসে থাকে। জলের প্রাদুর্ভাবের ফলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আঙ্গিনায় উঠে আসে, ঘরের মধ্যেও উঠে পড়ে নানারকম মাটির পোকা, ব্যাং, কেঁচো, জোঁক, এমন কি, সাপও। সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়।

আশ্বিনের শেষে সেই জলে টান ধরে, খানাডোবা ও জলাশয়গুলিতে নানাজাতীয় জলজ-জঙ্গল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, জল পচে যায়, দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। দেখা দেয় নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধি। বিনা চিকিৎসায় বা হাতুড়ে চিকিৎসায় দলে দলে লোক মরে।

গ্রামের শতকরা আশীজন অধিবাসীই মুসলমান, এবং তারা চাষী। কেউ চাষ করে, কেউ জন খাটে, কারুর কারুর ছোটখাটো মুদির দোকান আছে।

অবশিষ্ট বিশ জন হিন্দুর মধ্যে গোয়ালা আছে, বারুজীবি আছে, ধোপা ও নাপিত আছে, ভুঁইমালীও আছে। বর্ষাকালে অনেকেই নৌকো চালায়, ভাড়া খাটে। ভদ্রলোক শ্রেণীর যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চাকরিজীবি। বিদেশে বাস করেন, দেশের বাড়ীতে ঝাঁট দেবার জন্য ও আলো জ্বালাবার জন্য আছেন কোনো দিদিমা, পিসিমা বা বেতনভোগী কোনো লোক।

কেয়টখালীতে এত বেশী মুসলমান অধিবাসী কেন, তার পশ্চাতে একটি কৌতুকজনক ইতিহাস আছে।

একদা এই গ্রামে ছিল দিগন্তপ্রসারী ধানের ক্ষেত আর বিপুল সেই স্বর্ণ-ফসলের মালিক ছিলেন ছুটি ডাকসাইটে জমিদার, পুব পাড়ার মজুমদার আর পশ্চিম পাড়ার চক্কোত্তি। জমির সীমানা নিয়ে ও ফসলের ভাগাভাগি নিয়ে শুধু যে ঝগড়াই চলতো তা-ই নয়, রক্তদর্শনও হতো। রাতের অন্ধকারেই শুরু হয়েছিল প্রথমটা, কিন্তু পরে অকস্মাৎ জমিদারযুগল উপলব্ধি করলেন যে, চুরি করে ছুরি মারার মধ্যে যেন কোথায় ভয় ও কাপুরুষতা আছে, জমিদারের মর্য্যাদায় বাধে।······সুতরাং লাঠিয়াল আমদানী শুরু হয়ে গেল দিনের বেলায় মুখোমুখি ও হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য। আর সে যুগে মুসলমান লাঠিয়ালদেরই যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় কোথায়? পিল পিল করে আসতে লাগলো তারা এবং কেউ নামমাত্র খাজনায়, কেউ-বা একেবারে বিনা খাজনাতেই বেশ কিছু ধানী জমি ও বসতবাটি পেয়ে প্রজা হয়ে বসে গেল।

কালক্রমে মজুমদার ও চক্কোত্তিদের ডাকসাইটে বংশে আসতে লাগলো নিরীহ শান্ত ও নম্র স্বভাবের মানুষ। কলসীর কাণা নিয়ে রুখে না দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রেমালিঙ্গনেই বেঁধে ফেললেন একে অপরকে। বিরোধ গেল, সখ্য স্থাপিত হলো, কিন্তু মুসলমান প্রজারা তখন কায়েম হয়ে বসে গেছে।

কিন্তু বিরোধ গেলেই কি সব অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা দূর হয়ে গেল? না, তা নয়, একেবারেই নয়। আরো দশখানা গ্রামের মতো এই গ্রামেও আজও আছে ক্ষুদ্রতা, নীচতা, আছে ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, আছে গ্রাম্য দেবতা, আছে নিন্দা, কুৎসা, আছে গ্রাম্য দলাদলি আর মামলা-মোকদ্দমা।

সবার কাছেই হয়তো মনে হবে বর্ণ-গন্ধ-স্বাদহীন, অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য এই কেয়টখালী গ্রাম। অনুল্লেখযোগ্য, অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর এক মুঠো ধূলোর মতো!······

কিন্তু তোমাদের কাছে যা-ই হোক্, আমার কাছে এ-ই আমার গ্রাম, আমার নিজের গ্রাম। আমার কেয়টখালী! দুই বাহু বিস্তার করে চীনের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছি আমার এই গ্রামকে। আলিঙ্গনে তুলে নিয়েছি বক্ষের কোটরে, মা যেমন করে তুলে নেয় তার অক্ষম পঙ্গু সন্তানকে।

এই পঙ্গু গ্রামের প্রতিটি শিরা-উপশিরা, প্রতিটি রক্তকণিকা আমার চেনা, যেন জন্মজন্মান্তরের চেনা। চিনি, শুধু চিনি নয়, আমার অন্তরের গভীরে পাথরের রেখায় উৎকীর্ণ রয়েছে এর প্রতিটি পথ, প্রতিটি তৃণ, প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি গৃহ এবং সেই সব গৃহের প্রতিটি মানুষ!……

কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায় আমাদের বাড়ী থেকে তপাদার বাড়ী যাবার পথ কোন্‌টি, চোখ বুজে বলে দিতে পারি। যদি ফাল্গুন-চৈত্র হয়, তাহলে আমাদের বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণের গাছের গুঁড়ি বিছানো ধাপ বেয়ে নামতে হবে। দক্ষিণে পুকুর, বামেও পুকুর, কিন্তু দুই পুকুরের মাঝখানের পাড়ের ওপর দিয়ে এসে উঠতে হবে চক্রবর্ত্তী পাড়ায়। বিলাস কাকার বৈঠকখানা বাঁয়ে রেখে আর ডান দিকে অখিল কাকার বাড়া রেখে গলি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সোজা উত্তরে! তারপরই স্থরেনদা'র দালানের কোণেই ডান হাতে ঘুরতে হবে। বাঁ দিকে অশ্বিনী কাকার ঘর, তারপর উঠোন, তার ওপারে হয়তো দেখা যাবে মহাপুরুষ পুরোহিত গরুকে জাবনা দিতে ব্যস্ত। একটু এগোলেই কালীমোহন কাকার দালান, তারপরই তাঁর রান্নাঘর। নির্ব্বিবাদে সেই রান্নাঘর পার হয়ে এগুনো সম্ভব নয়। কারণ ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেই কাকীমা হয় ডাকবেন, নইলে পাশ কাটাতে চাইলে নিজেই বেরিয়ে আসবেন গলিতে। তারপর কোনোরূপ ভূমিকা না করে, কোনো সমর্থন বা প্রতিবাদ এমন কি, কোনো কর্ণপাতের তোয়াক্কা না রেখে অনর্গলভাবে অশ্রাব্য ভাষায় বলে যাবেন পাড়ার বৌ ও মেয়েদের কদাচারের কথা, বাড়ীর কর্ত্তা ও গিন্নীদের সন্দেহজনক নিস্পৃহতার কথা এবং সেই কথার সমর্থনে এমনি সব লোমহর্ষক ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে শুরু করবেন যে, পূজনীয়া কাকীমার বারবার অনুরোধেও আর অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। এগিয়ে যেতে হবে। ডাইনে এবং বাঁয়ে ডোবাগুলি অতিক্রম করে উত্তর দিকের রাস্তা ঘুরে আবার দক্ষিণে এসে মাথন মুদিদের পাড়ায় না ঢোকা পর্য্যন্ত কাকীমা রেহাই দেবেন না। সেখান থেকে ফিরে যাবেন ফেরার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবার বার বার অনুরোধ জানিয়ে।

মাখন মুদিদের পাড়ার পরই মিত্তিরমশায়ের বাড়ী। বহুকালের ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে বাড়ীতে আর আছেন বোধহয় ঐ মন্দিরেরই সমবয়সী মিত্তির জ্যাঠা। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই মিত্তির জ্যাঠা। তাঁর বাড়ী পেরুলেই বাঁ হাতে রসিক কবিরাজের বাড়ী। ডান দিকে একটা বড় ডোবা। এককালে নাকি মিত্তিরদের কাজলা দীঘি ছিল। মজে গেলেও এখনো জল থাকে আর সেই জলে সম্মুখের বোসদের বাড়ীর অনেকগুলো পাতি হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে দেখতে পাওয়া যাবে। বোসদের বাড়ীও প্রায় খালি। দূর সম্পর্কীয় কে থাকেন আর আছে এক কর্ম্মচারী। সবাই বিদেশবাসী। কেউ ঢাকায়, কেউ কলকাতায়, কেউ-বা আরো দূরে। আর একজন থাকেন আরও—আরও অনেক দূরে, একেবারে সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে পশ্চিম গোলার্দ্ধে, আমেরিকায়। আমেরিকার বিখ্যাত আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক সুধীন্দ্র বোস। ঐ বোসদেরই ছেলে, এই ক্ষুদ্র নগণ্য কেয়টখালী গ্রামেরই ছেলে !······

বোসদের বাড়ী ছাড়ালেই বারুই পাড়া, নাপিত পাড়া, তারপর ভুঁইমালী পাড়ার মধ্য দিয়ে সরু গলিপথ। দু'পাশে সারি সারি মাদার গাছ, শিমুল গাছ, আম ও কলাবাগান, তার নীচে নীচে বেতঝোপ, ঘেঁটুফুল ও ধুতুরার জঙ্গল, কত নাম-না-জানা বুনো ফুল, গাছের ডালে ডালে কত নাম-না-জানা পাখীর কলরব।

পাড়া থেকে দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে এলেই পড়তে হবে মাঠে। মাঠ মানে, ধানের ক্ষেত। বর্ষায় ধান আর শীতে হয় তরিতরকারি, মুশুর, মটর, কলাই। আল ঘুরে ঘুরে এগিয়ে গেলেই দূরে দেখা যাবে মজুমদারদের পুরোনো বাড়ী। ভগ্ন অট্টালিকা। আস্তরহীন, ছোট ছোট ইটের সারি দেখা যায়। চণ্ডীমণ্ডপের কার্নিশে কবুতরের দঙ্গল। মজুমদার বাড়ী বাঁয়ে রেখে যদু চাটুজ্জ্যে মশায়ের বাড়ীও বাঁয়ে রেখে ঐ মাঠ দিয়ে পুব দিকে এগিয়ে গেলেই পড়বে ব্যানার্জ্জী পাড়া।

তপাদার বাড়ী যেতে হলে এবার যেতে হবে পশ্চিমে। কামিনী ব্যানার্জ্জী-দের প্রকাণ্ড টিনের চৌ-চালা, তারপর অনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী, ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে আর-একটু এগিয়ে গেলেই এসে যাবো তপাদার বাড়ীতে। এগিয়ে আসবে যোগেশ তপাদার। শুধু ভদ্র ও বিনয়ী নয়, সদা হাস্যময়। নিয়ে গিয়ে একেবারে তার শয়নকক্ষে খাটেই বসাবে পরম সমাদরে।

জীবনে যতবারই দেখা হয়েছে যোগেশের সঙ্গে, ততবারই সেই অম্লান হাসি দিয়েই সে কথা শুরু করেছে।……

কেয়টখালীর সকাল স্পষ্ট মনে করতে পারি। শুধু সকাল কেন, সারাটা দিন আমাদের পাড়ায় আমাদের গ্রামে যা যা ঘটে থাকে, শুধু তাই-বা কেন, প্রত্যেকটি ঋতু কি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন নিয়ে আসে আর তার পরিবর্ত্তনশীল প্রভাব কিভাবে প্রেরণা জোগায় আমাদের মনে আর কিভাবে তা ফুটে ওঠে আমাদের চলাফেরায়, মনের মধ্যে তা গাঁথা রয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি অথবা আষাঢ়ের প্রথম দিকে দ্রুতবর্দ্ধমান নদীর জল হু হু করে খাল বেয়ে এসে পথঘাট ডুবিয়ে দেয় আর সেই জল নামতে শুরু করে আশ্বিনের শেষাশেষি। সুতরাং পুরো পাঁচটি মাস আমাদের দেশে বর্ষাকাল বলা চলে। আড়িয়ল বিলের ধারেই আমাদের গ্রাম, বিক্রমপুরের পূর্ব্ব দিকের তুলনায় বেশ নীচু জমি। তাই আমাদের গ্রামের মাঠে কোথাও কোথাও জলের গভীরতা বারো হাত পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। নদীর সঙ্গে প্রায় দশ মাইল দূরে যোগাযোগ থাকলেও জল নদীর জলের মতো ঘোলা নয়, একেবারে টলটলে, অনেকখানি নীচে পর্য্যন্ত দেখা যায়।

স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসে অজস্র কচুরিপানা। হয়তো সেই সুদূর নদী থেকেই আসছে কিংবা হয়তো স্রোতের পথে কোনো গ্রামের পানাগুলো ঠেলে বার করে দেয়া হয়েছে। কোনো ডোবা বা পুকুরে শীতকালে হয়তো আটকে ছিল, বর্ষা পেয়েই এবং স্রোতের সুযোগ পেয়েই গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকরা তার মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে চাপ চাপ করে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে পানাগুলো সাবধানে ও সযত্নে স্রোতের মুখে ছেড়ে দেয়। যেখানে যায় যাক্, নিজের গ্রামের জঞ্জাল তো দূর হলো।

পরের গ্রামগুলোও কিন্তু নিজের-পরের বলে কোনো তর্ক তোলে না, কোনো বিক্ষোভ প্রকাশ করে না। কারণ তারাও ঠিক এমনিভাবে কচুরিপানা ঠেলে স্রোতের মুখে ছেড়ে দেবে, বরং সঙ্গে নিজেদের গ্রামের মজুত পানাও জুড়ে দিতে ভুল করবে না। ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধাক্কা খেতে খেতে এবং স্রোতে ভাসতে ভাসতে কচুরিপানার দঙ্গল অবশেষে আবার গিয়ে পড়ে ধলেশ্বরী নদীতে।

অপর গ্রামের কচুরিপানা যাতে আমাদের গ্রামে না প্রবেশ করতে পারে, সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থারও কি অন্ত আছে ? এ ব্যাপারে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে দেয়। বৃদ্ধেরা করেন প্ল্যান, দেন পরামর্শ আর যুবকেরা সেই প্ল্যান ও পরামর্শ অনুযায়ী দিন রাত খাটে। জলের স্রোত গ্রামের কোন্ কোন্ পথে প্রবেশ করছে, সর্ব্বাগ্রে তা পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। তারপর সেই সব পথের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত সার্ব্বজনীন চাঁদায়-কেনা একটি লোহার তার জলের সমান নীচু করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তার তো আর জলে ভাসবে না; সুতরাং কলাগাছের টুকরো তার মাঝে মাঝে বেঁধে দেয়া হয়। ফলে, জলের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে তার লম্বমান থাকে আর তাতে আটকে থাকে ভাসমান কচুরিপানা।

ক্রমবর্দ্ধমান পানার দঙ্গল যদি কারুর বাড়ীর দিকে নৌকো চালাবার পথটি অবরোধ করে দাঁড়ায়, তাহলে সে কি করবে ? একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি এসে তারটি তুলে ধরে রেখে নীচে দিয়ে পানাগুলো ছেড়ে দেয়। ধরে রাখার সাহস যদি না থাকে, তাহলে হয়তো গোটাকতক টুকরো কলাগাছ বিচ্ছিন্ন করে তারটা দেয় ডুবিয়ে কিংবা হয়তো গোটা তারটাই খুলে দিয়ে যায়।

পরিস্থিতি এমনি হয়ে পড়লে গ্রামসেবী যুবকের দল রীতিমতো রাত জেগে পাহাড়া দেয় এই তারের সীমান্তরেখা !

বর্ষাকালের বিক্রমপুরে কচুরিপানা সমস্যা বিশেষ !

কিন্তু আবার কাজেরও বটে।

সাদা ও সবুজ মেশানো কচুরিপানার ফুলের উপাদেয় বড়া হয়। বেসন দিয়ে ভাজা এই বড়া অনেকেই ভালোবাসে। কচুরিপানা ভালো সার। বর্ষাকালে কচুরিপানা গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সব চাইতে মজার ব্যাপার, এই পানার শিকড়ের মধ্যে অনেক সময় শিঙ্গি, মাগুড়, কৈ, ট্যাংরা, বাম্ প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। শিকড়গুলো নারদের লম্বমান দাড়ির মতো পানার তলায় ভাসতে থাকে আর মাছগুলি ওর মধ্যেই নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। এই মাছ ধরবার রীতিটাও অভিনব। সরু অথচ শক্ত বাঁশের তৈরী ত্রিকোণ ফ্রেমে-আঁটা জালটি সন্তর্পণে জলে নেমে পানার তলা দিয়ে ধীরে ধীরে চালিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ উঁচু করতে হবে। মাছেরা টেরও পাবে না যে তাদের চতুর্দ্দিকে জালের প্রাচীর

তৈরী হয়ে গেল। তারপরই ঝপাঝপ আরও দু'জন নেমে পড়বে এবং তিনজন তিনটি কোণ উঁচু করে ধরে জলের মধ্যকার পানাগুলো টেনে ফেলে দেবে। তারপর জালটি তুলে ধরলেই পাওয়া যাবে মাছ।

বর্ষাকালে মাছ ধরবার নানারকম কায়দা কানুন আছে। টলটলে জলের নীচে কখনো কখনো দেখা যায় ঘাটের কাছে এসেছে বেলে মাছ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চা সঙ্গে করে টাকি মাছ। ছিপ দিয়ে অনায়াসে ধরা যায়। আরও গভীর জলে ধানক্ষেত, কলমি বা শালুক দলের পাশে পাশে ট্যাংরা, পাবদা বা ছোট সাইজের পোনা মাছ ছিপে ধরা পড়ে। আরও গভীর জলে সহজেই ধরা যায় চিংড়ি মাছ। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরী খাঁচার মতো জিনিস আছে, যাকে বলা হয় গ্রাম্য ভাষায়, চেই। এতে প্রবেশের পথটি যেমন সহজ, বেরিয়ে আসার পথটি তেমনি গোলক ধাঁধার মতো কঠিন। চেই-এর সঙ্গে একখানা ইট বেঁধে লম্বা দড়িতে এটা নামিয়ে দেয়া হয় দশ-বারো হাত জলের নীচে যাতে চেইখানা মাটিতে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। দড়ির অপর প্রান্ত বেঁধে রাখা হয় ডুবন্ত কোনো গাছের ডালে। সারা রাতের পর টেনে তুললেই দেখা যাবে ওর মধ্যে আটকে রয়েছে বেশ কতকগুলি বোকা চিংড়ি মাছ।

বর্ষাকালে মাছ ধরবার আরও একটা পন্থা আছে। শক্ত সুতোয় বাঁধা একটি বড় সাইজের বড়শিতে একটি জ্যান্ত ছোট পুঁটিমাছ গেঁথে দেয়া হয়। চড়কে যেমন পিঠ কোঁড়া হতো বলে শুনেছি, তেমনি ভাবে মাছটিকে আটকে সুতোর অপর প্রান্ত একটি ডুবন্ত গাছের নরম ডালের সঙ্গে এমনিভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে মাছটা ঠিক জলের ওপর দিয়ে ছড় ছড় করে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করতে পারে। ওর শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে বড় বড় শোল মাছ। কপ্ করে আধারটা গিলে ফেললেই বড়শিতে আটকে যায়। তারপর ছুটোছুটি করেও মুক্তি পায় না, কারণ নরম গাছের ডাল নুয়ে পড়ে পড়ে হুইলের ছিপের নরম অগ্রভাগের কাজ করে।

আশ্বিনের শেষাশেষি বর্ষার জলে টান ধরলে প্রচুর মাছ দেখা দেয়। বেড়াজাল, ধর্মজাল, খেপজাল, ওচা, চেই, বড়শি, পলো প্রভৃতি নানাজাতীয় যন্ত্র দিয়ে মাছ ধরা হয়ে থাকে। বাজারে মাছ জলের দরে বিক্রয় হলেও মাছ ধরাটাই তখন নেশার মতো পেয়ে বসে। বাজার থেকে যত মাছই আসুক না কেন, নানাজাতীয় মাছের নানারকম ঝাল-ঝোল-চচ্চড়ি-ভাজা যতই রান্না করা

হোক্ না কেন, তথাপি নিজের হাতে ছিপে ধরা মাছগুলি যে কত বেশী সুস্বাদু লাগে, তা বিক্রমপুরবাসী সকলেই জানেন!

নদীর জল আবার নদীতে ফিরে গেলে খানা-ডোবা-পুষ্করিণী-খাল-বিল সব থাকে কানায় কানায় জলে ও জলজ-জঙ্গলে ভর্ত্তি। সেই জঙ্গলে জল পচে যায়, নানারকম অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। আমাদের কেয়টখালী গ্রামে একটিও বাঁধানো পুষ্করিণী নেই যাতে বর্ষার জল প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, এই সময় পানীয় জলের খুব কষ্ট। কিন্তু সে বেশী দিন নয়। জলজ-জঙ্গল সব তুলে ফেলে দিলে রোদ ও হাওয়ার সংস্পর্শে জল আবার ভালো হয়ে ওঠে।……

আরও দশখানা গণ্ডগ্রামের মতো আমাদের কেয়টখালী গ্রামেও জাতিভেদ বা বর্ণভেদ বা সামাজিক ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। এই অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলিয়ে যে কিশোর দল খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অখ্যাতি অর্জ্জন করেছে, আমিও তাদের একজন।

বাবা কিন্তু ভেদাভেদ ততটা মানতেন না। চিরকাল বিদেশে চাকরি করেছেন। সেখানে গ্রাম্য দলাদলি কোথায়? খাওয়া-পরার বাছবিচারও নেই তেমন। অবসর গ্রহণের পর গ্রামে এসে বিদেশের মেজাজটা একেবারে পুরোপুরি বজায় রাখা সম্ভব না হলেও আমাদের অগ্রগতিমূলক কথায় বা কাজে সর্ব্বদাই পরোক্ষ সমর্থন ছিল তাঁর। আর তাঁর কোনো রুলিং, তা সে যতই বৈপ্লবিক হোক্ না কেন, অগ্রাহ্য করা কোনো গ্রাম্য দেবতার পক্ষেই সহজসাধ্য ছিল না।

একবারের একটি ঘটনা মনে পড়ে।

নওগাঁয়ের নামজাদা মোক্তার রমেশ কাকা তাঁর অগ্রজ হেমকাকা সহ সেবার দেশের বাড়ীতে এলেন অন্যতম কন্যা রাণীর বিয়ে দেবেন বলে। রমেশ কাকা বাবার মামাতো ভাই, আমাদের বাড়ীর পাশেই চক্রবর্ত্তী পাড়ায় তাঁর দোতলা টিনের ঘর। সবাই সারা বছর নওগাঁতেই থাকেন, শুধু পূজোর সময় একবার এসে মাসখানেক থেকে যান। বাড়ীতে থাকেন তাঁর বৃদ্ধা মাতা ও প্রৌঢ়া ভগ্নী। অনায়াসে নওগাঁতেই রাণীর বিয়ে দিতে পারতেন এবং সেটাই বোধহয় শোভন হতো। কিন্তু না, অন্য মেয়ের বেলা যা-ই করে থাকুন, বাপ পিতামহের ভিটেতে

এসে বিয়ে দেয়াই এবার যুক্তিযুক্ত মনে হলো। বিশেষ করে বৃদ্ধা মাতার পক্ষে অতদূরে যাওয়া আর সম্ভব নয় এবং পাত্রপক্ষের বাড়ীও আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে।

এসেই রমেশ কাকা ঘোষণা করলেন যে, রাণীর বিয়েটা তিনি একটু ঘটা করেই দিতে চান। বরযাত্রী আসবার কথা পঁচাত্তর জন, মানে, একশো জনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কেয়টখালী গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত প্রত্যেকটি পরিবারের স্ত্রী ও পুরুষ সবাইকে খাওয়ানো হবে। শহরের মতো নয়, গ্রামদেশে খাওয়ানো হয়ে থাকে বিয়ের রাতে নয়, পরদিন বাসি বিয়ের দিন দ্বিপ্রহরে। এত বৃহৎ ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক কর্ম্মী দরকার আর রমেশ কাকা জানতেন যে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে নিয়োগ করতে হলে তাদের নেতাকে দরকার, স্বীকার করলাম, সানন্দে সাহায্য করবো।

বিবাহের দিন চারেক পূর্ব্বে বিকেলের দিকে দেবেন কাকা বললেন: বরযাত্রীদের বসবার ও রাত্রে শোবার জায়গা তো ঠিক হয়ে গেছে, এবার চল্ যাই পুব পাড়ায় নেমন্তন্নটা সেরে আসি।

সঙ্গে চললাম।

মাখন মুদি ও মিস্ত্রির বাড়ী ডাইনে রেখে, বোসেদের বাড়ী ছাড়িয়ে বারুই পাড়া, নাপিত পাড়া ও ভুঁইমালী পাড়ার মধ্য দিয়ে আমরা মাঠে বেরিয়ে এলাম। মজুমদার বাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতেই ডাইনে দেখা গেল পাথুরিয়া বাড়ী। তারা ব্রাহ্মণ। বললাম: কাকা, চলুন, ওঁদের বাড়ীটা সেরে আসি।

কাকা বললেন: আগে চল্ পুব পাড়ায় যাই।

আপত্তি করবার কিছু নেই। এই পথেই তো ফিরে আসবো।

মজুমদার বাড়ীর শরিকদের ও তাঁদের আশেপাশের কয়েকঘর ব্যানার্জ্জী ও চক্রবর্ত্তীদের নেমন্তন্ন সেরে আমরা এলাম যদু ব্যানার্জ্জীর বাড়ী। যদু ব্যানার্জ্জী ছোটকোনের অর্থাৎ বিপদভঞ্জনের বাবা। নেমন্তন্ন করা হয়ে গেল। সংবাদ নিয়ে জানা গেল ছোটকোন ব্যানার্জ্জী পাড়ায় গেছে খেলতে।

কাকা বললেন: চল্, অনাথদের বাড়ী সেরে এসে উমাচরণ বাঁড়ুয্যের বাড়ী যাই।

অনাথদের বাড়ীর দক্ষিণের পুকুরের পাড় দিয়ে ঘুরে পুব দিকে এগিয়ে

যেতেই দেখা গেল একদল ছেলে কামিনী ব্যানার্জ্জীর বাড়ীর পাশের মাঠে দারিয়াবান্ধা খেলছে। তারা সবাই আমারই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছেলে। ছোটকোনও রয়েছে। আমায় দেখতে পেয়ে সবাই কলরব করে উঠলো। নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি একথা উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে দিতেই দেবেন কাকা চুপি চুপি বললেন : দেখিস্, কামিনী বাঁড়ুয্যের ছেলেদের আর কেরাণী বাড়ীর ছেলেদের আবার নেমন্তন্ন করে বসিস্ না যেন।

জিজ্ঞেস করলাম : কেন, সব বামুনকেই তো বলতে বলে দিয়েছেন রমেশ কাকা—

সবাইকেই, শুধু ওরা বাদে।

মানে? থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ওরা সমাজে বদ্ধ। কাকা বললেন : সমাজে ওদের স্থান নেই। সমাজে মানে, ব্রাহ্মণ সমাজে—

কারণ? চট্ করে মাথায় এক ঝলক রক্ত উঠলো।

চুপ করিয়ে দেবার জন্যই কাকা বললেন : সে অনেক কথা। তা এখন বলবার সময় নেই আর তুই বুঝতেও পারবি না। ওদের তোর ভলান্টিয়ার দলে নিয়েছিস নাকি? তাহলে এখনই নাম কেটে দে। ওরা পরিবেশনে গেলে ব্রাহ্মণেরা কিন্তু খাবেন না। মহা কেলেঙ্কারি হবে।—চল্, যাই।

একটি পা-ও অগ্রসর হলাম না। জিজ্ঞেস করলাম : ওরাও তো ব্রাহ্মণ, ওরা দিলে ব্রাহ্মণরা খাবেন না কেন?

আবার সেই কেন? কাকা রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করলেন : তোরা আজকালকার ছোকরারা সামাজিক রীতি-নীতি কিছু বুঝিসনে, বুঝতে চেষ্টাও করিসনে, কারণ বোঝা সহজ নয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশন করলেও অন্যান্য ব্রাহ্মণ খাবেন না, খেতে পারেন না—যাকগে, তুই যাবি, না আমি একাই যাবো ওদিকটাতে?

একাই যান। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম : তবে নেমন্তন্ন করতে আমায় নিয়ে বেরিয়ে ভালো করেননি কাকা। আমার দলের ছেলেদের মধ্যে বড় বামুন, ছোট বামুন তো দূরের কথা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বলেই কোনো ভেদাভেদ নেই। আপনি রমেশ কাকাকে জানিয়ে দেবেন যে, আমার ভলান্টিয়ারদের মধ্যে একজনও কাজে যাবে না।

বলেই আর অপেক্ষা করলাম না। দারিয়াবান্ধা খেলায় গিয়ে যোগদান করলাম।

সন্ধ্যের পর বাড়ীতে ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করলেন: কি বলেছিস রে তোর দেবেন কাকাকে?

বুঝলাম গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। বললাম: বলে দিয়েছি রাণীর বিয়েতে আমরা কাজ করতে পারবো না। কেন, কি এসে বলেছেন কাকা?

মা বললেন: তুই নাকি বলেছিস সমাজে যারা স্থান পায় না সেই সব ব্রাহ্মণকেও নেমন্তন্ন করতে হবে?

বলেছি। দৃঢ়স্বরে জবাব দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা, তুমিই বল তো মা, আমরাও ব্রাহ্মণ, ওরাও ব্রাহ্মণ, তাহলে ওদের হাতে আমরা খেতে পারবো না কেন? ওরা সমাজচ্যুত কেন?

বাবার সঙ্গে মা-ও তো চিরকাল শহরে শহরেই কাটিয়েছেন, বললেন হেসে: ও বাবা, ঐ 'কেন'টা আমিই ভালো বুঝতে পারি না, তুই পারবি কোত্থেকে?—যাকগে, যাও, ওপরে যাও, পাড়ার কাকারা সব এসেছেন তোমার নামে নালিশ করতে।

সোজা ওপরে বাবার ঘরে গেলাম। দেখলাম হেম কাকা, রমেশ কাকা ও দেবেন কাকা বসে আছেন। আমি প্রবেশ করতেই বাবা বললেন: কি রে, তোর ভলান্টিয়াররা নাকি কাজ করবে না?

চুপ করে রইলাম। বাবা বলতে লাগলেন: তাহলে তো বড় মুশকিলে পড়বে রমেশ। এতগুলো বরযাত্রী, তারপর এত লোক খাবে—এ তো ম্যানেজ করাই যাবে না।

হেম কাকা বললেন: অসম্ভব, কিছুতেই পারা যাবে না।

রমেশ কাকা নামজাদা মোক্তার, তাই প্রশ্ন করলেন: কারণটা কি?

দেবেন কাকার কাছে কারণ নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে সবার। তবুও বাবার সামনে সে কথাটা বলতে পারি কিনা, সেটাই পরখ করতে চাইলেন রমেশ কাকা। তারপর দেবেন কাকার রিপোর্টের সত্যতাও একবার যাচাই হয়ে যাবে।

ওসব মোক্তারী জেরাকে পরোয়া করবো কেন? বললাম: আপনি বলেছেন গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণকে খাওয়াবেন। তবে কিছু ব্রাহ্মণকে বাদ দিলেন কেন?

সমস্ত ব্রাহ্মণ মানে আমি তাঁদের মনে করেছি যাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। রমেশ কাকা জবাব দিলেন।

কিন্তু আমার পক্ষে মুশকিল কাকা, আমি বলতে লাগলাম: আমার ভলান্টিয়ার দলে বামন-কায়স্থ বলেই কিছু নেই, তার আবার সমাজের বামন ও সমাজচ্যুত বামন। দেবেন কাকা যাঁদের নেমন্তন্ন করলেন না, তাঁদের বাড়ীর ছেলেরাও আমার দলে আছে। আপনি কিছু বামনকে বাদ দিলেও ছেলেদের একজনকেও আমি একথা বলে বাদ দিতে পারবো না যে, তোমরা সমাজচ্যুত। কাজেকাজেই সবাইকে নিয়ে সরে থাকাই ভালো।

দেবেন কাকা বললেন: কিন্তু ওরা বহুকাল ধরে সমাজচ্যুত হয়ে আছে। অপরাধ নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু করেছিল এবং সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করেনি। তাই—

কি গুরুতর অপরাধ, বলুন না কাকা। ঔৎসুক্য আর চেপে রাখতে পারছিলাম না।

আদালতের হাকিম যে গম্ভীরস্বরে যেভাবে চার্জ্জসীট পাঠ করে আসামীকে শুনিয়ে দিয়ে থাকেন, কতকটা তেমনি সিরিয়াস হয়েই বলতে লাগলেন দেবেন কাকা: এই তো পাথুরিয়া বাড়ী। ও বাড়ীর কিরণ বাঁড়ুয্যে এক চাঁড়ালের বাড়ীতে একটি দিন বা একটি হপ্তা নয়, পুরো এক মাস গীতা পাঠ করেছিল। আর শুধু কি পাঠ, সেই চাঁড়ালের হাতে বাতাসা ও জল খেয়েছে। তারপর কামিনী বাঁড়ুয্যে। শুনেছি, মামলা করতে মুন্সীগঞ্জ গিয়ে সে কোন্ উড়ে বামুনের হোটেলে খায়। উড়ে বামুন মানে, এখানে এসে গলায় সুতো ঝুলিয়ে বামন সেজেছে। আর কেরাণী বাড়ী। জানিস, সত্যচরণ কেরাণী তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কুলে খাটো একটি ছেলের সঙ্গে। সে আবার বিলেত-ফেরত। অথচ প্রায়শ্চিত্ত করেনি। এই সব অনাচারী ব্রাহ্মণ—

বাবাই এবার বাধা দিলেন: অনাচারী কি করে হলো এটা অবশ্য আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কি হে হেম, রমেশ, তোমরা কি বল?

অন্তরে অন্তরে যে তাঁরাও এটা ঠিক বুঝতে পারছেন না, বেশ বোঝা গেল। কারণ তাঁরা হেসে ফেললেন। রমেশ কাকা বললেন: শহরে অবশ্য গ্রামের আইনকানুন চলে না। সেখানে কুলশীল-জাতিবর্ণ সব একাকার।

হেম কাকা কিন্তু তথাপি যুক্তি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন: শহরের কথা শহরে। এসেছি গ্রামে, দেশের বাড়ীতে। এখানে যা চলে, সেইভাবে

চলাই ঠিক। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা অঠিক, তা নিয়ে বিচার করতে বসলে অনেক হাঙ্গামা দেখা দেবে। আর মাত্র চার দিন বাকি। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর না হয় এসব নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা যাবে।

প্রস্তাবটা বোধহয় সবারই মনঃপূত হলো। রমেশ কাকা বললেন : হ্যাঁ, তাই ভালো।

দেবেন কাকা বললেন : আমিও তো তাই বলি। বিয়ের মধ্যে আর ওসব নিয়ে গণ্ডগোল করবার দরকার নেই। পরে দেখা যাবে।

বাবা বললেন : সে কথা মন্দ নয়।

আমি কিন্তু নাছোরবান্দা। বিয়ের পর বিচার-বিবেচনার এই গাল-ভরা প্রতিশ্রুতি যে কারুরই আর মনে পড়বে না, তা জানি। ক'দিন পর চলে যাবেন হেম কাকা, রমেশ কাকা আর সমস্যা যা আছে, তাই থেকে যাবে। এই মুহূর্তে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, সুবর্ণ সুযোগ, যা কাজে লাগাতে পারলে বহুকালের গ্রাম্য জাতিভেদ ও কুসংস্কার এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া যাবে। এমনি যুক্তিহীন অভিযোগের কি কোনো মূল্য আছে? গীতায় কি শুধু ব্রাহ্মণেরই অধিকার? সেই গীতা শোনবার অধিকার কি চাঁড়ালের নেই? ব্রাহ্মণের মুখেও কি সে গীতা শুনতে পাবে না। আর পাঠান্তে বাতাসা ও জল খেলেই ব্রাহ্মণ মহা অন্যায় করে বসবে? এমন অন্যায় যে তাকে আর ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পাতাই পাততে দেয়া যাবে না?……

মুন্সীগঞ্জে হোটেলের উড়ে বামুন সত্যিকার বামুন কিনা, কে তা অনুসন্ধান করে দেখেছে? এমনি বিদেশে গেলে দুনিয়ার লোক হোটেলে খায় ও প্রয়োজন হলে রাত্রেও থাকে। সেই হোটেলের বামুনঠাকুর সত্যিকার বামুন কিনা, তা কি কেউ জানতে পারে, না জানবার সুযোগ আছে?

তারপর সত্যচরণ কাকা। বি এ পাশ করা তাঁর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন তিনি বিলেতী ডিগ্রিধারী একজন ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারের ঠাকুরদার বাবা নাকি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন নিজে নৈকষ্য কুলীন হয়ে এক অ-কুলীন অর্থাৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে। ঠাকুরদার বাবা এতে কি অপরাধ করেছিলেন বুঝলাম না। তারপর তাঁর যদি অপরাধই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কি পুরুষানুক্রমে চলে আসবে? আর বিলেত গিয়ে উচ্চতর অধ্যয়ন কি গর্হিত কাজ যে, সেজন্য গোবর খেয়ে ও নাকে খত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?

এমনি অন্যায় আবদার যে সমাজ করে থাকে. বুঝতে হবে সে সমাজের বনিয়াদে ফাটল ধরেছে, অচিরেই ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে পড়বে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সমস্ত যুক্তি সমর্থন করলেন বাবা। ব্যস্, আর পায় কে আমায়? ছেলেদের নিয়ে আমি সরে রইলাম।

কিন্তু ভলান্টিয়ার ব্যতীত চলবে কি করে? তাই চললো আরও সলাপরামর্শ, কাকাদের ঘন ঘন জরুরী বৈঠক, বার বার বাবার উপদেশ গ্রহণ, বার বার আমায় অনুরোধ, বার বার সেই উদাত্ত প্রতিশ্রুতি, কাজটা তুলে দাও, তারপরই বসবো আমরা।

অবশেষে বিবাহের দিন অপরাহ্নে গ্রাম্য দেবতারা পরাজয় স্বীকার করলেন। বরযাত্রীদের আসবার সময় হয়ে এসেছে, আর কি মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা যায়?……হুড়হুড় করে মুহূর্ত্তের সঙ্কেতে এসে পড়লো আমার স্বেচ্ছাবাহিনী।

নির্ব্বিঘ্নে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হলো।

পরদিন ভোরেই তথাকথিত সমাজচ্যুতদের নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে যাবো, এমন সময় বাবা ডাকলেন। বললেন: শোন্, সবাইকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবি যে, সমাজের যে বাজে গোলমাল ছিল, তা দূর করবার জন্যই আবার নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছিস তোরা।

মা এগিয়ে এসে বললেন: কিন্তু এই বেলা ন'টার সময় নেমন্তন্ন করে দুপুরেই খাবার কথা বলাটা কেমন যেন ভদ্রতাসূচক মনে হচ্ছে না। নেমন্তন্ন অন্ততঃ একদিন আগে না করলে বোধহয়—

কথাটা সত্যি। বাবা বললেন: সত্যিই সেটা ভালো দেখাবে না। কারুর হয়তো এতক্ষণে রান্নাই চড়ে গেছে। তার চাইতে এক কাজ করিস— বলে বাবা মুহূর্ত্ত কি ভাবলেন, তারপর বললেন: ওদের সবাইকে বরং বিকেলে, মানে সন্ধ্যায় খেতে বলিস। আমি রমেশকে বলে দোব'খন।

হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েক পা যেতেই বাবা আবার ডাকলেন। ফিরে এলাম। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন: সত্যচরণকে আমার কথা বলিস। বলিস, সে যেন সবাইকে ডেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আমি নিজে ওদের সঙ্গে বসে খাবো।

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম: আমরা কেউ দুপুরে খাবো না বাবা। সমাজচ্যুতরা যখন সন্ধ্যায় এসে খেতে বসবেন, আমরাও তখন বসবো সবাই একসঙ্গে।

বাবা হাসলেন মৃদু, বললেন: আমিও দুপুরে খাবো না, তোদের সঙ্গেই বসবো।……

এমনি করে গ্রাম্য দলাদলি ও জাতিভেদের বর্ণভেদের শ্রেণীভেদের মিশরীয় মমিটাকে একদিনের প্রচেষ্টাতেই যেন আর-একবার আমরা কবরস্থ করে ফেললাম।

দুই হাতে সবাই আশীর্ব্বাদ করলেন।

কিন্তু তাই বলে কি দলাদলি আর কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না? জানি, উঠবে। আবার কেয়টখালী গ্রামে দেখা দেবে এমনি হীন ভেদাভেদ, এমনি নীচ মনোবৃত্তি, আবার অভ্যুত্থান ঘটবে গ্রাম্য দেবতাদের!……

তথাপি, এই ক্ষুদ্র নগণ্য কেয়টখালীই আমার কাছে প্রিয়ের চাইতেও প্রিয়, সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও এই গ্রাম থেকে বিচ্যুত হতে চাই না, আমার শিরা উপশিরায়, অস্থিমজ্জায় প্রতি রক্তকণিকার সঙ্গে মিশে রয়েছে আমার সেই অখ্যাত গ্রামখানি।

কোহিনুরের চাইতেও যা মূল্যবান!

স্বর্গের চাইতেও যা বড়!……

ধীরে ধীরে চোখ বুঁজে এসেছিল, এমন সময় হরিমতীর ডাকে চমক ভাঙলো।

দাদাবাবু, খাবার দিয়েছি।

রান্নাঘরে বসবার যথেষ্ট জায়গা থাকলেও হরিমতী এ ঘরের মেঝেতেই আমার আসন পাততো। ও ঘরের কালিঝুলির মধ্যে নাকি আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মাটির মেঝে পরিপাটি করে নিকিয়ে নিয়ে আসন পেতে দিয়েছে। খাবার জলের গ্লাসটি একখানা রেকাবি দিয়ে ঢাকা, তার ওপর নুন, লেবু ও কাঁচা লঙ্কা। থালার মাঝখানে ভাত, সযত্নে একেবারে নিখুঁত এভারেস্ট তৈরী করা হয়েছে। আশেপাশে কয়েক রকমের ব্যঞ্জন। আমি বসতেই হরিমতী পাখা-খানা হাতে তুলে নিল।

বললাম: হাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু সে শুনলো না। একটু পর বললো বেশ মিষ্টি করে: বাড়ীতে থাকলে মা হয়তো এমনি করে বসে বসে খাওয়াতেন।

চুপ করে রইলাম। কথাটা মিথ্যে নয়। আমার খাবার সময় যেখানেই যে কাজেই থাকুন না কেন, মা ছুটে আসতেনই।···একটু পরে হরিমতী বোধহয় আমার নীরবতায় সাহস সঞ্চয় করে মুচকি হেসে পাখা নাড়তে নাড়তে বললো: আর বিয়ের পর হলে বৌদি এমনি করে—

বাধা দিলাম: যাও, তুমি খেয়ে নাও, রাত দশটা বেজে গেছে। বাড়ী যাবে না?

পাখা রেখে উঠলো হরিমতী, বললো: না বাবু। দারোগাবাবু নেই, মা ঠাকরুণের একা ভয় করে। সেখানে আজ থাকতে হবে।

হরিমতী বেরিয়ে গেল। মনে পড়লো অবিনাশবাবুর কথা, সোল এজেন্সী নিয়েছে হরিমতী!······

আহার শেষ করে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, হরিমতী যায়নি. জলের ঘটি নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি তোয়ালে হাতে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। মুখ মুছে ঘরে এসে দেখি ভাজা মশলার ডিবে নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সারা শয্যায় ছড়ানো অজস্র বেলফুল ও রজনীগন্ধা!······

খাওয়াদাওয়া সেরে বাসনকোসন মেজে কখন যে সে রান্নাঘরে তালা বন্ধ করে ফেলেছে, টেরও পাইনি। চুপ করে চোখ বুজেই শুয়েছিলাম। কতক্ষণ ছিলাম জানিনে। অকস্মাৎ মনে হলো কে যেন আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। টেবিলের ওপর স্তিমিত-করা আলোকেও বুঝতে দেরী হলো না যে সে আর কেউ নয়, হরিমতী।

ধমক দিলাম: কী চাও?

সে কিন্তু এতটুকুও ভয় পেলো না, বললো: না, দেখছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। মশারিটা ফেলে দোব?

না, আমিই নোব'খন ফেলে, তুমি যাও।

চলে যাবার সময় সে বার বার করে সাবধান করে দিয়ে গেল, মশারি শুধু ফেললেই চলবে না, ভালো করে গুঁজে নিতে হবে। কারণ এখানে সাপের উপদ্রব নাকি ভয়ানক বেশী। ফুলের গন্ধে খাটের পা বেয়ে বিছানায় উঠে পড়াও বিচিত্র নয়। আমার মাথার দিব্যি রইলো, দাদাবাবু!—বলে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু আমার জন্য হরিমতীর আদর ও যত্ন, চিন্তা ও ভাবনা এবং অবশেষে মাথার দিব্যি দিয়ে যাওয়া—একটু বেশী মনে হয় না কি? কোনো প্রভুর জন্যই কি কোনো ভৃত্য এতখানি ভেবে থাকে, না এতখানি করে থাকে? পাঁচ টাকার বিনিময়ে এ যে পাঁচশো টাকার সওদা! সুধীরের টিপ্পনী মনে পড়লো, অবশেষে ডেটিনিউ বাবুকেও না গেঁথে ফেলে বঁড়শিতে!...ঘিন ঘিন করে উঠলো সারা শরীর! তখনই স্থির করে ফেললাম, কালই বিদায় করে দোব বেটীকে। রান্না করবো নিজের হাতেই, নইলে মুড়ি খেয়ে থাকবো। কিন্তু দরজায় খিল আঁটতে গিয়ে দেখি, পাশে দাঁড়িয়ে হরিমতী!

সত্যিই রেগে গেলাম: আবার তুমি! কী চাও? এই না চলে গেলে দারোগাবাবুর বাড়ীতে?

সীমাহীন বিনয় প্রকাশ করে জবাব দিল সে: হ্যাঁ বাবু, গিয়েছিলাম। আবার ফিরে আসতে হলো। মা ঠাকরুণ আপনাকে একবার যেতে বলেছেন এখনই।

চমকে উঠলাম: এ্যাঁ, বল কি? মা ঠাকরুণ, মানে ক্ষীরোদবাবুর স্ত্রী? দূর, আমায় ডাকবেন কেন? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই। তারপর আজ নেই দারোগাবাবু। আর এখন রাত এগারোটা পার হয়ে গেছে। —যাও এখন।

হরিমতী তবু বললো: কিন্তু তিনি যে বললেন খুব বিশেষ দরকার। একবার চলুন না দাদাবাবু!

কেন?

তা তো কিছুই বলে দেননি। শুধু বলে দিয়েছেন, বলিস, খুব জরুরী।

জরুরী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলে হরিমতী আর অপেক্ষা না করে ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ওপর ছিল বড় তালাটা আর বালিশের তলায় চাবি। নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজায় তালা লাগাবে।

গুলিয়ে গেল মাথাটা। রাত দুপুরে অপরিচিতা মহিলার জরুরী আহ্বান? কেন? কী প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে আমার সঙ্গে? দারোগার অনুপস্থিতিতে সে বাড়ীতে যাওয়া বিসদৃশ নয় কি? ঔৎসুক্য জেগেছে আমার মনে, কিন্তু সঙ্কোচেরও কমতি নেই, এমন সময় হরিমতী আমার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে বললো: চলুন।

এক পা এক পা করে তাকে অনুসরণ করতে হলো। অবিনাশের শয়নকক্ষের জানালায় দৃষ্টিক্ষেপ করলাম, অন্ধকার। ইনসপেকশন বাংলোও অন্ধকার, তালা বন্ধ। ক্ষুদ্র মাঠ অতিক্রম করে এসে এ বাড়ীর দরজায় পৌঁছোলাম। হরিমতী আবার বললো : আসুন, দাদাবাবু!

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একেবারে ক্ষীরোদ দারোগার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করলাম কতকটা সম্মোহিতের মতো! অকস্মাৎ চমক ভাঙলো, যখন দেখলাম উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুন্দরী যুবতী মাথা নুইয়ে আমায় প্রণাম করছেন! পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে তিনি বলে উঠলেন : আসুন দাদা, বসুন!

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো!

দাদা!······

বারো

সত্যি, দাদা সম্বোধন করেই শুরু করলেন ক্ষীরোদ দারোগার স্ত্রী। বলতে লাগলেন তাঁর পারিবারিক ইতিহাস···বৃদ্ধ পিতা বাতব্যাধিগ্রস্ত হলেও যশোহরে কোন্ গ্রাম্য মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে আজও ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে হেডমাস্টারী চালিয়ে যাচ্ছেন। করুণাপরবশ হয়ে নয়, স্কুল কমিটি অপরিহার্য্য বিবেচনা করেই এই বৃদ্ধকে কিছুতেই বিদায় দেবার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। কারণ এঁর পরিত্যক্ত আসনে বসবার মতো যোগ্য ব্যক্তি আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবার। উপচে পড়ে না, চলে যায়। দিদির বিয়েতে ক্ষীরোদ-বাবু আসেন অন্যতম বরযাত্রী হয়ে। চা ও জলখাবার পরিবেশনের ভার পড়ে বোনের ওপর। ক্ষীরোদবাবু এঁকে পছন্দ করে বসেন। বৃদ্ধ বাতব্যাধিগ্রস্ত অসহায় শিক্ষক আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। দিদির বিয়ের আলপনা শুকোতে না-শুকোতেই সাত দিনের মধ্যেই বোনের বিয়ের শাঁখ বেজে উঠলো। ক্ষীরোদবাবু তখন মাত্র এল সি।

পিতৃকুলের পরিচয় দেবার পর এবার মহিলাটি শুরু করলেন স্বামীর ইতিবৃত্ত। বাধা দিতে গেলাম, কারণ এতে আমার লাভ-লোকসান কিছুই নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। পারিবারিক কূটনৈতিক ক্লেদাক্ত পরিবেশের অনেক ঊর্দ্ধে বিচরণ করি আমরা। কাদায় বাস করি, কিন্তু গায়ে কাদা লাগে না! কিন্তু কোনো বাধা মানলেন না তিনি। বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন : আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার দাদার মতো। হরিমতীর কাছে শুনেছি দাদার মতোই আপনি সাদা ফুল খুব ভালবাসেন। তাই দাদা বলেই ডেকেছি আপনাকে। হয়তো সেটা হয়েছে আমার স্পর্দ্ধা, আপনাদের মতো দেশের সুসন্তানের বোন হবার যোগ্য আমি নই।

মহিলাটির কণ্ঠ ভেঙ্গে পড়লো। বললাম : না, না, ও কি বলছেন আপনি? আপনার যোগ্যতা আপনি কেন বিচার করবেন? সে ভার থাক্ আমার ওপর। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো?

একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।—বলে তিনি হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়। হরিমতী আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি না। বোধ-হয় তার খোঁজেই গেলেন। কিন্তু ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল! বাড়ীর কর্তার

অনুপস্থিতিতে গভীর রাত্রে তাঁর নিভৃত কক্ষে তাঁর যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যতই বেদ বা উপনিষদ আলোচনা হোক্ না কেন, কখনও কেউ এর ভালো অর্থ করবে না। ক্ষীরোদ দারোগার কানে যাবেই সোল এজেন্ট হরিমতী মারফত, তারপর কে জানে ব্যাটা আমার নামে বিশ্রী একটা বদনাম দিয়ে ডায়েরী করেই ফেলবে কি না—

উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ফিরে এলেন ক্ষীরোদগৃহিণী। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন: দেখে এলাম হরিমতী ঘুমিয়েছে কি না। ঘুমিয়েছে।—দাদা, এই মেয়েলোকটাই নষ্ট করলো আমার স্বামীকে। মফস্বলে গিয়ে যা করেন, তা তো আর চোখে দেখতে হয় না। কিন্তু ফিরে এলেও প্রায়ই এই বেটী তাঁকে নিয়ে যায় গভীর রাত্রে সাঁওতাল পাড়ায়।

প্রশ্ন করলাম: কখন?

রাত্রে। আপনার ওখানকার কাজ সেরে আপনি মনে করেন হরিমতী বুঝি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তার বাড়ীতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়ী যায় না। এখানে চলে আসে। আমি জেগে থাকলে বেশী কথা হয় না। একটা কাজের অছিলা দেখিয়ে 'অফিসে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসবো' বলে দু'জনে বেরিয়ে যান। আর আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। নিঃশব্দে দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে চলে যান। রাত শেষ হবার পূর্ব্বক্ষণে যখন ফিরে আসেন, তখন ঘুমিয়ে থাকলেও আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁর মুখের বিশ্রী গন্ধে আর জড়ানো ভাষায় অশ্লীল গালি-গালাজে। দাদা, দেশের ও দশের উপকার করবার ব্রতই আপনারা গ্রহণ করেছেন জানি। আমার মতো নগণ্য বোনের একটা উপকার করবেন?

মহিলাটির কণ্ঠে অশ্রুসজল আবেগ। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারা কঠিন, নির্দ্দয়তা মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম: কী উপকার বলুন তো?

তিনি বললেন: আপনি একটু জোর দিয়ে ওঁকে বলবেন এই সব নোংরা স্বভাব ছাড়বার জন্য? আপনাকে ভয় করেন উনি।

ভয়!—জিজ্ঞেস করলাম: ভয় করবেন কেন?

এবার হেসে ফেললেন মহিলাটি: উনি বলেন আপনারা নাকি কথায় কথায় রিভলভার চালান। শুধু উনি কেন, স্বয়ং গভর্নমেন্টও আপনাদের ভয় করে আর সেই জন্যই ধরে রেখেছে তারা।

হেসে বললাম : মিথ্যে বদনাম। এতে কান দেবেন না আপনি। আমার রিভলভার থাকলেও চুরি-করা রিভলভার, লুকোনো থাকে আর দারোগাবাবুর রিভলভার শোভা পায় তাঁর বেল্ট-এ। তারপর দুটো রাইফেল আছে থানায়।—সে কথা যাক্। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুকে আমি কি ভাবে বলবো?

যেভাবে বললে কুপথ উনি ছেড়ে দেন, কুখাদ্য ছেড়ে দেন। আপনাকে বেশী আর কী বলবো? আপনি আমার দাদার মতো, দুঃখিনী বোনের জীবনটা যদি বাঁচিয়ে দিতে পারেন……

একটু পরে চলে এলাম নিজের ঘরে। ভারী লাগছিলো মন!…মশারির মধ্যে এসে গেছে চাঁদের আলো। বালিশের পাশেই অজস্র রজনীগন্ধা আর বেলফুল। সত্যিই, সাদা ফুল ভারী ভালবাসি আমি। হরিমতী ছড়িয়ে রেখে গেছে। ক্লিওপেট্রার রূপের দেয়ালী নিবে গেছে, কিন্তু মনের আগুন এখনো জ্বলছে গনগন করে। তাই শিকার দেখলেই সে আগুনের শিখা লকলক করে ওঠে। কিন্তু এ্যাসবেস্টসের সাক্ষাৎ বোধহয় পায়নি সে! এবার পেল।……বেটীকে কালই বিদায় করে দিতে হবে।

কিন্তু ঘুম এলো না সহজে। দুঃখিনী বোনের কথা বার বার মনে হতে লাগলো। জীবনে এঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, এখান থেকে চলে যাবার পর সারা জীবনে দ্বিতীয় বার হয়তো দেখা হবে না। কিন্তু কতখানি দুঃখ পেলে যে এমনি নিতান্ত অজানা ও অনাত্মীয় লোককেই এঁরা পরম সুহৃদ বলে মনে করেন এবং তার কাছেই ব্যর্থ জীবনের অশ্রুসজল ইতিহাস নিবেদন করে সকাতর সাহায্য প্রার্থনা করে বসেন, মর্ম্ম দিয়ে তা অনুভব করতে লাগলাম। হয়তো এঁর জীবনের শেষ আশার প্রদীপটুকুও নিবে গেছে মাতাল ও দুশ্চরিত্র স্বামীর নির্দ্দয় অত্যাচারে। নীরবে সইতে হচ্ছে অবমাননার কশাঘাত। তাই মজ্জমানের মতো তৃণখণ্ডকেই ঝাপটে ধরতে চেষ্টা করছেন বাঁচবার আশায়। কিন্তু আমি জানি, কাঁচের বাসনের মতো ভেঙ্গে পড়বে এঁর সর্ব্বপ্রয়াস অপদার্থ স্বামীর উৎপীড়নে। কোনো পথ নেই রেহাই পাবার! ধুধু-করা দিগন্তপ্রসারী জীবন-মরুতে একটুখানি ওয়েসিসের সন্ধানে বাংলা দেশের এমনি কত দুঃখিনীই যে দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্ব্বহারা কত বোনই যে এমনি নিরুপায় ভাইয়ের পায়ের তলায় একটুখানি সান্ত্বনা খুঁজে মরছে, পারিবারিক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে এমনি কত দীর্ঘশ্বাস ও আকুতিই যে গুমরে গুমরে মরছে,

কে তার সংবাদ রাখে ! 'পতি পরমগুরু' এই হিটলারী অনুশাসনের যূপকাষ্ঠে কত নিরীহ নারীই যে নীরবে আত্মোৎসর্গ করছে, সমাজের কল্যাণকামীদের তা জানবার আগ্রহ কোথায় ?……

পরদিন ভোরেই হরিমতী এসে সতর্ক করে দিল আমায় পরম সুহৃদের মতো: বাবু, কাল রাতের খবর দারোগাবাবু যেন জানতে না পারেন। তাহলে মা ঠাকরুণের আর রক্ষে রাখবেন না। বড্ড বদ্‌রাগী লোক কিনা।

কথার জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। মনে মনে বললাম: কী আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী রে ! সতর্ক করে দিতে এসেছেন ! অথচ জানি সবার আগে এই বেটীই গিয়ে লাগিয়ে আসবে ওর মালিকের কানে।

শার্ট গায়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, বাধা দিল হরিমতী: সে কি, কোথায় যাচ্ছেন দাদাবাবু, আমি যে চায়ের জল চাপিয়ে এলাম। পরোটা আর হালুয়া করে দিই ?

গম্ভীরমুখে জবাব দিলাম: বিনোদবাবুর ওখানে চা খাবার নেমন্তন্ন আছে।

বিনোদবাবুর ওখানে স্টোভে চা তৈরী হলো, সঙ্গে তেলমুড়ি। এমনি নিশ্চিন্ত অবসর, তাতে চা, সুতরাং চায়ের বাটিতে ঝড় উঠবেই। গত রাতের উপন্যাস বিবৃত করলাম। বিনোদবাবুও বললেন হরিমতীকে তাড়িয়ে দিতে। স্টোভে ডিমের ডালনা আর ভাত তাঁর ওখানেই দু'বেলা বেশ চলে যেতে পারবে জানিয়ে দিলেন। একটা চাকরও মিলে যেতে পারে। অবিনাশবাবুকে জানাতে বললেন। আলোচনায় স্যানিটারী ইনসপেক্টার প্রেমতোষও এসে পড়লো। বিনোদবাবু অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ করে বললেন যে, ঐ ব্যাটাই দারোগার একমাত্র পরম নিষ্ঠাবান টিকটিকি। গাঁয়ের প্রত্যেকটি সংবাদ সম্রাট-সমীপে নিবেদন না করলে মোসাহেব ব্যাটার পেটের ভাত হজম হয় না ! বললেন: আপনাদের বলতেও ভয় করে দ্বিজেনবাবু, হয়তো বেচারাকে শেষ পর্য্যন্ত মেরেই বসবেন দু' ঘা।

ঘন্টাখানেক পর বাসায় ফিরে দেখি শোবার ঘরে শেকল তোলা, রান্নাঘরেও। রামভরসা বললো যে, এইমাত্র দারোগাবাবু এসেছেন, হরিমতী তাঁর বাসায় গেছে।……নিশ্চয়ই বেটী সব জানিয়ে দিতে গেছে ! এদিকে হরিমতী আর

ওদিকে প্রেমতোষ। ছুটিতে মিলে আমার কেশিয়াড়ীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি ?······সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না, আসরে নেমে পড়তে হলো। শোবার ঘরে ও রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার। উনুনের ওপর তখন ডাল ফুটছিলো। যাক্, পুড়ে যাক্।

বিকেল পাঁচটায় থানায় ফিরে এসে আর দেখতে পেলাম না হরিমতীকে। দারোগাও কিছুই জানেন না, এমনি ভাব দেখালেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম, সবই জানেন ক্ষীরোদবাবু, সবই বুঝেছেন। দেখলাম দারোগার মুখখানা বেশ গম্ভীর, বর্ষাকালের গুমোটের মতো। তবুও একটু পরখ করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম : কাল কদ্দূর গেছলেন ?

লিখতে লিখতেই জবাব দিলেন : তা প্রায় কণ্টাইয়ের কাছে।

ওখানে ডাকবাংলো আছে বুঝি ?

বললেন : আছে কন্টাই রোডে। কিন্তু আমি গেছলাম গাঁয়ের মধ্যে।

মহা ভাবনার কথা যেন, এমনি ভাব দেখিয়ে বলতে লাগলাম : তাহলে তো ভারী কষ্ট হয় আপনাদের। রাত্রে ঘুমোবার ভালো জায়গা না পেলে এমনি সারা মাস কী করে মফস্বল করে বেড়াবেন। তারপর শত হলেও বাঙালী তো, সারাদিন খাটুনির পর একটু ঝোল-ভাত না হলে কি করে চলে ? চৌকিদার আর দফাদার সে সব ব্যবস্থা কোত্থেকে করবে ?

চুপ করলাম, কিন্তু ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া এল না। ক্ষীরোদ দারোগার কলম চলতে লাগলো খচখচ করে। ভেতরে অবিনাশবাবুকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পেন্সিলটা কিন্তু থেমে গেছে। এদিকে চেয়ে আছেন।

ফোস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম : সত্যি, গ্রাম্য থানার দারোগা-বাবুদের মফস্বল ঘোরার কাজটা ভারী বিশ্রী ! কি বলেন ?

কিন্তু কিছুই বললেন না ক্ষীরোদ দারোগা। মুখ তুলেও একবারটি চেয়ে দেখলেন না। গতরাত্রির দুঃখিনী বোনের কথাটা মনে পড়ে গেল······আপনি একটু জোর দিয়ে ওঁকে বলবেন······কী হয় এখনই যদি বলে বসি ? কী করবে ও ? টেবিলের ওপর খাপে-আঁটা যে রিভলভারটা পড়ে রয়েছে, সেটা তুলে নেবে ? কিন্তু তার পূর্ব্বেই যে আমি ঘুষি মেরে ওর নাকটা থেঁতলে দোব ! নাকের রক্তধারা মুছতে যেতেই আমি তুলে নোব রিভলভারটা। প্রয়োজন হলে ট্রিগার চালাতেও বাধবে না।······রাগ হচ্ছিলো খুবই। সারা রাত বদমাশি

করে এসে কেমন এখন সাধু সেজে ডায়েরী লেখা হচ্ছে!······কিন্তু আবার মনে হলো, রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেলে আমার দুঃখিনী বোনের দুঃখ দূর করায় সাহায্য হবে কি?

তাই কথা পাড়লাম: হরিমতী আজ চলে গেছে দারোগাবাবু। দুপুরে বিনোদবাবুর স্টোভেই কাজটা সেরে নিয়েছি, কিন্তু রাত্রে কি করবো ভাবছি।

হরিমতীর প্রসঙ্গ উঠতেই মৌনতা ভঙ্গ করলেন দারোগা: আমি তো শুনলাম, হরিমতীকে আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন বদমাশ বলে। আপনার সঙ্গে কি বদমাশি করলো, তা অবশ্য আপনিই ভালো জানেন। কিন্তু চাকর-বাকর পাওয়া এখানে ভারী মুস্কিল!

বললাম: মফস্বলে তো প্রায়ই যান আপনি। একটা ধরে-টরে আনুন না। তবে হরিমতীর জায়গায় আবার কোনো শ্রীমতীকে এনে বসবেন না যেন, দেখবেন।—আচ্ছা, হরিমতী কী সব বলে গেছে আপনাকে? আমার নামে বুঝি খুব নিন্দে করে গেছে?

ক্ষীরোদ দারোগার কণ্ঠ একটু রুক্ষ শোনালো: তা করবে না? ঘরে তালাবন্ধ করে চলে গেলেন, অথচ ঐ বেচারী যে কি খাবে, তার ব্যবস্থা করে যাননি। আপনার না হয় বিনোদবাবু আছেন, ওর কে আছে?

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কেন, আপনিই তো আছেন ওর জীবন-যৌবনের সোল প্রোপ্রাইটর!—কিন্তু সামলে নিলাম, বিশেষ করে দেখলাম, অবিনাশবাবু দূর থেকে বার বার ইশারা করছেন চুপ করে যেতে।

ক্ষীরোদ দারোগা কিন্তু চুপ করে থাকলেন না। আমার মৌনতায় আশকারা পেয়ে বলতে লাগলেন: হরিমতীর মতো ভালো মেয়ে এই তল্লাটে নেই। আর আপনি কিনা তাকে বদমাশ বলেছেন। ডেটিনিউবাবুরাও যে সবাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সে কথা জোর করে বলতে পারেন কি? রাত বে-রাতে তারাই বা কি করে বেড়ায় কে জানে!

চট্ করে মাথায় খুন চেপে গেল, কিন্তু অপরিসীম চেষ্টায় টেনে নামিয়ে আনলাম ব্যারোমিটারের পারাটাকে দুঃখিনী বোনের কথা মনে করে। জোর দিয়ে বলতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি, রিভলভার দিয়ে গুলী করতে তো বলেননি।

ক্ষীরোদ এতে যেন আরও আশকারা পেয়ে গেলেন। এবার তাঁর কথাগুলো

যেন আস্পর্দ্ধা মনে হতে লাগলো : গভর্নমেণ্ট আপনাদের থানায় রেখেছেন আর আমাদের বলেছেন আপনাদের ওপর নজর রাখতে। কিন্তু আমি তো জানি, আমি না থাকলেই আপনি অনেক রাতে বাড়ী ফেরেন, সার্কাস দেখতে যান বা তাস খেলতে যান এবং সবাই ঘুমুলেও আপনার রাত্রির কাজ শেষ হয় না। কে যে কতখানি জিতেন্দ্রিয়, জানা আছে আমার ভালো করেই।

নাঃ, সহ্যেরও একটা সীমা আছে! ভালো করেই ব্যাটাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি দ্বিজেন গাঙ্গুলী, ক্ষীরোদের মতো কুকুরদের ফুসফুস ফুটো করে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করি না! ফস্ করে টেনে নিলাম ক্রসবেল্টসহ রিভলভার, খুলেই ফেলেছিলাম খাপটা, কিন্তু এমন সময় সিপাইদের ব্যারাক থেকে হল্লা করে বেরিয়ে এল একজন সিপাই। গেটের পাশে আতা গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটা বিরাটাকার হনুমান।—খেলো, খেলো, সবগুলো কাঁচা আতা শেষ করে ফেললো!

সিপাইয়ের চীৎকারে হনুমানজী কিন্তু এতটুকুও বিচলিত নন, একটার পর একটা আতা ছিঁড়ে দাঁতে কেটে ফেলে দিতে লাগলেন পরম তাচ্ছিল্যভরে।

আবহাওয়াটা মুহূর্ত্তে যেন একেবারে জল হয়ে গেল। ক্ষীরোদ দারোগা জিজ্ঞেস করলেন হেসে : কি, হনুমানটাকে মারবেন নাকি?

আমার হাতে তখন খোলা রিভলভার! হেসে জবাব দিলাম : আমার রিভলভারের নিশানা কিন্তু অভ্রান্ত।

বাজী ধরে বসলেন তিনি : এত দূর থেকে কিছুতেই পারবেন না। আর ওটা যা লাফানো শুরু করেছে ডাল থেকে ডালে।—বেশ, যদি এক গুলীতে পারেন, তাহলে কাল বিকেলে মাংস পোলাও খাওয়াবো, আর যদি না পারেন—

দারোগাবাবুর কথা আর শেষ হলো না, আমার নিক্ষিপ্ত গুলীতে বিদ্ধ হয়ে হনুমানটা হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল এবং একটু নড়েই একেবারে অনড় হয়ে গেল।

এবার হাসলেন ক্ষীরোদ দারোগা, বললেন : আপনি একটি ডাকাত!

হাসাহাসি পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দারোগাবাবু আবার চলে গেলেন মফস্বলে। কোথায় ডাকাতি হয়েছে। বেশ বুঝতে পারলাম, আজ আবার চলবে সারারাত একটানা মদ্যপান ও বদমাশি। এই ব্যাধি ওর জীবনে সারবে না, সারতে পারে না।…

অবিনাশবাবুকে একটা চাকর সংগ্রহ করে দেবার অনুরোধ জানাতেই তিনি বললেন: নটবর নামে একটা ভালো ছেলেকে কাল থেকে লাগিয়ে দোব আপনার ওখানে। বয়স একটু কম। তাহলে কি হবে, কাজে খুব পাকা। আর চোর নয়। দুপুরটা যা হোক্ করে তো কেটেছে, এ রাতটা গরীবের বাড়ীতেই না-হয় দুটো ডালভাত—কাল তো মাংস পোলাওএর ব্যবস্থা হয়েই রইলো।

রাত হতে তখনো দেরী আছে। দুটো গেম ব্যাডমিন্টন খেলে নেয়া যাবে। ডাক্তারখানার মাঠে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়। আমি এসেই এটা প্রবর্ত্তন করেছি। মাসে এক টাকা করে চাঁদা, র‍্যাকেট নিজের। ব্যাডমিন্টন খেলায় বরাবর আমার সুনাম ছিল আর কেশিয়াড়ীতে এমনিভাবে জমিয়ে তুলেছিলাম এই খেলার আড্ডা যে, জটাধর সেনাপতিও উৎসাহী হয়ে মাঝে মাঝে খেলতে আসতেন। খেলার পর চলতো এন্তার পান ও সিগারেট, তারপর সন্ধ্যে হতেই তাস। ব্রিজ। রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। পান, সিগারেট ও ব্রিজের পেছনে একটু ইতিহাস আছে, তা বলছি পরে।

আজ কিন্তু মাঠে এসেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেমতোষ এসেছে, খেলছে সিঙ্গলহ্যাণ্ড বিনোদবাবুর সঙ্গে। খেলা ঘুচিয়ে দোব আজ! সার্কাস দেখতে যাবার কথা এই শালাই লাগিয়েছে দারোগার কাছে!……নতুন করে দল গঠন হলো—আমি একা আর ওরা দু'জন। কি জানি কেন, আজ আর কেউ এলেন না। না জটাধর সেনাপতি, না গোপাল রায়, না সুধীর। ভালোই হলো, র‍্যাকেট আর ছাড়তে হলো না। দেখলাম, এই হচ্ছে সুযোগ! ক্ষীরোদ দারোগা চলে গেছেন মফস্বলে। থানায় রাজত্ব করছেন এখন অবিনাশবাবু, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা আমার পক্ষে। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ!

নিরীহ বিনোদবাবু প্রথমটা বুঝতেই পারেননি ব্যাপারটা। খেলা শেষ হতেই আমি ডাকলাম প্রেমতোষকে: প্রেমতোষবাবু, পালাবেন না যেন সাইকেলে করে—নামুন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

সাইকেলখানা ডাক্তারখানার বেড়াতে ঠেস দিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন স্যানিটারী ইনসপেক্টর স্মার্ট বয়ের মতো।

কি, বলুন।

ভূমিকা করে কী হবে আর? তাই সোজাসুজি আসল কথা পাড়লাম। দেখা গেল, ঠিক জায়গায় ঘা পড়েছে। প্রথমটা তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, বক-ধার্ম্মিকের মতো ভালো ও সুন্দর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা শুরু করলেন, তারপর দ্বিতীয় বার ধমক খেয়ে তাঁর ওজস্বিনী ভাষা যেমন হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল, তেমনি কণ্ঠেও যেন ঘড়ঘড় করে উঠলো নিউমোনিয়ার শ্লেষ্মা। তৃতীয় বার ধমক দেবার পর প্রেমতোষ একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়লো। আমার হাতে ধরে ক্ষমা চাইবার জন্য এগিয়ে আসতেই আমি কসে বসিয়ে দিলাম বাঁ গণ্ডে বেশ ভারী একটি চপেটাঘাত। সামলাতে না পেরে প্রেমতোষ মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো সে এবং ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ইংরেজী ও বাংলা বুকনি ঝেড়ে যা বললো তার সারাংশ হচ্ছে যে, পরদিনই সে যাবে এস ডি ও-র কাছে, তাঁকে সব জানিয়ে গ্রেপ্তার করাবে আমায়, জেলে পাঠাবে আমায়। এমন কি ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে। আমার আর রক্ষে নেই, কারণ এত বড় একজন সরকারী অফিসার—

Shut up, you rascal! সরকারী অফিসার! চামচিকে আবার পাখী! জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দোব।—বলে স্যাণ্ডেল নিয়ে ধাওয়া করতেই বিনোদবাবু ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেললেন আমায়ঃ থামুন, দ্বিজেন-বাবু, থামুন। রাগে আত্মহারা হবেন না।

আত্মহারা আদৌ হইনি। সরকারী ময়ূরপুচ্ছ এঁটে দাঁড়কাক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ওজস্বিনী ভাষায়, তোবড়ানো গালে দু'ঘা পড়লেই ব্যাটার আসল কর্কশ স্বর কা কা বেরিয়ে পড়তো। স্যানিটারী ইনসপেক্টর, সে নাকি আমায় ফাঁসিতে লটকে দেবে! সত্যিই, স্যাণ্ডেল দিয়ে ওর দাঁত ভেঙ্গে দিতাম, কিন্তু বিনোদ-বাবুর জন্য হলো না। ভয় হলো তাঁর, পাছে রাগের মাথায় আমি একটা খুন-খারাপিই করে বসি। কারণ আমরা নাকি—

অনুমান তাঁর একটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু আত্মহারা হইনে আমরা কোনো দিন। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লোম্যান ও হড্‌সনকে গুলী করবার সময় ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লে বিনয় বোসের গুলী তাঁদের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত, আর ধরা পড়তেন তিনি। বন্ধুর মতো কথা বলতে বলতে শত্রুর মতো ছুরি চালিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই খাবার দোকানে বসে অর্ডার দোব: দেখি, দুটো রসোমালাই আর চারটে ফুলকপির সিঙ্গাড়া। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ব অবস্থায়

আমাদের এই নৃশংসতা শুধু দেশের জন্য। বন্দিনী মায়ের মুক্তির জন্যই আমরা ডাকাত, আমরা নরঘাতক।......

টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে সবে বারান্দায় উঠেছি, এমন সময় সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, ধীর পদক্ষেপে আমার বাসার দিকে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং প্রেমতোষ সেন! তাঁর পশ্চাতে আসছেন বিনোদবাবু, অবিনাশবাবু।

বিস্মিত হলাম! মার খেয়ে শ্রীমান্ বাড়ী যাননি দেখছি। স্থির করলাম, আবার সরকারী অফিসারের বক্তৃতা শুরু করলে এবার সত্যিই স্যাণ্ডেল ব্যবহার করবো। কিন্তু এসেই প্রেমতোষ একেবারে আমার পায়ে পড়ে আর কি!

দ্বিজেনদা, আমায় ক্ষমা করুন।

ক্ষমা! কিসের জন্য?

কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো প্রেমতোষ: অনেক কটু কথা বলেছি। শপথ করছি, এস ডি ও-র কাছে যাবোই না, থানাতেও আসবো না আর।—বলুন, ক্ষমা করলেন আমায়?

বুঝতে পারলাম না ব্যাপার কি! মার দিলাম আমি, আর ক্ষমা চাইবে প্রেমতোষ?···অকস্মাৎ চেয়ে দেখি, পেছনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন অবিনাশবাবু, সুতরাং বুঝতে আর দেরী হলো না যে, এ তাঁরই কারসাজি। বললাম: আচ্ছা যান, এবারটা কিছু বললাম না। কিন্তু জানবেন, আবার দারোগার কানে লাগালে আর কিন্তু ছেড়ে দোব না আমি। একটি মহিলা হয়তো বিধবা হবেন, কিন্তু আমাদের পথ পরিষ্কার হবে।

অবিনাশবাবু বললেন: প্রেমতোষবাবু আমায় এসে সব ঘটনা বলতেই আমি ওঁকে সাবধান করে দিলাম। কারণ আপনাদের তো আমরা জানি দ্বিজেনবাবু! স্বয়ং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যাঁদের ভয় করেন এবং ভয় করেন বলেই এমনি মাসোহারা দিয়ে বছরের পর বছর আটকে রাখেন, তাঁদের কি এতটুকু ভরসা করা যায়? কে জানে, আর একদিন অন্ধকারে পেয়ে প্রেমতোষবাবুর পেটের ঝুলিই হয়তো বার করে দেবেন ছোরা চালিয়ে আর লাসটা টেনে ফেলে দিয়ে আসবেন জটাধরের দীঘিতে, তখন?

প্রেমতোষ এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো: আপনার পায়ে ধরি, দ্বিজেনদা!

*　　*　　*　　*

একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম এখানে আসবার পর থেকেই। যেসব নতুন জিনিস এখানে আমি প্রবর্ত্তন করেছিলাম, যথা, ব্যাডমিন্টন ও ফুটবল, যথা, নাট্যাভিনয়, যথা, জটাধরের দীঘিতে মৎসশিকার,—সব কাজেই আমার প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে সব সময় না পারলেও এখানকার সবাই এগিয়ে আসছেন বটে, কিন্তু তারপর যেন আর তাঁদের দেখতে পাইনে। ক্ষীরোদ দারোগা থাকতে অবশ্য তাঁদের আমার বাসায় যাতায়াত শুধু অসুবিধেজনক নয়, বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু ক্ষীরোদ ক'দিনই বা আর থাকেন থানায়? মফস্বলে সখীপরিবৃত হয়ে রাত কাটানোই তো তাঁর নেশা। একটু কিছু ছুতো পেলেই অমনি ছুটে যান মফস্বলে। তাই প্রায় রাতেই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা! কিন্তু কই, জটাধর, গোপাল রায় বা অপর কাউকে তো তেমন দেখতে পাইনে সে সব রাতে? থানার মধ্যে বন্দী থাকবার হুকুম মহামান্য সরকার জারী করেছেন আমার বেলায়, এতে ওঁদের এত ভয় কেন?······এখানে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রবর্ত্তন যতই করিনে কেন, এখানকার সমাজের মধ্যে যদি অনুপ্রবেশ করতে না পারি, তাহলে স্থায়ী কিছু কী করে করবো? কী করে আমার পরিচয় রেখে যাবো এই গণ্ডগ্রামে?······

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একদিন বিনোদবাবুকে জানালাম দুঃখের কথা। বিনোদবাবু তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞের মতো জবাব দিলেন: এজন্য দায়ী আপনি নিজে। আরে মশাই, কেশিয়াড়ী উড়িষ্যার সীমান্তের গায়ে একটি গ্রাম। এখানকার সবাই ভীষণ পানখোর আর সিগারেটখোর। কিন্তু আপনি ও রসে বঞ্চিত। পানও খাবেন না, সিগারেটও খাবেন না। তাই সন্ধ্যের পর যত সুবিধেই থাক না কেন, ওঁরা আপনার ওখানে কেন যাবেন? তার চাইতে হরিমতীর কোনো চ্যালাচামুণ্ডার হাতের মিঠে খিলি খেতে খেতে দুটো মনের কথা কইতে পারলে শান্তি পাওয়া যাবে।

জিজ্ঞেস করলাম: এই তাহলে কারণ?

নিশ্চয়ই।—জবাব দিলেন বিনোদবাবু।

বললাম: অল্ রাইট, দেখা যাক, কে কত পান খেতে পারেন আর সিগারেট। চ্যালেঞ্জ রইলো আপনাদের কেশিয়াড়ী গ্রামকে।

গোল্ডফ্লেকের টিন এলো, প্রায় সব সময়ই আমার অধরের ফাঁকে শোভা পেতে

লাগলো জলন্ত গোল্ডফ্লেক। আর পান। নটবর বাচ্চা ছেলে হলে কি হবে, পানের কদর সে বোঝে। তাই চললো পান, পানের পর পান। শুধু নিজে খাওয়া নয়, বিলোতে লাগলাম দু'হাতে যেখানে সেখানে, যখন তখন।

ফলে, প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলায় বসতে লাগলো থানার বারান্দায় আমাদের একটানা ব্রিজ। চলতো প্রায় সারারাত। সঙ্গে পান ও সিগারেট। ব্যাডমিন্টন মাঠে সিগারেট, নাটকের মহলায় পান ও সিগারেট, ফুটবল খেলার ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট, পথে ঘাটে হঠাৎ দেখা হলেই পান ও সিগারেট বিনিময়…… একেবারে নরক সৃষ্টি করে ফেললাম দেখতে দেখতে!

বিনোদবাবু একদিন গোপনে ডেকে বললেন: ব্যস্, এবার একেবারে খোর হয়ে গেছেন তো। আঙুলের ফাঁকেও দাগ পড়েছে, দাঁতেও লালচে আভা। দেখবেন, এদেরই মতো শেষটায় পান আর সিগারেটই না আপনাকে খেয়ে বসে।

হাসলাম। বিনোদবাবুর কাঁধে একখানা হাত রাখলাম, যেমন রেখে থাকি আমরা কোনো ছেলেকে দীক্ষা দেবার বেলায়। তারপর বললাম ধীরে ধীরে: বিনোদবাবু, যেমন আঁকড়ে ধরেছি, তেমনিই একদিন ছেড়ে দোব এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই। খোর হয়ে যাবার কথা বললেন না? খোর কেন, একেবারে চুর হয়ে আছি আমরা একটি নেশায়, সে হচ্ছে দেশপ্রেমের নেশা, দেশকে ভালোবাসার নেশা। সে নেশা থেকে আমাদের যে রেহাই নেই, তা জানি। সেই নেশাটিকে জমিয়ে তোলবার জন্য যা বলবেন, তাই করবো, যে পথে যেতে বলবেন, তাই যাবো বিনা দ্বিধায়। আমার দেশের কাছে ব্যক্তিগত পান-সিগারেটের নেশা তো তুচ্ছ, সতীত্বও বড় কথা নয়। দেশ সবার ওপরে, তার কাছে তুচ্ছ সব কিছু। যদি প্রয়োজন হয়, এখানকার সমাজে ঢুকে কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেবার জন্য পান-সিগারেট তো দূরের কথা, মদও খেতে দ্বিধা করবো না। হয়তো হরিমতীকেই আবার সাদরে ডেকে আনবো।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম: বিনোদবাবু, কাদামাটি ধুয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করলে কাদামাটিতে নামতে হয়, বাইরে দাঁড়িয়ে জল ছিটোলে হবে কেন? কাদার মধ্যেই তো কমল ফোটে বিনোদবাবু। কমল চাইবেন আপনি, অথচ কাদায় নামবেন না, তা কি হয়?

বিনোদবাবু শুধু বললেন: আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা অসম্ভব।

তৎক্ষণাৎ বললাম : কারণ, যা আমি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, তাই বলি আর যা বলি, তাই আমি করি। কোনো কারচুপি নেই এতে, কোনো রফা নেই। স্ঁচ হয়ে ঢুকেছি এঁদের মধ্যে একদিন ফাল হয়ে বেরুবার ব্রত নিয়ে। অত দিন আমি হয়তো এখানে থাকবো না, কিন্তু আমার পরিচয় থেকে যাবে আর থাকবে আমার স্বতঃউৎসারিত প্রভাব !……

বিনোদবাবু দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমায়, বললেন : দেশের লোক চিনলো না আপনাদের, জানতেও পারলো না, কী আপনারা করে যাচ্ছেন তাদেরই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য, তাদের স্বাধীনতার জন্য !……

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অকস্মাৎ একদিন সকালবেলা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন সার্কেল ইনসপেক্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। হেসে বললেন : I have brought a very good news for you.

কী সংবাদ ?—প্রশ্ন করলাম।

আনন্দোদ্ভাসিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ইনসপেক্টার : Here is a transfer order for you to Dacca Jail—আমার বিশ্বাস, ওখানে পৌঁছেই পাবেন আর একখানা সরকারী আদেশ and that will be your release order ! —তারপর বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করলেন : কতদিন হলো আপনার ?

হিসেব করে বললাম : তা চার বছর পুরো হলো।

এবার ছাড়া পাবেন।—ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষীর মতো বললেন যতীনবাবু : যান, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। আর যেন এ পথে আসবেন না।

মনে মনে হাসলাম। এ পথে কি আর কেউ হিসেব করে আসে ? না আসবার থাকে কোনো বাস্তবধর্ম্মী প্ল্যান ?…এমনি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেউ জন্ম-গ্রহণ করে না। বাপ-মাও সকল বাবা-মায়ের মতোই মনে করেন ছেলে তাঁদের লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, বড় চাকরি করবে, দশজনের মধ্যে একজন হয়ে বংশের মর্য্যাদা বাড়াবে। সেই অনাগত সুদিনের প্রত্যাশায় তাঁরা বিনাদ্বিধায় নিজেদের প্রবঞ্চিত করে, অমানুষিক প্ররিশ্রমে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নয়নের নিধিকে। ছেলেরও যে তাতে কম নিষ্ঠা থাকে, তা নয়। শিক্ষাগ্রহণ, অর্থো-পার্জ্জন ও সুনামলাভের সহজ পথটাই বেছে নিয়ে ভালো ছেলের মতো সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

কিন্তু মাঝপথে কোথা দিয়ে যে কী বিপর্য্যয় ঘটে যায়, সহজ পথে চলতে চলতে

কার প্ররোচনায়, কবে, কোন্ বিশেষ ক্ষণে সে এক বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথে পা বাড়িয়ে দেয়, কোন সর্ব্বনাশা পথের নেশা তাকে পেয়ে বসে, অনেক সময় নিজেই সে ভালো করে ঠাওর করতে পারে না। যখন পারে, যখন প্রাণান্তকর ঝুঁকির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে, তখন সে রীতিমতো মাতাল, মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও এই ভয়ঙ্কর পথ-চলা থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই। বাপ-মায়ের রঙীন পরিকল্পনা একখানি কাঁচের পাত্রের মতো চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে এগিয়ে চলে নয়নের নিধি ঘরে ফিরে না যাবার সংকল্প নিয়ে!

পথ ছাড়বারই যার ক্ষমতা নেই, সে পথে ফিরে না আসবার কথা তখন তাকে বলা নিরর্থক নয় কি?······

ভবিষ্যদ্বাণী ও ভালো ছেলে হবার সদুপদেশ দিয়ে ইনসপেক্টার যতীন সেন বেরিয়ে গেলেন আর আমি মিনিটখানেক চুপটি করে বসে রইলাম। মনের মধ্যে বার বারই একটি প্রশ্ন মাথা চাড়া দিতে লাগলো: তাহলে কি সত্যই আবার বাড়ী যাচ্ছি আমি?······

মেদিনীপুর শহর থেকে চলনদার দু'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সৈন্য ও একজন সহকারী দারোগা এসে গেছে। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলাম এক ঘন্টার মধ্যেই। দারোগাবাবু মফস্বলে ছিলেন। দেখা হলো না। রওনা হবার প্রাক্কালে থানার সবাই বাইরে এসে জড়ো হলেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে অপেক্ষমান মোটর বাসে আরোহণ করবার সময় অকস্মাৎ দেখি অবিনাশবাবুর চোখে অশ্রু আর বিনোদবাবু কোঁচার খুঁটে চক্ষু মার্জ্জনা করছেন এক পাশে দাঁড়িয়ে। গোপাল রায় এসেছে, এসেছেন ডাক্তার, এসেছেন নীলরতন জানা আর এসেছেন স্বয়ং জটাধর সেনাপতি।

দু'খিলি মিঠে পান আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আর দুই অধরের ফাঁকে একটি সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে জটাধর বললেন: সামান্য ক'টা মাস, কিন্তু মনে থাকবে চিরকাল। ঐ তো তোমাদের দোষ! চিনিনে, জানিনে, দেখিনি কোনোদিন, হঠাৎ এসে পড়লে এই গাঁয়ে। এসেছো, বেশ ভালো। সরকারী অতিথি, সরকারী সার্কেলেই থাকো।—তা নয়। এসে সবার সঙ্গে মিশে, খেলাধুলো করে, হাসি-গল্পে, বন্ধুত্বে একেবারে দিলে সবাইকে মজিয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন বলা নেই, কওয়া নেই ছুট্ করে চললে সব ফেলে রেখে দিয়ে।—শেষের দিকে জটাধরের গলা ভারী শোনা গেল। সামলে নেবার জন্যই চট্ করে বললেন: বাড়ী পৌঁছে চিঠি দিও হে একখানা।

হেসে বললাম : অবশ্য যদি বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারি।

অবিনাশবাবু এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একখানা হাত রাখলেন, বললেন : শুধু-শুধু মায়া বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। জীবনেও হয়তো আর দেখা হবে না, অথচ ভুলতেও পারবো না এ ক'টা মাসের কথা। অন্ততঃ পাঁচটা বাজলেই একবারটি মনে পড়বে আপনার কথা।

বিনোদবাবু বললেন : ব্যাডমিণ্টন কোর্টে এবার ঘাস গজাবে। কে আর উৎসাহ নিয়ে শাটল্‌কক্ আনাবে সেই কলকাতা থেকে আর এমনি কমপিটিশনই বা কে চালাবে!

জটাধর হাসবার চেষ্টা করে আবহাওয়াটা হালকা করে দিলেন : আর আমাদের ব্রিজ? সন্ধ্যাবেলার এমনি আসরটা এবার উঠে গেল। আমার পান খরচাও হবে না, ভায়ারও আমার গোল্ডফ্লেকগুলো বেঁচে গেল।

চট্ করে কি মনে পড়তেই জটাধর এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে তাঁর গোল্ড-ফ্লেকের টিনটা আর মিঠে পানের রূপোর ডিবেটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। কোনো মানায় কান দিলেন না।

বা'স ছেড়ে দিল। যুক্তকরে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার সেরে আসনে সোজা হয়ে বসতে যাবো, এমন সময় দেখি দূরে দারোগার বাড়ীর দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই আমার দুঃখিনী বোনটি। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে বললাম : নমস্কার!

দেখলাম, নীরবে দু'খানি হাত যুক্ত হয়ে কপালে গিয়ে ঠেকলো!···

বাস দ্রুতবেগে ছুটে চললো খড়গপুর স্টেশনের পথে ধুলো উড়িয়ে।

তেরো

স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৩৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এসে পৌঁছোলাম আবার সেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে! ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই জেল থেকেই গিয়েছিলাম বহরমপুর বন্দীশিবিরে পাকা রাজবন্দীরূপে।

ইনসপেক্টার যতীন সেনগুপ্ত গভীর আশা ব্যক্ত করে যখন কেশিয়াড়ীতে বলে দিয়েছিলেন ঢাকা জেলে পৌঁছেই পাবো দ্বিতীয় মুক্তির ফরমান, মনে মনে যে তখন একটুখানি খুশীই হয়ে উঠেছিলাম তা অস্বীকার করতে পারিনে। তাই জেল অফিসে পৌঁছেই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলাম সেই মহার্ঘ দ্বিতীয় সরকারী আদেশপত্রের জন্য। তখন সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে! অফিসের উদ্যত-ফণা কেরাণীকুল বেলা দেড়টায় চলে গেছেন শম্বুকের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে কলম পিষে জর্জ্জরিত হয়ে। ডেপুটি জেলারদেরও কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে আবারও আসবেন তাঁরা। আসতে হবে। যে সব হাজতী আসামী আজ বিভিন্ন আদালতে গেছে, তারা ফিরবে। নতুন যারা আজ ধরা পড়েছে, তারাও ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম নিয়ে আসবে। অন্যান্য জেল থেকে যারা স্থানান্তরিত হয়ে আসে, তাদেরও দু'একদল এসে পড়তে পারে। অর্থাৎ সন্ধ্যার পর আবার জেল-অফিসে হাট জমে যায় এবং চলে রাত প্রায় দশটা পর্য্যন্ত। ডেপুটি জেলারের পরিত্যক্ত একখানা চেয়ারে উজ্জ্বল আশা নিয়ে বসে রইলাম। তখনো যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তবুও অনায়াসেই যেতে পারবো আমাদের গ্রামে ফিরে, কারণ গয়নার নৌকোর সদর ঘাট ছেড়ে যেতে রাত আটটা হয়ে যায়।

এই গয়নার নৌকোয় গয়না কিন্তু থাকে না একখানাও। কোনো স্বর্ণকারের ভাসমান বিপণী নয় এ। বেশ বড় আকারের নৌকো। ব্যায়াম সমিতির প্রধান শিক্ষকের মতো স্বাস্থ্য—যেমন দীর্ঘ, তেমনি তার প্রস্থ। সুবারবান ট্রেনগুলি যেমন করে নিয়মিতভাবে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, ঠিক তেমনি বর্ষাকালে জলমগ্ন বিক্রমপুরের সঙ্গে ঢাকা শহরের সংযোগ রক্ষা করে চলে এই গয়নার নৌকো। কী করে এর নাম গয়নার নৌকো হলো, হয়তো শ্রদ্ধেয় যোগেন গুপ্ত বা সুনীতি চাটুজ্জে বলতে পারেন। প্রতিদিন সকালবেলা যেমন একখানা আপ্ নৌকো গ্রাম থেকে যাত্রা করে শহরাভিমুখে, ঠিক সেই সময় তেমনি একখানা ডাউন নৌকো বুড়ীগঙ্গার সদর ঘাট ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে

আসে, তেমনি সন্ধ্যাবেলা। রেল লাইন নেই কিন্তু এদের যাতায়াতের নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। ট্রেনের মতো এদের নির্দ্দিষ্ট কোনো স্টেশন নেই সত্যি, কিন্তু চলার পথে যে-কোনো স্থানে যে-কোনো যাত্রীর জন্য এর গতি মন্থর করা হয়। সারা দিন বা সারা রাত এই নৌকো চলে। আপ্ নৌকো রাত তিনটেতে ঢাকা শহরে পৌঁছে গেলেও ঘাটে ভিড়তে পারে না। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই সদর ঘাটের বিপরীত দিকে শুভঢ্যা গ্রামের প্রান্তে অবশিষ্ট রাতটুকু কাটাতে হয় নোঙর ফেলে। ডাউন যে নৌকোগুলো ঢাকা শহর ত্যাগ করে সন্ধ্যার পর, ট্রেনের মতো তার কোনো টাইম-টেবল নেই বলে এদের ঘাট ছাড়তে রাত আটটা বেজে যায়।

দেয়ালের ঘড়িতে দেখলাম তখন মাত্র সাতটা। আরও আধ ঘন্টা পর ছেড়ে দিলেও দ্রুতগামী গাড়ী অনায়াসে ঘাটে পৌঁছে দিতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর ডেপুটি জেলার রেজাক সাহেব এলেন বোধহয় সংবাদ পেয়ে। অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন : দ্বিজেনবাবু, দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। ডেটিনিউ ইয়ার্ডে আপনাকে রাখা যাবে না, কারণ আই বি বোধহয় আপনাকে বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী দলভুক্ত করে নেবে।

বিস্ময় প্রকাশ করলাম : বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা!

কিছুই খবর পাননি বুঝি?—বলে রেজাক সাহেব সংক্ষেপে যে বিহ্বলকারী সংবাদ প্রকাশ করলেন, তা হচ্ছে এই যে, এই মামলার তোড়জোড় চলছে প্রায় দু'মাস ধরে। একটি একটি করে দশ-বারো জনকে গ্রেপ্তার করে এনে বিচারাধীন আসামী করে রাখা হয়েছে, ডাকাতি, নরহত্যা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলতে পারেন রেজাক সাহেব?

জবাব দিলেন রেজাক : সব নাম তো আমার মনে নেই; তবে বিপদভঞ্জন, সুবোধ, নেপাল না গোপাল চক্রবর্ত্তী—এমন আরও জনকতক। বোধহয় অনাথ নামেও কেউ আছে।……

চমকে উঠলাম মনে মনে। কিন্তু বাইরে খুব সহজ ভাব দেখিয়ে আর একটা প্রশ্ন করলাম : এরা সব আছে কোন্ ইয়ার্ডে? আমাকে এদের সঙ্গেই রাখবেন তো?

রেজাক বললেন : ঠিক বুঝতে পারছিনে। এখন পর্য্যন্ত সরকারী কোনো আদেশ আসেনি। শুধু বিভূতি সাহা বলে গেছেন, আপনাকে যেন রাজবন্দীদের সঙ্গে না রাখা হয় আর এইসব আসামীর সঙ্গেও যেন আপনার দেখা না হয়। কিন্তু এই ছেলেদের তো একসঙ্গে রাখা হয়নি। মনে পড়ছে, অন্ততঃ দু'জনকে চল্লিশ ডিগ্রিতে দেখেছি।

তাদের নাম মনে আছে?

কালাচাঁদ দাস আর বোধহয়—রঙ্গলাল গাঙ্গুলী। রঙ্গলাল আপনার আত্মীয় নাকি দ্বিজেনবাবু? অনেকটা যেন আপনার মতো দেখতে।

বললাম : কোথায় আমায় থাকতে হবে, সেইখানে নিয়ে চলুন রেজাক সাহেব, খুব শ্রান্তি লাগছে। বাস্, ট্রেন, স্টীমার, ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী—সবই তো চেপে এসেছি, শরীর ব্যথা বোধ হচ্ছে।—চলুন।

এমন সময় একজন জমাদার এসে নিবেদন করলো যে, সিভিল ইয়ার্ড খালি করে, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে খাট, টেবিল ও চেয়ার বিছায়কে দিয়া গিয়া। অব্—

রেজাক উঠলেন : চলুন দ্বিজেনবাবু, আজ তো ওখানেই থাকুন। কাল বিভূতিবাবু এসে যা করবার করবেন।

চলতে চলতে প্রশ্ন করলাম : বিভূতি সাহা কে?

আই বি ইনসপেক্টার, এই মামলা তদ্বির করছেন সরকারের পক্ষ থেকে।

ঢাকা জেলের সিভিল ইয়ার্ড বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ডাকবাংলোর মতো। ছোট বারান্দা, তারপরই মাঝারী আকারের শয়নকক্ষ, সংলগ্ন বাথরুম। চারিদিকে ইয়ার্ডের নিজস্ব কোনো দেয়াল নেই, অন্যান্য ইয়ার্ডের দেয়াল পর্য্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। সযত্নে বর্দ্ধিত গোটাকতক পাতাবাহার গাছ পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে রয়েছে বাংলোর সম্মুখভাগে। যারা হাসপাতালে যায়, ছ' নম্বরে যায়, বিশ ডিগ্রিতে যায় এমন কি চল্লিশ ডিগ্রিতে যায়, তাদের সবাইকেই যেতে হয় এই সিভিল ইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে। চল্লিশ ডিগ্রির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্নানের নালীগুলি ও পায়খানার সারি এই সিভিল ইয়ার্ডের প্রাঙ্গণমধ্যেই অবস্থিত বলা যায়।

ডাকবাংলোর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এর জানালায় আছে লোহার শিক এবং তাও সুদৃশ্য গ্রিল নয়, মোটা ও মজবুত সৌন্দর্য্যহীন শিক। আর আছে

এমনি শিকের দরজা, যা রাত্রিকালে তালাবন্ধ হয়ে আক্রমণোন্মুখ ব্যাঘ্রের মতো যেন তীক্ষ্ণ দ্রংষ্ট্রা প্রদর্শন করে !...

পরিপাটি করে শয্যা বিছিয়ে দিয়ে গেল রাজবন্দী ইয়ার্ডের জনৈক ভৃত্য, কুঁজো ভর্ত্তি করে দিয়ে গেল পানীয় জল এবং সিপাইয়ের সঙ্গে ফিরে যাবার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি এতখানি পথ এসেছি, চা ও খাবার দেবে, না একেবারে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করতে বলবে ।

চট্ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল, বলে দিলাম : শোন, ম্যানেজারবাবুকে বলো চা ও গোটা দুই মামলেট যেন এখন পাঠিয়ে দেন, পরে খাবো ভাত । আর এক কাজ করো, গোটা দুই বাণ্ডিল 'জাহাজ' বিড়ি নিয়ে এসো । আমি আবার সিগারেট খাইনে ; বিড়ি ভালো লাগে ও বেশী খাই । দু' বাণ্ডিল এনো, বুঝলে ?

সিপাই প্রহরায় ভৃত্য চলে গেলে শয্যায় প্রসারিত করে দিলাম শ্রান্ত দেহ । সরকারী দ্বিতীয় আদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করলাম এতক্ষণে ! বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা···প্রধান আসামী দ্বিজেন গাঙ্গুলী ।

সত্যই কি অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে হবে আই বি-র কাছে ? বুক ঠুকে এতকাল যাদের চ্যালেঞ্জ করে এসেছি, যাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে চালিয়ে এসেছি এতকাল আমার গুপ্ত বিজয় অভিযান, বুদ্ধির লড়াইতে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত, পর্য্যুদস্ত হয়ে যারা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, এতকাল পরে আবার কি তারা গাণ্ডীব তুলে নিল ? তাদের অস্ত্রনির্ম্মাণের কামারশালে কি আবার হাপরের তৎপরতা জেগে উঠলো ? শুরু হলো হাতুড়ির ঠুকঠুক ? মরণ-কামড় হানবার জন্য কি এরা এবার রণনায়ক করে পাঠালো জেনারেল ভন্ রুণ্ডেটকে পতনোন্মুখ জার্ম্মানীর মতো ?······কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলা কী করে সাজালো এরা ? কোন্ কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ? কোথায় তার সাক্ষী ? কী তার প্রমাণ ? বেছে বেছে আমারই অনুগামীদের কেন গ্রেপ্তার করা হলো ?—এমনি অসংখ্য প্রশ্ন জাগলো আমার মনে, যার জবাব তখনও কিছুই পেলাম না খুঁজে ।

দেখা যাচ্ছে, বছর চারেক রাজবন্দী জীবন কাটাবার পর যদি এই মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হয়ে যায়, তাহলেই এ জন্মের মতো প্রত্যক্ষ কাজ শেষ হয়ে যাবে । অপেক্ষা করতে হবে পরজন্মের ।···

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো । সংসারের যাঁরা

স্তম্ভ, শুভানুধ্যায়ী, ছোটবেলা থেকেই তো তাঁরা আমায় তেমনি একটি স্ফটিকস্তম্ভই তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের নীরবকুণ্ঠ প্রচেষ্টার কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না। প্রতিদানে কি দিয়েছি আমি তাঁদের? দিয়েছি দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও বিনিদ্র রজনীর শ্রান্তি!···

সেই শ্রান্তির প্রতিক্রিয়া যেন আমার মনেও শ্রান্তি ছড়িয়ে দিল। মনে হলো যেন অনেক হেঁটেছি, অনেক করেছি, এবার বিশ্রাম নেবার পালা এসেছে। যাঁদের অনুপ্রেরণায় একদিন এই পথে নেমেছিলাম, সর্ব্বক্ষণ তাঁদের পাশে না পেলেও তাঁদেরই শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ চলার পথে আমায় উৎসাহ দিয়েছে। একক চলতে গিয়েও মনে হয়েছে আমি একা নই, অশরীরী সঙ্গীরা আমার কাঁধে কাঁধ দিয়ে হাতে হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

কিন্তু আজ ঢাকা জেলের সিভিল ইয়ার্ডের শয্যায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে হঠাৎ যেন মনে হলো আমি একা, একেবারে একা। আমার ডাকে যারা বেরিয়ে এসেছিল, আমারই সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিল, আজ মনে হতে লাগলো তারা যেন সবাই পেছিয়ে পড়েছে কিংবা ফিরে চলে গেছে। আমার ডাক শুনে আর তারা কেউ আসবে না।···

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তাহলে কি করতে হবে? যদি সবাই মুখ ফিরিয়ে থাকে, কথা না কয়, তাহলে কি আমার কর্ত্তব্য? ঝড়ের রাতে দুঃসাহসী পথিককে যদি কেউ আলো না দেখায়, যদি সবাই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি করবে সে পথিক? সে কি চীৎকার করে কেঁদে উঠবে? সে কি ফিরে যাবে? পথের দেবতাকে ছেড়ে সে কি ঘরের নিরাপদ কোণে আশ্রয় নেবে?······

এমনি একজন ভারত-পথিকের কথা মনে পড়ে গেল। নির্ভয় নিঃশঙ্ক পথিক। দিশেহারা বে-হিসাবী নয়, আবেগে টকটকে লাল হয়ে উঠলেও অভিভূত হয়ে বিগলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরিকল্পনা নেই তাঁর। আছে সুচিন্তিত প্ল্যান, অভ্রান্ত এস্টিমেট, তারপর অত্যন্ত হিসাবী অপারেশন, পায়ের পর পা ফেলে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার প্রাণান্তকর প্রয়াস······এলগিন রোড থেকে আফগানিস্থান, সেখান থেকে জার্ম্মানী, জার্ম্মানী থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন, তারপর রেঙ্গুন থেকে ইম্ফল······ভারতের সেই পুরুষসিংহ মহাপথিকের কথা মনে পড়ে গেল।

তাঁর সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার একটি ক্ষুদ্র বাঁকে আমার সঙ্গে ক্ষণেকের তরে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে গেল ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতার মেয়র, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। আর, আলীপুরের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গুণেশ সেনের রিভলভার চুরির অভিযোগে হাজতী আসামী আমি। ১৬নং সেলস্-এ থাকি।

ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে দীনেশ গুপ্ত যেদিন চলে গেল ফাঁসির ঘরে, তার দু'তিন দিন পরই অকস্মাৎ ১৬নং সেলস্-এ এসে হাজির হলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত। বরিশাল শঙ্কর মঠের মনাদা'। ডালহাউসী বোমার মামলা সম্পর্কে পুলিশ তাঁকে অনেক দিন ধরে খোঁজ করছিল, পায়নি। সরস্বতী প্রেসে বহুবার হানা দিয়েছে পুলিশ, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের সেই সুপরিচিত মেসটি তল্লাশী করে তচনচ করে ফেলেছে, কলকাতা ও মফস্বলের নানা স্থানে মনাদা'র সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরেছে পুলিশ, পায়নি।

মনাদা'ই বললেন : বুঝলে দ্বিজেন, অনেক দিন পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বেশ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম এ যাত্রায় ওরা বুঝি হেরেই গেল। সেই নিশ্চিন্ততাই হলো কাল। কোনো জায়গাতেই বেশী দিন থাকতাম না, কিন্তু পুলিশের উৎসাহে বোধ হয় ভাটা পড়ে গেছে বার বার অকৃতকার্য্য হয়ে, এই ধারণা নিয়ে গ্রামের একটা প্রাইমারী স্কুলে সেই যে মাস্টারী নিয়ে ঢুকলাম, আর কোথাও যাবার তাগিদ রইলো না তেমন। একদিন পুকুরে স্নান সেরে ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই একেবারে ওদের হাতে পড়তে হলো।

যাই হোক, দিনগুলি ভালোই কাটছিল আমাদের। ১৬নং সেলস্-এ আমরা দু'জন ছাড়া থাকতো আর একজন এ্যাংলো-বার্ম্মিজ কয়েদী। বার্গলারি মামলায় আট মাস কারাদণ্ড হয়েছে, তারপর জেলের কোন্ আইন ভঙ্গ করায় জেলার মিঃ সোয়ান ওকে আমাদের এখানে চালান করে দিয়েছেন।

মনাদা' শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ ডিভিশন ওয়ান হাজতী আসামী, তাই তাঁর যা খাবার ও যে পরিমাণ খাবার আসতো, তারই ভাগ পেতাম আমি শ্রেণীহীন অর্থাৎ ডিভিশন থ্রি আসামী। পাশাপাশি বসেই খেতাম।

এর মধ্যেই একদিন খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া গেল গান্ধীজী লর্ড আরউইনের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়েছেন। সুতরাং দেশব্যাপী আইন অমান্য

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবে। ভালো লাগলো না আমাদের। অনেক আলোচনা করলাম আমরা। অনেক দুঃখ প্রকাশ করলাম গান্ধীজীর উৎকট সত্যাগ্রহী মনোবৃত্তির জন্য। এমনি অভিমতও আমাদের সায় পেল যে, গান্ধীজী একটি পলিটিক্যাল ব্লাণ্ডার করে বসলেন!……

একদিন দুপুরে আমরা খেতে বসেছি। আমার ভাগের কালো মটরের দোতলা ডাল এবং নুন-ঝাল-মশলাহীন দুর্গন্ধযুক্ত লাবড়া তরকারি একপাশে ফেলে রেখে মনাদা'র ভদ্র খাদ্য গ্রহণ করছি। দোতলা ডালের ওপরতলায় থাকে প্রায়-ডিস্টিল্ড ওয়াটার আর নীচের তলায় খোসা খরকুটো ও পাথরকুচি মিশ্রিত কালো রংয়ের মটর ডালের আধ সেদ্ধ জুস। সেদিন ছিল দোল। দেয়ালের ওপারে রং ও আবীর ছোঁড়াছুড়ির আনন্দোচ্ছ্বাস আমাদের কানে ভেসে আসছিল।

এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে ইয়ার্ডে যেন চাঞ্চল্য দেখা গেল। মেট পাহারা যারা ছিল, তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং পরক্ষণেই একেবারে আমাদের ভোজন কক্ষের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন আর কেউ নন, স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। খালি পা, খালি গা, ধুতির কোঁচা কোমরে গোঁজা, সারা গায়ে, মুখে ও মাথায় আবীর ভর্তি, চশমার কাঁচেও আবীর আর হাতে একখানি রুমালে বাঁধা খানিকটে আবীর।

প্রথমটা আমরা হকচকিয়ে উঠলাম, সুভাষচন্দ্র এখানে—একা? তারপরই দেখতে পেলাম সোয়ান সাহেবের মুখ। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে সরে গেলেন। বোঝা গেল, না, দেহরক্ষী আছে সাথে। আহার অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লাম আমরা এবং হাতমুখ ধুয়ে এসে দাঁড়ালাম সম্মুখে। হ্যাঁ, একেবারে সুভাষচন্দ্রের মুখোমুখি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম আমি।

কুশলাদি প্রশ্নোত্তরে কালক্ষেপ না করে, কোনোরূপ ভূমিকা না করে সুভাষচন্দ্র বললেন হেসেঃ আজ দোল। হিন্দুদের একটা সাংঘাতিক ধর্মের ব্যাপার বলে সোয়ানকে বুঝিয়ে রং দিতে বেরিয়েছি। সব জায়গায় ঘুরে আপনার এখানে এলাম। বলেছি সোয়ানকে, পাঁচ মিনিট থাকবো। এর পর যাবো বম্ ইয়ার্ডে।

মনাদা' হাসলেন নীরবে।

সুভাষচন্দ্র আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে মনাদা' নাম ও পরিচয় জানালেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে লাগলেন সুভাষচন্দ্রঃ গান্ধীজীর দুর্বুদ্ধিটা দেখলেন।

আরউইনের মিঠে কথায় ভুলে তার ফাঁদে পা দিয়ে বসলেন। এবারকার আন্দোলনের মতো জোরদার আন্দোলন কখনো হয়নি। একযোগে সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলে উঠেছে। গভর্নমেন্ট কোলাপ্‌স্‌ করবার অবস্থায় এসে গেছে। আর ছ'টা মাস এমনি চালাতে পারলেই we could have dictated terms of agreement, তাই নয় কি ?

মনাদা' বললেন : আমিও তাই বিশ্বাস করি।

ধূর্ত্ত আরউইন সেটা বুঝতে পেরেছে, বলতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র : বুঝতে পেরেছে যে; শুধু বন্দুক চালিয়েই দেশ শাসন করা সম্ভব নয়, জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া গভর্নমেন্ট চলতে পারে না। তাই এবার শ্রীমান্ নীচে নেমে এসেছে, আসতে বাধ্য হয়েছে।

দরজায় আবার সোয়ানের মুখ দেখা গেল একটি মুহূর্ত্তের জন্য।

সুভাষচন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন : গান্ধীজীর এই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ যদি-বা কতকটা বুঝতে পারি, ওঁর সত্যাগ্রহের দর্শন আদৌ আমার ধাতে সয় না। সত্যাগ্রহের আয়ুধহীন আক্রমণে প্রতিপক্ষকে যখন প্রায় কোণঠাসা করে ফেলা গেছে, তখন আবার মিটমাটের কথা কেন ? ওকে হারানোই যদি আমার কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে না হারানো পর্য্যন্ত বিশ্রামের অবসর কোথায় বলুন ! বে-কায়দায় পড়েছে যে, সে তো সন্ধি চাইবেই।

নিশ্চয়ই। বললেন মনাদা', তারপর হেসে বললেন : গান্ধীজী বলেন বে-কায়দায় পড়া লোক যদি সন্ধি চায়, প্রকৃত সত্যাগ্রহী তাতে আপত্তি জানাবে না।

তার অর্থ ই হচ্ছে কৌশলে সে খানিকটা সময় নিয়ে নিল নিজের বে-কায়দা পজিশনটা শুধরে নেবার জন্য। জবাব দিলেন সুভাষচন্দ্র : শত্রুকে যদি এমনি বার বার সুযোগ ও সময় দেয়া যায়, তাহলে একদিন শত্রুই প্রবল হয়ে উঠবে না, কে বলতে পারে ? তখন ? The Satyagrahi will lose the battle......

দেখলাম চোখমুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, লাল রংয়ের আবীরের মধ্যেও তা স্পষ্ট।

আবার দেখা গেল সোয়ানকে। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়েই আবার সরে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে তখন আগামী কালের সর্ব্বাধিনায়কের জলদগম্ভীর সুর এসে গেছে : অথচ আশ্চর্য্য, ভারতের প্রবীণ নেতারা—প্যাটেল, মতিলাল, মালব্য—

সবাই গান্ধীজীকে সমর্থন করেছেন। দিল্লীতে মিলিত হচ্ছেন গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট-পত্রে স্বাক্ষর করবার জন্য। আমি আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা করছি জানবার জন্য যে, আপনাদের কি reactions, আপনাদের কি মতামত। বাংলা দেশ, কানাইলাল, ক্ষুদিরাম-এর বাংলা দেশ কি এই—এই দিল্লীর দাসখৎ সমর্থন করবে? গান্ধীজীর এই colosal political blunder-এর প্রতিবাদ কেউ করবে না?

তৎক্ষণাৎ বললেন মনাদা' : আমরা এর প্রতিবাদ করি—

আমিও এর প্রতিবাদ করি, তৎক্ষণাৎ বললেন সুভাষচন্দ্র : বাংলা দেশ এর প্রতিবাদ করে। সত্যাগ্রহ বাংলা দেশের কর্ম্মিদের tactics, principle নয়।

পুরো এক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ, গৌরকান্তি সুভাষচন্দ্র যেন বিদ্রোহের লেলিহান একটি শিখা! স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই অগ্নি-দেবতাকে মনে মনে জানালাম অসংখ্য প্রণাম!······

সোয়ান আবার এসে ঘুরে গেছেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের। পাঁচ মিনিট পার হয়ে পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে। সোয়ানের সাহস হচ্ছে না কিছু বলবার। বললেও থোড়াই কেয়ার করবো আমরা। দুই কানে ধ্বনিত হচ্ছে তখন বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের অগ্নিবাণী : চুক্তির ফলে নিশ্চয়ই আমাদের ছেড়ে দেবে। গান্ধীজী সবাইকে দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়েছেন। যাবো, আমিও যাবো। কিন্তু স্পষ্ট শুনিয়ে দোব, you have committed a blunder, বলবো, আসমুদ্র হিমাচল আপনার এই চুক্তি সমর্থন করলেও বাংলা দেশ সমর্থন করে না and there is at least a single worker who will not, will never put his signature on this Delhi Bond of Slavery······

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন : জানি, এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে হয়তো আমি isolated হয়ে পড়বো, কিন্তু আমি তার জন্য পরোয়া করি না। সাথী যদি না পাই, তাহলে একাই এগিয়ে চলবো······

সত্যিই একা, একেবারে একা। এই নিঃসঙ্গ মহাপথিক উত্তরকালে একাই এগিয়ে যাবার নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে। একাই বেরিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের সীমানা অতিক্রম করে। তারপর······তারপর একদিন ইম্ফলের রণক্ষেত্রে পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-অরণ্য প্রতিধ্বনিত করে এই একক মহাপথিকেরই অগ্নিবাণী ভারতের

আকাশে বাতাসে আলোড়ন তুলেছিল : তুম হামকো খুন্ দেও, হাম তুমকো আজাদী দুঙ্গা……

ঢাকা জেলের সিভিল ইয়ার্ডে শুয়ে শুয়ে কবিগুরুর অবিস্মরণীয় আহ্বান মনে পড়তে লাগলো, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে। ঝড়-বাদল দেখে যদি সবাই ভয়ে ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করে, তাহলে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল রে।

নিশানা বলে দেবার কেউ নেই, কাঁটা খুলে দেবার কেউ নেই, ছাতা দিয়ে আড়াল দেবার কেউ নেই। তবুও এগিয়ে যেতে হবে অনির্দ্দেশ পথে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন !……

চোদ্দ

পরদিন সকালেই তলব এল জেল গেট থেকে—আই বি এসেছেন দেখা করতে।

প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এসেছে সংঘর্ষের আহ্বান। এবার আসরে নামতে হবে।

গেট-এ প্রবেশ করেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল স্বয়ং গ্র্যাসবি সাহেবের সঙ্গে। বোধহয় আমার অপেক্ষাই করছিলেন।

Hallo Mr. Ganguly, now you are caught in the trap. There is no way out now, do you understand ?

আণ্ডারস্ট্যাণ্ড সবই করতে পারছি, কিন্তু পাল্টা আণ্ডারস্ট্যাণ্ড না করাতে পারলে কী আর শিখলাম এতকাল ?...বললাম : I don't know what do you mean by this.

মৃদু হাস্য করলেন গ্র্যাসবি সাহেব। একটু দূরে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন যে, তাঁর যা বলবার, তা সবই আমায় বলবেন ইনসপেক্টার বিভূতি সাহা। উত্তরে আমার যা বক্তব্য, তা ওঁকে বলে দিলেই তিনি জানতে পারবেন।

দেখলাম, গ্র্যাসবির বেল্ট-এর দু'পাশে কালো ফিতেয় ঝোলানো দুটি রিভলভার। খাপে ঢাকা নয়, একেবারে খোলা। প্রয়োজন হলে যাতে একটি সেকেণ্ডও দেরী না হয়ে যায়। আর বেশ উল্লসিত মনে হলো ওঁকে। হবারই কথা। ওঁদের আয়োজনের মরা গাঙে এসেছে জোয়ার, পালে লেগেছে হাওয়া, এবার জয়যাত্রা করবে সপ্তডিঙ্গা মধুকর !......

প্রকাণ্ড গেট খুলে গেল, গটগট করে গ্র্যাসবি বেরিয়ে গেলেন। এগিয়ে এলেন বিভূতি সাহা।

চলুন, সুপারের ঘরে গিয়ে বসিগে আমরা। নিরালায় কথা কওয়া যাবে'খন।

তারপর কথা শুরু হলো।

বিভূতি সাহা বললেন : গিয়েছিলেম মশাই, আপনাদের বাড়ীতে সার্চ্চ করতে। দেখলাম আপনার ঘরখানা, আপনার বইয়ের প্রকাণ্ড আলমারিটা।

উঃ, কী চমৎকার কলেকশন আপনার। বিশ্বের সেরা সেরা বই সব সংগ্রহ করেছেন। পড়েও ফেলেছেন সব নিশ্চয়ই ?

ঘাড় নাড়লাম। বলতে লাগলেন সাহা: সত্যি, বিদ্যা ও জ্ঞানের জাহাজ আপনারা। আর কী পপুলার আপনি, তাও টের পেলাম আপনাদের গ্রামের অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে। দেখলাম, ওদিকের কোনো কাজই আপনাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। নাটকে আপনিই নায়ক, খেলাধুলায় আপনিই ক্যাপ্টেন, লেখাপড়ায় আবার আপনিই ক্লাসের ফার্স্ট বয়, স্বেচ্ছাসেবকদলের আপনিই জি ও সি। জানতে পারলাম গ্রামের প্রত্যেকটি ব্যাপারে, প্রত্যেকটি কাজে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয় না। কতখানি যে ভালোবাসে ও ভক্তি করে আপনাকে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, গ্রামের বুড়োরা, গ্রামের যুবকেরা তারও পরিচয় পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি দ্বিজেনবাবু, আপনাকে না দেখেও সেই থেকে মনে মনে আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। গ্রামের, সমাজের, দেশের কল্যাণের জন্য আপনারই মতো নিঃস্বার্থ, কর্ম্মঠ ও জনপ্রিয় কর্ম্মীর আবশ্যক আছে।

এমনি ওজস্বিনী ভাষায় অবতরণিকার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে আদৌ দেরী হলো না আমার। বহুবার শুনেছি এঁদের মুখে। মোসাহেবী চাটুবাক্যের মধ্য দিয়ে এঁরা সহজেই এগিয়ে আসেন কাছে। তারপর সীমাহীন প্রশংসার মবিল অয়েল দিয়ে জাহান্নামে তলিয়ে যাবার পথটি বেশ পিছল করে দেন। তারপর আর কী ? একটুখানি ঠেলে দিলেই ব্যস, একেবারে স্যাওড়া গাছ থেকে সড়াক করে নেমে আসার মতো সড় সড় করে নেমে যেতে হয় অধঃপতনের উৎরাই পথে। তারপরই শোনা যায় ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষীর কথা, মহামান্য ভারতেশ্বরের ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোতা পাখীর মতো সহকর্ম্মীদের তালিকা আওড়ে যান।···কিন্তু সবে ঢাকা শহরে এসেছেন বিভূতি সাহা, এখনও সম্যক্ মোলাকাত হয়নি আমার সঙ্গে, খড়্গো খড়্গো ভীম পরিচয়ের পালা এখনও বাকী রয়েছে। যাঁরা চেনেন আমায়, তাঁরাও বোধহয় এঁকে সমঝে দেননি এখনও।

মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু বিভূতি সাহা তাঁর মামুলী প্রথায় সহস্রমুখে উচ্ছ্বাস দিয়ে, অনুপ্রাস দিয়ে, উপমা দিয়ে, উৎপ্রেক্ষা দিয়ে আমার গুণকীর্ত্তন করে, অবশেষে বুকভাঙ্গা একটি দীর্ঘশ্বাস ফোঁস করে ছেড়ে দিয়ে বললেন যে,

আমার মতো এমনি আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ যুবক দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারতো, যদি না ঐ চপলমতি গুণ্ডার দলে যোগ দিতাম। বললেন তিনি: দেশের স্বাধীনতা কে না চায় দ্বিজেনবাবু? ইংরেজকে কি আমরা ভালোবাসি? এই গোলামী কি আমাদের ভালো লাগে? কিন্তু ঐ বোমা-রিভলভারের পথে কি স্বাধীনতা আসতে পারে? স্বদেশী পরুন, তা হলেই এরা ভাতে মারা পড়বে ও দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

বললাম: আপনার নয়া থিওরি সম্বন্ধে একখানা থিসিস্ লিখুন না বিভূতিবাবু, যথাস্থানে পেশ করবো আমি।

থিসিস্!

তা ছাড়া কি! আপনাদের মতো চিন্তাশীল দেশহিতৈষী আর নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে দেখছি এবার দেশের আই বি-র দারোগা আর ইনসপেক্টারদেরই স্থান দিতে হবে। কিন্তু যাক্ সে কথা। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা নাকি শুরু হচ্ছে শীগ্‌গিরই। কীসের ষড়যন্ত্র জানতে পারি কি?

বিভূতি সাহা দরদী বন্ধুর মতো বললেন: আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই দ্বিজেনবাবু, কারণ আপনাকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসি বলেই আপনার জন্য দুঃখ হয়। আপনার মতো জিনিয়াস্—

এমনি জিনিয়াস্ ক্রাইম কিভাবে করতে পারে, এই তো আপনার বক্তব্য? কিন্তু কী যে ক্রাইম, তা জানতে পারলে তবে তো বলবো আমার যা বলবার আছে।—বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলাম সাহার পানে।

বড় সাহেবের আহ্বানে বড়বাবু যেমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে গিয়ে কাছাটি হারিয়ে ফেলেন, ঠিক তেমনি ক্রাইমের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বিভূতি সাহা আই বি জনোচিত স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে বলে ফেললেন: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা তো বলবোই। তাই বলবার জন্যই তো এসেছি আপনার কাছে। সবই জানতে পেরেছি কালাচাঁদ আর রঙ্গলালের কাছে। প্রত্যেকটি ঘটনা, আপনার প্রত্যেকটি কাজ। দেলভোগের হাট থেকে ব্যাপারীদের অনুসরণ করে কীভাবে আপনি ছেলেদের নিয়ে ডাকাতি করেছিলেন, তারপর হাঁসাড়া, মালখানগর প্রভৃতি গ্রামের স্কুল লাইব্রেরী ভেঙ্গে কীভাবে সব ন্যাশন্যাল বই চুরি করেছেন, দীনেশ গুপ্ত আর বিনয় বোস কেয়টখালীতে কতবার এসেছে···সব জানতে পারা গেছে ওদের মুখ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম : আর কিছু ?

আরও অনেক।—বলে সাহা এবার আবেগ ঢেলে দিলেন কথার সুরে : কিন্তু ওদের দু'জনকে তাই রেখেছি আলাদা করে ভালোভাবে। অন্যায় যে স্বীকার করে, তাকে আপনারাও ক্ষমা করে থাকেন। আর আমাদের আইনে তো আছেই।—কিন্তু আমার বক্তব্য—বক্তব্য নয়, অনুরোধ দ্বিজেনবাবু, আপনিও কেন সব জানিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান না! আপনার মতো ব্রিলিয়্যাণ্ট বয়কে যারা এই মারাত্মক পথে টেনে নিয়ে এসেছে, তাদের নামগুলো শুধু জানিয়ে দিন আমায়, I promise you honourable release. The jail-gate is open for you, my dear brother—আর সুবিধে হচ্ছে এই যে, পার্টির কেউ তো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না এ কথা। কিছু লিখে দিতে হবে না আপনাকে, শুধু নামগুলো, শুধু—

ভাবাবেগে সাহা একেবারে গদগদ হয়ে উঠছিলেন, তাই বাধা দিতে হলো : আপনি কতদিন এই আই বি-তে আছেন বিভূতিবাবু ?

দমে গেলেন তিনি কাঠখোট্টা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে, তবু জবাব দিলেন : ত' প্রায় বিশ বছর হবে।

ঢাকা এসেছেন কদ্দিন ?

তাও তো প্রায় বছর হতে চললো।

এবারে ক'টি মূল্যবান উপদেশ দিলাম সাহাকে : এক বছর হলেও আমার সঙ্গে এই আপনার প্রথম দেখা। কলকাতা এস বি-র মণি বোসের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়ে গেছে, এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বনবিহারীর সঙ্গেও। আপনার ঐ তোতা পাখীর বুলিই শুধু সেখানে শুনিনি, সেখানকার বয়লারে রীতিমতো রোস্ট হয়ে এসেছি। অর্থাৎ বয়লার-প্রুফ। বুঝলেন বিভূতিবাবু ?

কাষ্ঠহাসি হাসলেন বিভূতিবাবু। পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁতের পাটি, হাসতে গেলেই সেগুলো বেশ দেখা যায় আর চোখ দুটোও ছোট হয়ে আসে। কিন্তু কী বুঝলেন তিনি জানিনে। দেখা গেল, আর বাক্যজাল বিস্তারের অপচেষ্টা না করে এবার কাজের কথাই পাড়লেন : তাহলে দ্বিজেনবাবু, আপনার সঙ্গে যখন বনলো না, তখন আসল কথাটাই জানিয়ে দিই। আমরা শীগ্‌গিরই বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করছি আর আপনিই হবেন সে মামলার প্রধান আসামী। অর্থাৎ বাছা বাছা চোখা চোখা তীর রেডি করে রেখেছি আমরা, এবার ছাড়লেই হয়।

বললাম : ভালো কথা। আপনারা তীর ছাড়তে থাকুন, আমিও দেখি কোনো বর্ম্ম টর্ম্ম পাই কিনা। না পারি, শেষটায় শরশয্যা নোব আর আপনারও একটা প্রমোশন টমোশন—

আবার সেই চোখ-বুজে-আসা কাষ্ঠহাসি।

উপসংহারে জিজ্ঞেস করলেন বিভূতিবাবু : তাহলে কী বলবো আমাদের সাহেবকে দ্বিজেনবাবু ?

বলবেন দ্বিজেন গাঙ্গুলী এখনও সেই দ্বিজেন গাঙ্গুলীই আছে—he has not given up that abominable practice—আপনাদের সাহেবের ভাষাই বলে দিলাম বিভূতিবাবু !

সাহা চাকা-ভাঙ্গা ছ্যাকরা গাড়ীর মতো জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ফিরে এলাম সিভিল ইয়ার্ডে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শয্যায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে মনে হলো, রেজাক ঠিকই বলেছেন, রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে অন্যান্যের সঙ্গে না রেখে চল্লিশ ডিগ্রিতে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু দেলভোগ ডাকাতি আর স্কুলের বই চুরি সে তো অনেক দিন আগেকার ঘটনা। এতকাল পর আবার তার খোঁজ কেন ? এরা কিছু না বলে দিলে পুলিশের ধারণারই অতীত ছিল যে, কোনো বিপ্লবী দল এ কাজ করতে পারে। কিন্তু কেন স্বীকার করলো এরা ? আই বি অত্যাচার করেছে ? তা তো করবেই। ফাঁসির দড়িকে যারা গোখরো সাপ মনে করে না, মনে করে সম্বর্দ্ধনা-সভাকক্ষের দ্বারে প্রতীক্ষারত ভক্তের হাতের বেলফুলের মালা, এই তপশ্চর্য্যার সর্ব্বপ্রকার কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েই তো তারা পথে নেমেছে !

কারতার সিং বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞেস করলো পরিষ্কার বাংলায় : বাবুজী, আপনি বিড়ি খান নাকি ?

চমকে উঠলাম : কেন বলুন তো ?

দেখছি আপনার টেবিলের ওপর বিড়ির দু'-দুটো বাণ্ডিল পড়ে আছে, অথচ ভাত খাবার পরও আপনি বিড়ি খেলেন না ?

না, না, এই তো খাবো খাবো ভাবছি।—বলেই একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললাম এবং কারতার সিংকে অনুরোধ জানালাম : সিপাইজী, খাবেন একটা ?

প্রথমতঃ সিপাইজী, দ্বিতীয়তঃ খাবেন সম্বোধন, তারপর আবার ধূমপানের অনুরোধ, সুতরাং কারতার সিং সবিনয়ে হস্ত প্রসারিত করলো।

বিড়ি খেতে খেতে নানা গল্প ফেঁদে বসলাম। একথা সেকথার মধ্য দিয়ে একসময় সুযোগ বুঝে এসে পড়লাম ভাবাবেগ-সিঞ্চিত অধ্যায়ে···দেশকা লিয়ে যেসব মরদ জরু-লেড়কা ছেড়ে কাজে নেমেছে, দেশকা আদমী হিসেবে তাদের প্রতি কি আপকো কোনো কর্ত্তব্যই নেই? হোন না আপনি সিপাই, সরকারের নিমক খান, লেকেন দিলমে তো ওদের জন্য জরাসে দরদ থাকা চাই······তারপর হিন্দী-বাংলা সংমিশ্রণে আরও করুণ করে বিবৃত করলাম আমার কথা—ছোট্ট একখানা চিরকূট, সামান্য দু'-চার লাইন লেখা, কোনোক্রমে যদি—

কারতার সিং রাজী হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কী ভেবে বলে উঠলো: আচ্ছা দাঁড়ান, মৈনুদ্দীন মেট ঐ চল্লিশ ডিগ্রিতেই কাজ করে। ওকে দেখি পাই কিনা—বলে বেরিয়ে গেল সে।

এই অবসরে ফস্ ফস্ করে লিখে ফেললাম দু'লাইন পেন্সিল দিয়ে। একটু পরই ফিরে এল কারতার সিং। বললো: পাঁড়েজীকে বলে এসেছি। হাসপাতালে গেছে। ফিরবে এই পথ দিয়েই।

সিপাইজীকে আবার বিড়ি দিলাম।

যথাসময়ে এসে হাজির হলো মৈনুদ্দীন। ময়মনসিংহের মুসলমান। আকৃতিই তার ডাকাতের মতো। যেমনি দীর্ঘ দেহ, তেমনি প্রত্যেকটি পেশী যেন চর্ম্মের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দশ বছর সাজা হয়েছে প্রতিপক্ষ রেজা খাঁর নাবালিকা কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে। শুধু অত্যাচার নয়, অত্যাচারের ফলে মৃত বালিকাকে একেবারে মাটীর নীচে কবর দিয়ে রেখেছিল সে! সন্ধান আর পাওয়া যেত না যদি না ইদ্রিস একরারী হতো! বেশ অবলীলাক্রমে বলে গেল নিজের কীর্ত্তিকাহিনী। তারপর মৃদু হেসে হস্ত প্রসারিত করে যেই আমার সেই চিরকুটখানা মুঠোর মধ্যে পুরেছে, এমন সময় অকস্মাৎ অদূরে শোনা গেল: সরকাঠ্—শ্লাম। দেখা গেল রেজাক সাহেব সিভিল ইয়ার্ডে প্রবেশ করেছেন সদলবলে। কারতার সিং প্রমাদ গুণলেও মৈনুদ্দীন যেন তাঁদের দেখতেই পায়নি, এমনিভাবে পেছন ফিরে বলে উঠলো: তাহলে এক কাজ করি, কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে বলে কয়ে এখনকার মতো এক দাগ ওষুধ এনে দিই। ডাক্তারবাবু রাউণ্ড দিয়ে ফিরলেই নিয়ে আসবো'খন আপনার কাছে।

রেজাক আমার কক্ষে প্রবেশ করে বলে উঠলেন: অ্যাঁ, সে কি, ডাক্তার কেন? কী হলো আপনার দ্বিজেনবাবু?

অসুবিধে হলো না জবাব দিতে, কারণ মৈনুদ্দীনই তো পথ দেখিয়ে দিয়েছে। বললাম: খুব কনস্টিপেশন ধরেছে। রাত্রে বোধহয় একটু জ্বরও হয়েছিল। তাই—

রেজাক বলে উঠলেন: মৈনুদ্দীন, যা না, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় না। দেখেশুনে ওষুধ দেয়াই তো ভাল!

মৈনুদ্দীন কিছু বলবার পূর্ব্বেই বাধা দিলাম: এখনই আর না ডাকলেও চলবে। রেজাক সাহেব, একটু এ্যাগারয়েল নিয়ে আসুন। দেখি কী ফল হয়। না হলে কাল খবর দোব ডাক্তারবাবুকে।

আশ্বস্ত হয়ে রেজাক বেরিয়ে গেলেন। পেছনে মৈনুদ্দীন। রেজাককে হাসপাতালের দিকে পৌঁছে দিয়ে মৈনুদ্দীন ভালো মানুষটির মতো কোনোদিকে আর দৃকপাত না করে সোজা গিয়ে ঢুকলো চল্লিশ ডিগ্রিতে।

বিকেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় সত্যি সত্যি এক শিশি ওষুধ নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করলো মৈনুদ্দীন। এবার পাহারা কারতার সিং নয়, আকবর খান। নামজাদা কড়া লোক। ডেটিনু বাবুলোগকা ঘরের ভেতর আসামীলোগ যে ঘুসতে পারে না, এই কানুন তার কণ্ঠস্থ। তাই এসে দাঁড়ালো মৈনুদ্দীনের পাশে।

বিরক্তি বোধ হলো। বললাম: শিশিটা টেবিলের ওপর রেখে যাও।

মৈনুদ্দীন তাতে রাজী নয়। সে বললো: না বাবু, ডাক্তারবাবু এখনই এক দাগ খেয়ে ফেলতে বললেন।

তবু বললাম: খাবো'খন, রেখে দাও।

সে নাছোড়বান্দা: তা হবে না বাবু, ঠিক ঘুমিয়ে পড়বেন। আর খাওয়া হবে না। ডাক্তারবাবু বার বার বলে দিয়েছেন—

আকবর খান ধমক দিল: লে শালা, আর দিক করিসনে। বাবুকো নিদ যানে দে। চল্—

সিপাইজী, আপ কেয়া বলতা হ্যায়—বলে মৈনুদ্দীন বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, বেমারী খুব খটখটিয়া আছে। দাওয়াই এখনই দরকার।

ওর জিদ দেখে সন্দেহ হলো। তাহলে কি জবাব এনেছে কিছু?…উঠে বসলাম। মৈনুদ্দীন শিশিটি আমার হাতে দেবার সময় কৌশলে আমার হাতের

মধ্যে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল। বললো: ওহো, ওষুধের গ্লাসটা তো আনতে ভুলে গেছি। নিয়ে আসছি, দাঁড়ান।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকবর খানও বারান্দায় এসে আবার পায়চারি শুরু করলো। মলত্যাগের ভান করে আমি পায়খানায় গিয়ে প্রবেশ করলাম মগভর্ত্তি জল নিয়ে। সেখানে বসে টুকরো কাগজটি খুলে দেখি পেন্সিলে লেখা রঙ্গলালের পত্র:

তোমার চিঠি পেলাম। ছোটকোনদের সঙ্গে আমার রাগারাগি হয়ে যাওয়াতেই আমি ওদের নাম বলে দিয়েছি। দেখা হলে সব বলবো। কিন্তু বিভূতি সাহা তো বলেছিল তোমায় এতে জড়াবে না। কিন্তু এ কি মতলব পুলিশের?

এখন কি করলে ভালো হয় পত্রপাঠ জানিও। কালাচাঁদকে তোমার চিঠি দেখিয়েছি। সেও তোমার পরামর্শ চায়। ইতি

রঙ্গু

সে কি! ছোটকোন অর্থাৎ বিপদভঞ্জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের জন্য পুলিশকে সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে? কেন কেশিয়াড়ীতে আমার কাছে সব লিখে জানানো হয়নি? ব্যক্তিগত মতভেদের মধ্যে আই বি-কে কেন ডাকা হলো? এমনিভাবে গোখরো সাপের ল্যাজ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মূঢ়তা কেন? কে সামলাবে এই বিপদের ঝক্কি? এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবার পথ কোথায়? কে বলে দেবে পথের সন্ধান?···এমনি অনেক প্রশ্ন জাগলো মনে, অনেক জিজ্ঞাসা, যার জবাব পেলাম না খুঁজে। শুধু অন্তরে অন্তরে জানলাম যে, ঐক্যতান শেষ হয়ে গেছে, যবনিকা সরে গেছে, সহস্র দর্শকের অপলক চক্ষু উদগ্রীব হয়ে পড়ছে, এবার আসরে নামতে হবে। 'রণং দেহি' হুঙ্কার ছেড়ে আহ্বান জানিয়েছে প্রতিপক্ষ, এবার শুরু হবে ক্ষুরধার বুদ্ধির রক্তহীন সংগ্রাম—বাংলা সরকারের সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ বনাম দ্বিজেন গাঙ্গুলী —one against thousands······

পনেরো

আই বি পুলিশের সঙ্গে জেল পুলিশের তফাত অনেক। আই বি পুলিশ প্রচ্ছন্ন, রহস্যময়, তাই অনেক সময় দুর্জ্ঞেয়, আর জেল পুলিশ যেন সর্ব্বদাই দুপুরের রোদের মতো স্পষ্ট, অত্যন্ত বেশী প্রকট, তাই স্থূল। শত্রুপক্ষের দুর্গজয়ের সংকল্প নিয়ে আই বি এগিয়ে আসে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে, পেছনের দেয়ালে গিয়ে গুপ্তদ্বারের বোতাম খুঁজতে থাকে আর জেল পুলিশের লরী আসে ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ীর মতো ঘণ্টা বাজিয়ে, পথ কাঁপিয়ে, বুক কাঁপিয়ে সিংহদ্বারের সমুখে এসে রুখে দাঁড়ায় সিংহের মতো। আই বি অনেক সময় কিল চুরি করে কিল ফিরিয়ে দেবার জন্যই, কিন্তু জেলের ইতিহাসে এক পা পেছিয়ে যাওয়ায় অবমাননা নেই। জলের নীচে নীচে এসে আই বি যখন হাঙরের মতো টুক্ করে পা কেটে নিয়ে সরে পড়ে, মাথার ওপর তখন জেলের পুলিশ বজ্র হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। আই বি-র গুপ্তচরেরা যখন মাটির নীচে নেমে চোরাবালি রচনা করে, জেলের অক্ষৌহিণী তখন পথের বাঁকে বাঁকে কাঁটা তারের বেড়া দেয়। আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখে আই বি সাদা পোশাকের নীচে আর জেল পুলিশের কাঁধে শোভা পায় মিলিটারী রাইফেল। ইঙ্গিতের মতোই আই বি অস্পষ্ট, ভবিষ্যতের মতোই অজানা। আর জেলের পুলিশ নির্লজ্জ বন্য শূকরের মতো, লোহার শিকে শিকে তার পালিশহীন বুদ্ধির স্থূলতা!

অনেক বুদ্ধি ব্যয় করে আই বি যখন পরামর্শ দিয়ে গেল আমায় সহ-আসামীদের থেকে পৃথক্ রাখতে, জেল পুলিশের ভ্যানিটিতে তখন ঘা লাগলো। জেল সুপার লিওনার্ড সাহেব তখন হোম-এ চলে গেছেন দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে, সুপার হয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিনটেনডেন্ট এস. এল. পাটনী। আর জেলার সুধীন মুখার্জ্জী। সে যুগে এই পাঞ্জাবী সুপারটি বেশ সুনাম কিনেছিলেন যেমন বৃটিশ প্রভুর কাছে, তেমনি বিপ্লবী কয়েদী ও রাজবন্দীদের কাছেও। জেলের কোনো বিধি লঙ্ঘন যেমন বরদাস্ত করতেন না তিনি, তেমনি নেপালী দারোয়ানের মতোও উৎকট প্রভুভক্ত ছিলেন না। আমার সুবিধে হলো সেইখানেই।

রঙ্গলালের সঙ্গে তখন বার কয়েক পত্রের আদানপ্রদান হয়ে গেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে আদালতে যথাসময়ে ইঙ্গিত করলেই কালাচাঁদ ও সে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেবে। লেবং মামলায় দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুশীল চক্রবর্ত্তীও ছিল তখন চল্লিশ ডিগ্রিতে। তাকেও সংবাদ পাঠিয়েছি মৈনুদ্দীন মারফত; সেও সংবাদ পাঠিয়েছে, আমায় পর্য্যন্ত মামলায় জড়িয়ে ফেলায় আত্মগ্লানিতে রঙ্গলাল ও কালাচাঁদ মর্ম্মাহত। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে উন্মুখ তারা।

এমন সময় একদিন পাটনীকে নিবেদন করলাম যুক্তি দিয়ে যে, আমাদের মামলা যখন একই, তখন সব আসামীকেই এক জায়গায় রাখা উচিত। কারণ মামলা পরিচালনা সম্বন্ধে আমাদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দরকার, কোথায় টাকা, কম টাকায় কোথায় পাওয়া যাবে ভালো আইনজীবী, রাজনৈতিক মামলায় কার অভিজ্ঞতা বেশী—এমনি আরও কত প্রশ্নের মীমাংসা করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পাটনী বললেন, যুক্তি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন বটে, কিন্তু প্রথমতঃ, মামলা এখনও শুরু হয়নি; দ্বিতীয়তঃ, আই বি-র হুকুম নেই।

চট্ করে প্রশ্ন করলাম: আই বি-র হুকুম নেই, মানে? জেল সুপার কি আই বি-র হুকুমে ওঠে বসে? জেলের মধ্যেও কি আই বি-র রাজত্ব? এখানেও গ্র্যাসবি—

এবার বোধহয় পাঞ্জাবীর পৌরুষে ঘা পড়লো। বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও প্রভুভক্তিতে যিনি প্রায় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ফেলেছেন, বাংলার কারাসমূহের ইনসপেক্টার জেনারেলের গদীতে উপবেশনের জন্য যাঁর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে, একটি জেলার আই বি-দের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করবার কাজ করতে হবে তাঁকে বোবা যন্ত্রের মতো? বিশেষ করে জেলের অভ্যন্তরে, যেখানকার হিটলার তিনি?…ল্যাজে ঘা খেয়ে পৌরুষ তাঁর অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করে উঠছিল অজগরের মতো, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, লোকটা যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদী মানেই কতকটা মাটির মানুষ, সজ্জন, অথচ দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বাধা দিয়ে বললেন: না, না, জেলের মধ্যে গ্র্যাসবির হুকুম অচল। তোমার কথাও খুব যুক্তিপূর্ণ বটে। Let me see what can be done……

পাশেই ছিলেন মন্ত্রী সুধীন মুখার্জ্জী। মৃদু হাসির আভা দেখতে পাওয়া গেল

তাঁর গোঁফের নীচে। খুদে চোখদুটিতে কিন্তু তাচ্ছিল্যের আভাস। অর্থাৎ, যতই যুক্তি দেখাও, অফিসে গেলেই আমি সব উলটে দোব!

বেরিয়ে গেলেন পাটনী সদলবলে রাজছত্র মাথায় দিয়ে। কিন্তু বোধহয় হুজুরের মনোভাব আন্দাজেই আঁচ করে নিয়ে একদিন আদালতে নিয়ে যাবার সময় জেল অফিসে আমাদের সবাইকেই এক জায়গায় জড়ো করা হলো এবং আশ্চর্য্য যে, একই কয়েদী গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হলো অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। বোধহয় জেলার আর বিষ ঢালেননি সুপারের কানে। কিংবা ভুলে গেছেন ঢালতে। এ নিয়ে-যাওয়া ও নিয়ে-আসা কিন্তু একেবারেই নিয়ম পালন ও আইন-রক্ষা। আমাদের গ্রেপ্তারের মূলে রয়েছে আই বি। দু'জনের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীনগর থানায়। এবার আইন মাফিক মামলা সাজানোর ভার থানার ওপর।

কিন্তু আমাদের এই মামলা সাজানো বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রায় দেড় বছর পূর্ব্বেকার ঘটনা। ফরিয়াদী, অর্থাৎ দেলভোগ হাটের গরুর ব্যাপারীরা থানায় ডায়েরী করিয়েছিল যে, জনকতক লুঙ্গি-পরা মুসলমান তাদের আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কাউকেও চিনতে পারেনি তারা। অকুস্থলে পুলিশ তদন্তে পাওয়া গিয়েছিল একখানা গরু চরাবার পাচনবাড়ি আর একখানা সবুজ রংয়ের পেস্টবোর্ডে তৈরী ছোরার খাপ। থানার মালখানায় তা-ই যথারীতি জমা হয়ে গেল এবং ছ'মাস পর কোনো কিনারা করতে না পারায় অবশেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে যথারীতি সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শ্রীনগর থানার বড়বাবু দেলভোগের গণিকাপাড়ায় সে রাত্রে যে একদল বিদেশী এসে চম্পকরাণীর গৃহ আহারে, পানে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে সরগরম করে তুলেছিল, তাদের হাজতে পুরে ও মাস দুয়েক পর সগর্ব্বে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করে ফেলেছিলেন। দেড় বছর পর শুধু দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে এক হাত দেখিয়ে দেবার জন্যই আই বি কবর খুঁড়ে এই কঙ্কাল বার করেছে। এবার তাতে মাংস দিয়ে, শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্ক দিয়ে, তার নিশ্চিহ্ন হৃদপিণ্ডে ধকধকানি জুড়ে দিয়ে মিশরের মমীকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে!···

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন ছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, মিঃ জেঙ্কিন্স্। খাস বিলিতী সাহেব। হোম থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন বাংলা দেশের চপলমতি বালক বালিকাদের সায়েস্তা করে ইংলণ্ড-মাতার রাজত্ব অটুট রাখবার

মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে। বালক বালিকারা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অভদ্র বলে এবং যখন তখন গুলী-খাওয়া বাঘের মতো শিকারীর স্কন্ধে লাফিয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় শক্ত লোহার জাল দিয়ে ঘেরা তাঁর এজলাস, ঘেরা আসামীর কাঠগড়া এবং সাক্ষীরও।

হুড়হুড় করে আমাদের দশ-বারোজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আসামীর খাঁচায়। আর উলটো দিকে সাক্ষীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কাঠগড়ায় এনে হাজির করা হলো রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। মামলা হবে না, তাই কক্ষে উকিল মোক্তারের ভিড় নেই, আমাদের জন্য কোনো উকীলও তখন দেয়া হয়নি। বাংলাদেশে এমনি রাজনৈতিক মামলা হামেশাই হয়ে থাকে, তাই আমাদের জন্য বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও একে একে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু কোথায় আমাদের প্রতিপক্ষ, শ্রীনগর থানার দারোগা খগেন রায়? খাঁচায় আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম এক পাল মেষের মতো, যেন পুরোহিত খগেন্দ্র রায় দেবশর্ম্মা ফুলবেলপাতা নিয়ে এসেই আমাদের স্কন্ধে বেখা এঁকে মন্ত্রোচ্চারণ করে উৎসর্গ করে দেবেন বৃটিশ মা কালীর পায়ে!···

জেঙ্কিন্‌স্‌এর সম্মুখে এক-একখানা করে দরখাস্ত এগিয়ে দিতে লাগলেন পেশকার, দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে সাহেব তার কোণে অর্ডার লিখে দিতে লাগলেন। এমনিভাবে প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল। দরখাস্তের বাণ্ডিল শেষ হয়েছে, এবার আমাদের পালা।

জেঙ্কিন্‌স্‌ বাব বার চাইছেন পেশকারের পানে, পেশকার চাইছেন কোর্ট ইনসপেক্টারের পানে, ইনসপেক্টার চাইছেন অবিনাশ দারোগার পানে আর অবিনাশ বার বার বারান্দায় এসে দৃষ্টিক্ষেপ করছেন পথের পানে—কোথায় শ্রীখগেন রায়? খাঁচার মেষগুলো বৃটিশ মা কালীর পায়ে আত্মবলিদানের জন্য যে চুলবুল করছে, তারা যে গলা বাড়িয়ে রয়েছে, জল্লাদ জেঙ্কিন্‌স্‌ তাঁর কলমের খড়্গ হাতে করে যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন, কোথায় স্বনামধন্য পুরোহিতপ্রবর খগেন্দ্র রায় দেবশর্ম্মা? পুজোর লগ্ন যে বয়ে যায়!······সত্যি, আমরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছি। পূর্ব্ব ব্যবস্থামতো রঙ্গলাল আমার পানে চাইলো, আমি ইশারায় বারণ করে দিলাম অর্থাৎ ওদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবার সময় এখনো আসেনি।

বেশ একটু পর ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন বহু প্রত্যাশিত খগেন রায়। বগলের কাগজপত্র ও ফাইলগুলো ঝপ্ করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে দু'খানা ঝপাৎ করে মেঝেয় পড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে চাইবার তাঁর অবসর কোথায়? এবার চাণক্যের সম্মুখে হাজির করা হয়েছে বৃটিশ মহারাজার শ্যালক বাচাল খগেন রায়কে। স্যার স্যার করে তোতলাতে তোতলাতে কম্পিত কলেবরে তিনি যথাবিহিত সম্মানপুবঃসর যা নিবেদন করলেন, তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, প্রায় শেষ করে এনেছেন তদন্ত, আর দু' সপ্তাহ সময় পেলেই তিনি অভিযোগপত্র পেশ করবেন চুরি, ডাকাতি, ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা সংক্রান্ত বাছা বাছা ধারা অনুযায়ী। অতএব—

অকস্মাৎ আমি সহাস্যে নিবেদন করলাম ম্যাজিস্ট্রেটকে: জামিন অবশ্য আমরা চাই না, কারণ জেলের মধ্যে ভালোই আছি। আই বি টিকটিকিদের উৎপাত নেই। কিন্তু শ্রীনগবের মতো বিখ্যাত থানার ভারপ্রাপ্ত ততোধিক বিখ্যাত দারোগা খগেন রায় কি জানেন না যে, আদালতে আসতে হলে মাথার টুপিটা সোজা করে পরে আসতে হয়, নইলে আদালতেব অবমাননা—

খগেন রায় ঝটিতি টুপিটা ঘুরিয়ে পবে ফেললেন, সহ-আসামীরা সবাই হেসে উঠলো, অবিনাশ দারোগা হাসি চাপতে না পেরে বারান্দায় পালিয়ে গেলেন, স্বয়ং বিচারক জেঙ্কিন্‌সের মুখমণ্ডলের প্রস্তরফলকে হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

কয়েদী গাড়ীতে জেলে ফিরে আসবার সময় হলো আলোচনা। মনোমালিন্য শুরু হয় রঙ্গলালের সঙ্গে ছোটকোনের। আমি মেদিনীপুব চলে যাবার পর সর্ব্বকার্য্যের নেতৃত্ব থাকবে কাব হাতে, তাই নিয়ে হলো মতভেদ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিপ্লবী দলে প্রস্তাব পাশ কবে লীডার নির্ব্বাচন হয় না। মনোনয়নের সুযোগ নেই সেখানে। সুকঠিন কাজেব মধ্য দিয়ে সেখানে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, নেতা সৃষ্টি হয়। এবা ছেলেমানুষ। তাই ঠোকাঠুকি লেগে গেল। ক্রমে ক্রমে তা এমনি তীব্র হয়ে দাঁড়ালো যে, একে অপরকে যে কোনো প্রকারে জব্দ করবার ফিকির খুঁজতে লাগলো। একদলের নেতা রঙ্গলাল, আর এক দলের মুখপাত্র ছোটকোন অর্থাৎ বিপদভঞ্জন। দলে-ভারী বিপদভঞ্জনের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে রঙ্গলাল ঢাকায় এসে দেখা করলো আই বি ইনসপেক্টার বিভূতি সাহার সঙ্গে। পাইথন যেমন করে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ছাগশিশুকে, তেমনি করে বিভূতি সাহা লুফে নিলেন রঙ্গলালকে ও ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে ফেললেন তাকে।

কালাচাঁদ এসে রঙ্গলালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নেহাত পুলিশের মারের চোটে আর গ্র্যাসবি সাহেব-প্রদত্ত আর্থিক প্রতিশ্রুতির লোভে।

উল্টোপাল্টা অনেক কথাই বলেছে ওরা দু'জন। তাই গ্রেপ্তারও হয়েছে জন দশ-বারো। তার মধ্যে সুবোধ চক্রবর্ত্তীও আছে, নেপালও আছে, মণীন্দ্রও আছে, আর আছে আমাদের গ্রামের ক'জন।

কিন্তু দু'লের কেউ ভাবতেই পারেনি যে, আই বি আমাকেও ফিরিয়ে এনে এদের দলে ভিড়িয়ে দেবে এবং শুধু ভিড়িয়ে দেবে নয়, পুরোভাগে এগিয়ে দেবে। আমি আসাতেই এদের টনক নড়ে গেছে। আমায় জেল থেকে রক্ষা করবার জন্য এরা এখন যে-কোনোও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত বলে সবাই একবাক্যে ঘোষণা করলো।

আমাদের প্রত্যেকের পরিবারে সাড়া পড়ে গেছে। জেলে গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে রয়েছি আমরা, আর জেলের বাইরে থেকে তাঁদের নিদ্রা নেই, আহার নেই। দুশ্চিন্তায় তাঁরা যে একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছেন !······

একদিন ফুলদা' এসে দেখা করে জানিয়ে গেলেন যে, উকিল রজনী দাস আমাদের পক্ষে দাঁড়াবেন আর যদি ঢাকাতেই মামলা শুরু হয়, তাহলে স্বয়ং শ্রীশ চাটার্জ্জীকে পাওয়া যাবে। মুন্সীগঞ্জে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। রজনী দাস আমার সঙ্গে একদিন দেখা করে গেলেন। আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আই বি উপস্থিত থাকবার নিয়ম নেই। রাজসাক্ষী দু'জনই যে তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবে, এই সুসংবাদ শুনে বললেন: আপনি যদি তাই করে দিতে পারেন দ্বিজেনবাবু, তাহলে মামলা আমি তচনচ করে দেবই।

প্রশ্ন করলাম: ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি কি আইনতঃ প্রত্যাহার করা যায়?

জবাব দিলেন রজনী দাস: সাধারণ আইনে প্রত্যাহার করলেও অবশ্য তার ফলাফল থেকে নিষ্কৃতি নেই সত্যি, কিন্তু সে কাজের ভারটা থাক না আমার ওপর। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, কালাচাঁদ আর রঙ্গলাল যদি যথাসময়ে তাদের কন্‌ফেশন প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে আপনাদের আটকে রাখতে হলে অনেক তেল-নুন খরচা করতে হবে আই বি-র। এত সহজে চিঁড়ে ভিজবে না।—তারপর হেসে বললেন: দেশবন্ধুর তামাক বৃথাই সাজিনি দ্বিজেনবাবু!

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্য তামাক অবশ্য উনি সেজে দেননি, তথাপি তাঁর

জুনিয়র হিসেবে অনেকগুলো রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেছেন রজনী দাস। চেহারা একেবারেই বিশ্রী। যেমন কালো রং, তেমনি বেঁটে ও রোগা! কিন্তু চশমার ওপর দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়েই সাপের মতো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকান সাক্ষীর চোখের পানে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠের যুক্তিপূর্ণ সওয়াল আদালতকক্ষের দেয়ালে ঘা খেয়ে খেয়ে বিচারকের মনেও প্রতিধ্বনি তোলে। শুনেছি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করবার যাদুই-কা-খেল্ তাঁর আয়ত্তে। প্রতিপক্ষের কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে যে তিনি সরু একটি বিষাক্ত সূঁচ দুই পাঁজরার মধ্যে দিয়ে খচ্ করে চালিয়ে দিয়ে তার ফুসফুস ফুটো করে দেবেন, কেউ তার হদিস পায় না। দধীচির মতো মরা হাড়ে ভেলকি খেলে শুনেছি। ঢাকা শহরের নামজাদা উকিল রজনী দাস।

সুবিধে হলো। পাটনীকে আবার একদিন ধরে বসলাম: স্যার, আমাদের মামলা পরিচালনার জন্য উকিল নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সবাই এক জায়গায় বসে পরামর্শ না করে নিলে সাফাইয়ের যুক্তি খাড়া করা যাবে কীভাবে? আমাদের আইনগত অধিকার—

এবার পাটনী জল হয়ে গেলেন। আইনগত অধিকার খর্ব করতে রাজী নন তিনি। তৎক্ষণাৎ আমাদের সবাইকে পাগলা গারদে একটি বৃহৎ কক্ষে একসঙ্গে রাখবার হুকুম দিয়ে গেলেন। সুধীন মুখার্জ্জী সাথেই ছিলেন। পাটনী এবার যখন আর তাঁর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না, তখনই বুঝতে পারলাম, জেলারের পাটোয়ারী পরামর্শ সুপার এবার আর কানে তোলেননি। লিওনার্ড কিন্তু ছিলেন একেবারে সুধীন মুখার্জ্জীর হাতের পুতুলটি। বসিয়ে রাখলে বসতেন, শুইয়ে দিলে শুতেন। এমন কি, বোধহয় সুধীন মুখার্জ্জী পেটে চাপ দিলে সেই পুতুলের ভেতর থেকে প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ বেরুতো!......

সুধীন মুখার্জ্জী মানে ঢাকা জেল আর ঢাকা জেল মানেই সুধীন মুখার্জ্জী। কথা তিনি খুব কম বলেন কিন্তু কাজ করেন প্রচুর। শুধু প্রচুরই-বা বলি কেন, ঢাকা জেলের প্রত্যেকটি কাজ তিনিই করেন বলা যেতে পারে। সাধারণ বন্দীদের অপেক্ষা রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধেই তাঁর পারদর্শিতা অতুলনীয়। জেলের বাইরে বিরাট সবজি বাগান, জেলের মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রচুর সবজির চাষ হয়ে থাকে। বিশেষ করে জেলের অভ্যন্তরে পাগলা গারদ এলাকায়। এককালে

নাকি বাংলা দেশের মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগাক্রান্তদের সবাইকে ঢাকা জেলের এই পাগলা গারদে রাখা হতো। এখন সেদিকটায় প্রায়ই থাকেন রাজনৈতিক বন্দী। সেখানে শীতকালে আলু, শালগম, ওলকপি, বাঁধাকপি ও ফুলকপির চাষ হয়ে থাকে। অনেকগুলি লেবুগাছে অসংখ্য লেবু হয়। কিন্তু আপনি যদি ভুলেও কখনো সেই লেবুতে হাত দেন, সেই আলু, শালগম ও কপির ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহলে জানবেন সেই দুঃসংবাদ সুধীন মুখার্জ্জীর কানে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যাবে। ফলে, পরদিনই আপনি স্থানান্তরিত হবেন ৬ নম্বর ডিগ্রির অত্যন্ত অপরিসর ইয়ার্ডে।

কিন্তু তাই বলে কি জেলের সবজিতে আপনার কোনো অধিকার নেই? অবশ্যই আছে। সুধীন মুখার্জ্জী বলেন, আপনাদের খাবার জন্যই তো এত পরিশ্রম! এ সবই আপনাদের। সুতরাং ফাল্গুন মাস পড়তে-না-পড়তেই আপনারা তরকারিতে দু'চার টুকরো ফুলকপির সন্ধান অবশ্যই পাবেন এবং ভালো করে অনুসন্ধান করলে চৈত্রের শেষাশেষি আপনার তরকারিতে বাঁধাকপির পাতা অবশ্যই মিলবে। বৈশাখের দাবদাহে উত্যক্ত হয়ে যদি তরকারির ওপরতলার ময়লা জলটুকু ফেলে দিয়ে নীচের তলায় তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালান, তাহলে সেই স্থলভাগের নীচে মিললেও মিলতে পারে শালগম বা ওলকপির টুকরো। সুধীন মুখার্জ্জীর রাজত্বে ও দৌলতে রাজনৈতিক বন্দীগণ রীতিমতো কলকাতার ধনী লোকের মতো অদিনে ও অসময়ে অনেক উপাদেয় সবজি পেয়ে থাকেন!

এই ভুরিভোজনের বিরুদ্ধে যদি কোনোদিন কোনো প্রতিবাদ জানান একেবারে স্বয়ং লিওনার্ডের কাছে, তাহলে লিওনার্ড নীরবে তাকাবেন সুধীন মুখার্জ্জীর পানে আর সুধীন মুখার্জ্জী নীরবে আপনার পানে চেয়ে গোঁফের নীচে একটি মুচকি হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলবেন। ফলাফল জানা যাবে ওঁদের প্রস্থানের পরমুহূর্ত্তেই। হয় স্থানান্তরিত হলেন বিশ ডিগ্রিতে কিংবা কপালে শাস্তি জুটলো চারদিন শুধু মাড়-ভাত!……

অবশ্য, বিনা বিচারে সুধীন মুখার্জ্জীর জেলে কারুর শাস্তি হয় না। কোনো জেলেই হয় না। হতে পারে না। বৃটিশ গভর্নমেন্টের আদালতে অভিযুক্ত আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অবশ্যই সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে থাকে।

জেলের অভ্যন্তরের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে যে আদালতে আপনার বিচার হবে, তাকে বলা হয় কেস্ টেবিল্। প্রতিদিন সকালবেলা সুপারিনটেনডেন্ট একবার সেই টেবিলে এসে বসেন। সদ্য-দণ্ডিত কয়েদী ও সদ্য জেলে আগত বিচারাধীন আসামী সবাইকে একে একে হাজির করা হবে, সুপার তাদের দেখে একখানা বিরাটাকার খতিয়ানে স্বাক্ষর করবেন।

এসব কাজ হয়ে গেলেই আপনার মামলা উঠবে। কোর্ট ইনসপেক্টার অথবা পাবলিক প্রসিকিউটররূপে এগিয়ে আসবেন সুধীন মুখার্জ্জী। সরকার পক্ষে মামলার বিবরণ দেবার পর সরকারী সাক্ষী-টাক্ষীর প্রয়োজন হয় না জেলের বিচারে। তৎক্ষণাৎ চার্জ্জসীট গঠিত হয়ে যায়। কখনো-সখনো এক-আধজন সরকারী সাক্ষীকে খাড়া করেন সুধীন মুখার্জ্জী। হয় ওয়ার্ডার, নয় তো আসামী নাইট ওয়াচম্যান কিংবা কনভিক্ট ওভারশিয়ার, যারা নিরপেক্ষভাবে সুধীন মুখার্জ্জীর শিখিয়েদেয়া কথাগুলোই তোতাপাখীর মতো আউড়ে যায়।

চার্জ্জসীট গঠনের পর আসামীর বক্তব্য শোনার রীতি জেলের কাজীর বিচারে কোথাও নেই। তবু যদি অভিযোগ মিথ্যা বলে যদি আপনি প্রতিবাদ জানান, তাহলে আর কিছুই হবে না, শুধু সুধীন মুখার্জ্জী একবারটি তাঁর খুদে চোখদুটি আপনার ওপর স্থাপন করবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার দণ্ডের পরিমাণ ও কঠোরতা বেড়ে যাবে। এর পরও মরিয়া হয়ে যদি সাফাই সাক্ষীর কথা তোলেন এবং তাদের হাজির করবার জন্য জিদ প্রকাশ করেন, তাহলে সুধীন মুখার্জ্জীর খুদে চোখদুটি হাসির ঘায়ে এবার বন্ধ হয়ে আসবে এবং কে বলবে, হয়তো কাজী সুপার এবার মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করে বসবেন আপনাকে। মৃত্যুদণ্ড মানে বেত্রদণ্ড। আর সে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করবার কোনো দায়রা আদালত, হাইকোর্ট বা প্রিভি কাউন্সিল নেই।

সুধীন মুখার্জ্জীরসওয়াল একেবারে ভগবানের বাণী। কদাপি মিথ্যা বা পল্কা হতে পারে না।······

চল্লিশ ডিগ্রি থেকে দূরে সরে এলাম বটে, কিন্তু পেলাম সবাই একসঙ্গে থাকবার চমৎকার সুযোগ। তখন শীতকাল। বোধহয় ডিসেম্বর মাস। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চমৎকার ওলকপির ক্ষেত, দূরে আলুর। এতে জল দেবার ব্যবস্থাটি ভারী সুন্দর। গাছের সারির পাশ দিয়ে-দিয়ে এমনিভাবে নালি কাটা আছে যে, জল কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে না, ঐ নালি দিয়ে বয়ে চলে। একটি

সারি জলসিক্ত হয়ে যাবার পর তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে অপরটির খুলে দেওয়া হয়। বিরাটাকার ওলকপি। অথচ তা কয়েদীদের জন্য তোলা হয় না, তোলা হয় বাইরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য কিংবা হয়তো সুধীন মুখার্জীর বাড়ীর জন্য।

ভালোই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ভবিষ্যৎ একেবারে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ছেলেদের বৈপ্লবিক নীতি শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট জেঙ্কিন্‌সের আদালতে আর একদিনের ঘটনা বলছি।—

সেদিনও দু'দিকের খাঁচায় আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। অবিনাশ দারোগা সহাস্যে এগিয়ে এসে মিঠে স্বরে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। যথারীতি খগেন রায় দেরীতে এসে প্রবেশ করলেন হন্তদন্ত হয়ে, সবিনয়ে জানালেন যে, এবার স্যার তদন্ত শেষ করে ফেলেছি। শুধু মামলাটা যাতে মুন্সীগঞ্জে হয়, তার অনুমতির জন্য লেখা হয়েছে সরকারকে। সেটা এসে গেলেই স্যার—নইলে মামলা আমার রেডি স্যার···

জেঙ্কিন্‌স্ ভ্রূকুঞ্চিত করে মন্তব্য করলেন: But it is more than three months—

হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, তা স্যার, তা স্যার করে যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে এবার খগেন দারোগা নিজেই ছাগশিশুর মতো চিঁ চিঁ করে আর্তনাদ করতে লাগলেন: আর স্যার এক উইক, তার মধ্যেই আমি স্যার—

এমন সময় রঙ্গলাল আমার দিকে চাইতেই আমি ইশারায় জানিয়ে দিলাম যে, এখনো প্রত্যাহারের সময় আসেনি। কিন্তু রঙ্গলাল নিশ্চয়ই ভুল বুঝে ফেললো। একটু পর সে অকস্মাৎ জেঙ্কিন্‌স্‌কে বললো যে, তার কিছু বলবার আছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন জেঙ্কিন্‌স্: Yes! ···

রঙ্গলাল বললো: I want to speak in your chamber.

Gladly!—বলে জেঙ্কিন্‌স্ উঠে পড়লেন। আমিও প্রাণপণে ইশারা করে জানাতে চেষ্টা করলাম, এখনও নয়, এখনও নয়। দেখলাম রঙ্গলাল এবার বুঝতে পেরেছে এবং মৃদু হাস্যে অভয় দিচ্ছে। নিশ্চিন্ত হলাম। রঙ্গলালকে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় নিয়ে গেল, আমাদের নিয়ে চললো বারান্দায়।

বাইরে এসেই একেবারে মা'র সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। হ্যাঁ মা, স্বয়ং মা, আমার মা, আমার দুঃখিনী মা! আমাদের সবার মা!

একে একে সবাই দু'হাতে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম। প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরলেন মা ঝাপটে একেবারে বুকের সঙ্গে, ব্যথা-জর্জ্জর পঞ্জরের সঙ্গে···তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আজও স্পষ্ট, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে পড়ে তাঁর সেই শোকাকুল অন্তরাত্মার আর্ত্তনাদ। একে একে জড়িয়ে ধরছেন সবাইকে আর ক্রন্দন-ভাঙ্গা স্বরে বলছেন: কতবার বারণ করেছি তোদের, কতবার সাবধান করে দিয়েছি এসব করতে যাসনি, যাসনি। শুনিসনি আমার কথা, শুনিসনি কারুর কথা। এখন কী করবো বলতে পারিস? বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো কি? কিন্তু তবুও তো বাঁচানো যাবে না তোদের!

নেপাল আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট ও পাড়ার সবার চাইতে বড়লোক পিতার কনিষ্ঠ ও আদুরে পুত্র। তাকে বুকে টেনে নিয়ে মা বলে উঠলেন: এতটুকু ছেলে, সেদিনও তোকে প্যান্ট পরে থাকতে দেখেছি রে, তুইও এই দলে মিশেছিস?

বিপদভঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন: বল্ তো, কী বলে প্রবোধ দোব তোর মাকে? কী বলে বোঝাবো? আমি ফিরে গেলেই তো সব মায়েরা এসে জিজ্ঞেস করবেন, কেমন দেখলেন ওদের, দিদি! কী বলবো তাঁদের?—কী জবাব দোব?—ইস্, কী কালো হয়ে গেছিস! কতখানি শুকিয়ে গেছিস!—কেন রে, দুনিয়ায় আর কি ছেলে ছিল না?

এগিয়ে এলাম আমি। মা আবার আমায় জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন: এই হারামজাদাই যত অনিষ্টের গোড়া। তুই-ই নষ্ট করেছিস সবাইকে—

প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলাম প্রাণপণে: জানো না মা, জেলের মধ্যে খুব ভালো আছি আমরা। একসঙ্গে থাই, একই ঘরে গদী-আঁটা খাটে শুই। রীতিমতো ভালো খাওয়া, রোজ মাছ আর মাঝে মাঝে মাংস। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, খালি বই পড়ি আর গান করি। সবার মাকেই বলে দিও তুমি যে, আমরা ভালো আছি, বেশ ভালো। ওজন বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। আর মামলার কথা যা বললে না, তাহলে শোন—

কিন্তু আর শোনানো হলো না। ঠিক এই সময় ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরা

থেকে বেরিয়ে এল রঙ্গলাল আর কালাচাঁদ। অভিভূত মা যেন এদের দু'জনকে ভুলেই ছিলেন এতক্ষণ। এবার ছুটে এগিয়ে গেলেন এবং ওদেরকে ধরে প্রথমেই অত্যন্ত বেয়াড়া একটা প্রশ্ন করে বসলেন: তোরা দু'জন আবার আলাদা কেন রে?

দেখলাম, লজ্জায় ও ঘৃণায় রঙ্গলালের ফর্সা মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠেছে। অসহ্য আবেগে কাঁপছে তার নিশ্চুপ অধর, চোখ তুলে মার পানে চাইতে পারছে না সে।···আবার এগিয়ে গেলাম আমি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, বললাম: ওরা দু'জন ভুল করে ফেলেছিল, পুলিশকে বলে দিয়েছিল কিছু কথা। কিন্তু মা, সেজন্য ভেবো না তুমি, ওরা কথা প্রত্যাহার করবে বলে কথা দিয়েছে—

রাজসাক্ষীদের দু'জনকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। মাকে ঘিরে ছেলেরা সব দাঁড়িয়েছিলাম, অকস্মাৎ শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণ যাঁকে একেবারেই লক্ষ্য করিনি, লক্ষ্য করবার ফুরসতই পাওয়া যায়নি, তিনি হচ্ছেন আমার দূর সম্পর্কীয় কাকা মণিমোহন চক্রবর্ত্তী। সেই সুহাসিনীর বাবা, মণিমোহন কাকা। ঢাকা শহরের স্বনামধন্য মোক্তার এম. চক্রবর্ত্তী। আইনের অনেকগুলো দুর্ব্বোধ্য ধারা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে ঘড় ঘড় করে তিনি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই যে, আই বি-র দুয়ারে একবার ধর্ণা দিয়ে যখন কিছুতেই কিছু হলো না, তখন তিনি মাকে নিয়ে সোজা এসে হাজির হলেন একেবারে জেঙ্কিন্‌স্ সাহেবের আদালতে। এখানে ইন্টারভিউ এ্যালাউ করার কর্ত্তা আই বি নয়, ম্যাজিস্ট্রেট। অমুক ধারার অমুক উপধারার খ অধ্যায়ে বর্ণিত আইনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুঝলাম, মণিমোহন কাকা একটা বীরত্বের কাজ করে ফেলেছেন। আইনের জ্ঞান যে তাঁর কত গভীর, সে ধারণা আমার পূর্ব্বেও যেমন ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু তাঁর ছেদ ও যতিহীন অনর্গল বক্তৃতার মধ্য দিয়ে একটি স্বচ্ছ দরদী অন্তরের পরিচয় পেলাম। কৃতজ্ঞতা জানালাম মনে মনে।···

তারপর এলো বিদায়ের পালা। বারান্দার অপর প্রান্তে অবিনাশ দারোগার পুনরাবির্ভাব হওয়ায় বোঝা গেল আমাদের সময় উত্তীর্ণ। অতএব—

অতএব মণিমোহন কাকার পশ্চাতে মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। যন্ত্র-চালিত পুতুলের মতো আমরাও এসে উঠলাম ঢাকা অন্ধকার কয়েদী-গাড়ীতে।

পাশাপাশি বসলাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালা পড়লো। মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, গাড়ী চলছে।

চলছে তো চলছেই। পটুয়াটুলী, বাবুর বাজার, ইসলামপুর অতিক্রম করে চকবাজারের কাছাকাছি আসতেই ঝাঁকুনি লাগছে। রাস্তা খারাপ। একটু পরই তো জেলের ফটক। এতখানি পথ অতিক্রম করে এলাম একেবারে নীরবে। অনেক কথা বলেছি অন্য দিন, অনেক হেসেছি। আজ আর কেউ কথা কইলো না। কইতে পারলো না বুঝি। গলা বেয়ে কী যেন একটা ঠেলে ওপরে উঠছিল, বার বার চোখের কোণটা ভিজে-ভিজে উঠছিল…

—জেলের ফটক খুলে গেল। এবার নামতে হবে।

ষোল

খগেন রায়ের এক উইক শেষ হতেই আবার আমাদের আনা হলো জেলের বাইরে। আদালতে সোজা না নিয়ে রাখা হলো হাজতে। আদালত প্রাঙ্গণের একপাশে এক সারি মাঝারি আকারের হাজতকক্ষ। প্রত্যেকটি কক্ষের সম্মুখেই ছোট একটি বারান্দা, বারান্দাও ছাদহীন কক্ষের মতো, তার সম্মুখে কাঠের দরজা।

আমাদের পাশের কক্ষেই রাখা হয়েছে রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। সেদিন জেঙ্কিন্‌স্‌কে কী বলেছে রঙ্গলাল, জানতে পারা যায়নি। জানা দরকার। স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা পূর্ব্বাহ্লেই বেফাঁস হয়ে গেলে আই বি সতর্ক হয়ে পড়বে যে!

মাঝে মাঝে খাঁকি পোশাক-পরা স্মার্ট সহ-দারোগারা এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। ছু'-একটা গালগপ্পও করছেন। প্রবোধ দিচ্ছেন, ম্যাজিস্ট্রেট সরজমিন তদন্তে কোথায় গেছেন, এলেই আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে। বেশীক্ষণ আর হাজতভোগ করতে হবে না। আর একবার এসে বললেন যে, মণি চাটার্জ্জী নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনাদের বিপদভঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ইণ্টারভিউ-এর পারমিশন—

অকস্মাৎ অনুরোধ জানালাম: একটা সিগারেট দেবেন দারোগাবাবু? অনেকক্ষণ খাইনি কিনা, গলাটা—

বিলক্ষণ!—বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি: কিন্তু দ্বিজেনবাবু, সিগারেট তো আমি খাইনে।—আচ্ছা, আপনাকে এনে দিচ্ছি।

বললাম: থাক্, থাক্, আর কিনতে হবে না। তার চাইতে এক কাজ করুন না, ঐ যে মণি চাটার্জ্জীর নাম করলেন না, ওকে বলুন, ও ছুটো সিগারেট কিনে দেবে'খন। কেমন?

স্মার্ট সহ-দারোগা বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো, কারণ সবাই নিশ্চিতভাবে জানে, সিগারেট আমি খাইনে। বিপদভঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: সে কি দাদা, সিগারেট?

Nothing is unfair in war!—তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম: পঞ্চাশ টাকার এ এস আই-কে সম্বোধন করেছি, দারোগাবাবু! সিগারেট খাবার পয়সা

নেই যার, সে যদি বিনে-খরচায় একটা টান মারবার সুযোগ পায়, তাহলে ছাড়বে কেন তা ? কিন্তু আমি ওকে দেবো না।

সহ-দারোগা ফিরে এলেন দুটো সিগারেট নিয়ে, সঙ্গে দেশলাই। হাতে দিয়ে বললেন : দেখবেন দ্বিজেনবাবু, আর যেন কেউ টের না পায় আপনাকে সিগারেট দেবার কথা, তাহলে আমার চাকরি—

বাধা দিয়ে বললাম : ছিঃ ছিঃ, বলেন কি ? আমার অনুরোধ রাখলেন আপনি, এর পর আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো, দারোগাবাবু ? তা কি হয় ?

কেশিয়াড়ীতে সিগারেট খেতে হয়েছিল বলে সিগারেট ধরাবার ও ধূমপানের কায়দাটা আমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভদ্রতা করে এ এস আই দেশলাই জ্বালালেন, আমি সিগারেট ঠোঁটে চেপে মুখখানা এগিয়ে দিলাম। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে দিলাম : মণি চাটার্জ্জীর দেশলাইটা দিতে যাচ্ছেন তো, দয়া করে একটা কাজ করবেন ? খবর নিয়ে আসবেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তদন্ত করে ফিরেছেন কিনা ?

নিশ্চয়ই আসবো।—

মূর্খ এ এস আই বেরিয়ে যেতেই আমার প্ল্যান ব্যাখ্যা করলাম। ছোট এক টুকরো কাগজে পেন্সিল দিয়ে খগেন লিখলো :

জেঙ্কিন্‌স্‌কে কী বলেছো জানিও। প্রত্যাহারের কথা আই বি যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। ওদের তাল দিয়ে যাবে আর কালাচাঁদকে সর্ব্বদা রেডি রাখবে। মামলা হবে মুন্সীগঞ্জে। সেখানে ঠিক কোন্ সময় প্রত্যাহার করতে হবে আমি ইশারায় জানিয়ে দেবো।

কাগজখানা সাবধানে মুড়ে ফেলা হলো। তারপর দ্বিতীয় সিগারেটটি থেকে সাবধানে কিছু তামাক পাতা বার করে নিয়ে কাগজটি তার মধ্যে পুরে দিয়ে আবার পাতা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। খানিকক্ষণ পর স্মার্ট এ এস আই ফিরে আসতেই অনুরোধ জানালাম : দেখুন দারোগাবাবু, একটা অনুরোধ জানাবো, রাগ করবেন না যেন। ওধারে যে দু'জন আছে, জানেনই তো ওরাও একই মামলার আসামী ; ওর মধ্যে রঙ্গলালবাবু সিগারেট খান। আমি খাচ্ছি আর ওই ভদ্রলোক পাচ্ছেন না, এটা যেন ভারী খারাপ দেখাচ্ছে। আমায় যখন দিয়েছেন খেতে, তখন ওকেও একটা দিলে আমরা খুশী হই। যদি কিছু মনে না

করেন, তাহলে এই সিগারেটটাই না হয়—কেন আবার মিছে চাইতে যাবেন ?

স্মার্ট এ এস আই খুব স্মার্টভাবে ফাঁদে পা দিয়ে বসলেন। রঙ্গলাল যে আমার ভাই, তা এদের জানবার কোনো কারণ নেই। তাই আমার হাত থেকে সিগারেটটি নিয়ে নির্ব্বিবাদে দিয়ে এলেন রঙ্গলালকে, বলে এলেন যে, ওধারের দ্বিজেনবাবু ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রমাদ গনলো রঙ্গলাল। দাদা পাঠিয়েছেন সি—গা—রে—ট ? ··কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আসল ব্যাপারটি বুঝে ফেলতে দেরী হলো না তার। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে এ এস আই বেরিয়ে যেতেই সে সিগারেটটি ছিঁড়ে ফেললে।

১৯৩১ সালে আলীপুর সেনট্রাল জেলে থাকাকালীন জেলার মিঃ সোয়ানকে একবার জব্দ করেছিলাম। জব্দ করে কাজ হাসিল করেছিলাম বটে, তবে বেশী দিন চালাতে পারিনি। একদিন একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাই। ঘটনাটা বলি।

ফাঁসির হুকুম নিয়ে দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির সেল-এ চলে যাবার পর এলেন মনাদা' অর্থাৎ বরিশালের মনোরঞ্জন গুপ্ত। ১৬নং সেলস-এ মাত্র আমরা দু'জন রাজনৈতিক বিচারাধীন আসামী। দেশে তখন আইন অমান্য আন্দোলন পুরোদমে চলছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হবার পর আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য জনসাধারণই এগিয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের সমস্ত জেল সত্যাগ্রহীতে ভর্ত্তি। আলীপুর জেলে তখন অন্যান্যের সঙ্গে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন, বড়দা' (হেমচন্দ্র ঘোষ), সত্যদা' (মেজর সত্য গুপ্ত), বিপিনদা' (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী), হরিদা' (হরিকুমার চক্রবর্ত্তী), স্বামী জ্ঞানানন্দ, মদনমোহন বর্ম্মণ প্রভৃতি।

মনাদা' কিছুদিন ফেরারী থাকবার পর ডালহৌসী বোমার মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়ে এসেছেন আর আমি গ্রেপ্তার হয়েছি একটি রিভলভার চুরির ব্যাপারে। অন্যান্য নেতা এসেছেন আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীরূপে। তাই জেলের সাধারণ নিয়মে তাঁদের সঙ্গে মনাদা'র বা আমার যোগাযোগ একেবারে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ কাজটাই কিভাবে সিদ্ধ করা যায়, তা নিয়ে পরামর্শ চললো মনাদা'র সঙ্গে।

জেলের মাঝখানে একটি সেনট্রাল টাওয়ার। দোতলা টাওয়ারের ছাদে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একজন সশস্ত্র সিপাই প্রহরায় রত থাকে। ওখান থেকে জেলের বিভিন্ন ইয়ার্ড দেখা যায়। তাই ইয়ার্ডের সিপাই ছাড়াও এই সিপাইটি সবগুলি ইয়ার্ডের উপরই শ্যেনদৃষ্টি রাখতে পারে। টাওয়ারের নীচের তলায় একটি ছোটখাটো গীর্জ্জা। প্রতি রবিবারে বাইরে থেকে পাদরী সাহেব আসেন খ্রীষ্টান বন্দীদের সমক্ষে বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা শোনানো ও জগৎপিতা যীশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সভা পরিচালনার জন্য। সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্য্যন্ত গীর্জ্জায় খ্রীষ্টান বন্দীদের সমাবেশ হয়।

টাওয়ারের দোতলায় অবস্থিত জেলের লাইব্রেরী। বন্দীদের জন্যই লাইব্রেরী। সুপার সাহেব প্রতি বৎসর নিজের পছন্দমতো বই কিনতেন। নিজের, মানে, সত্যিই নিজের ও জেলার, ডেপুটি জেলার প্রভৃতি স্টাফদের। সে যুগে আলীপুর জেলে প্রায় সময়ই হয় সাহেব, নয়তো অ-বাঙালী সুপার ও জেলার থাকতেন। ফলে ইংরেজী বই কেনা হতো বেশী। কর্ত্তাদের ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী প্রায়ই আসতো সস্তা রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা সিরিজ কিংবা যৌন-বিষয়ক গ্রন্থ।

বন্দীরা লাইব্রেরীতে গিয়ে বই নিয়ে আসতে পারতেন। অবশ্য আমাদের মতো বোমা বা রিভলভারের আসামীরা নয়। তাঁরা টাওয়ারের লাইব্রেরীতে আসা দূরে থাক, ইয়ার্ডের বাইরেই আসতে পারতেন না। সত্যাগ্রহী হিসেবে বন্দী দাদারা ঐ রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজ বা যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহশীল না হলেও নিয়মিতভাবে লাইব্রেরীতে আসতেন, বই ঘাঁটাঘাঁটি করে চলে যেতেন। আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী বলে তাঁদের বাধা দেয়া হতো না।

দোতলায় ওঠবার লোহার সিঁড়িটি টাওয়ারের বাইরে দিয়ে উঠেছে এবং তা আমাদের ১৬নং সেলস-এর দিকেই। ফলে, দাদারা প্রায়ই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে ইশারায় ও হস্তসঞ্চালনে সংবাদ আদানপ্রদান করতেন। কিন্তু নিঃশব্দে কি আর সব কথা বলা যায়? সুতরাং—

সুতরাং একদিন সোয়ান আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, লাইব্রেরীর বই আমরা পেতে পারি কিনা। তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জানিয়ে সোয়ান ব্যাখ্যা করে বললেন যে, আইন অনুযায়ী দণ্ডিত আসামীরাই শুধু লাইব্রেরীর বই পেতে পারে। আমরা বিচারাধীন। সুতরাং—

সুতরাং আর-একদিন সোয়ানকে বললাম: সাহেব, বসে বসে তো আর সময় কাটতে চায় না। হিন্দু আমি, হিন্দুধর্ম্মের সবগুলো শাস্ত্র একেবারে আমার কণ্ঠস্থ আছে। শুধু হিন্দুধর্ম্ম কেন, মুসলমানধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম প্রভৃতি সব ধর্ম্মেরই বই আমি পড়েছি। পড়িনি শুধু খ্রীষ্টধর্ম্মের বই অর্থাৎ বাইবেল—

You are unfortunate! বলে উঠলেন সোয়ান: আমাদের ধর্ম্মের মতো ধর্ম্ম দুনিয়ায় আর দু'টি নেই। ছাখোনা, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত।

পরিসংখ্যান সম্বন্ধে আদৌ কোনো তর্ক না তুলে বলে উঠলাম: সত্যি?

সোয়ানের কথায় তখন আবেগ এসে গেছে। বক্তৃতার সুরে বলতে লাগলেন: মুসলমানদের ধর্ম্ম ও তোমাদের ধর্ম্ম তো আমাদের ধর্ম্মেরই নকল করে তৈরী। সব চাইতে প্রাচীন এই খ্রীষ্টধর্ম্ম। তোমাদেব কৃষ্ট বা কৃষ্ণ তো ক্রাইষ্টেরই অনুকরণ। ধর্ম্মহীন অন্ধকার জগতে লর্ড যীশু বললেন: Let there be light and there was light, তিনি বললেন—

কিন্তু যীশুর আব কিছু বলবার দরকার নেই, এতেই যথেষ্ট! গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলাম: বাঃ, চমৎকার বাণী তো! বললেন, আলো হোক আর অমনি আলো জ্বলে উঠলো! এই তো প্রকৃত ধর্ম্ম আর এই তো জগৎ পরিত্রাতার যোগ্য বাণী। অন্ধকারে যাঁরা কুঁকড়ে মরছে, যেন ইলেকট্রিক সুইচ অন্ করে তাদের ঘরে আলো জ্বেলে দিলেন। কিংবা হয়তো অন্-ও করতে হলো না, ম্যাজিসিয়ানের মতো ম্যাজিক ওয়াণ্ডখানা বাতাসে তরবারির মতো ঘুরিয়ে দিলেন, ব্যস্, আলোয় আলোময়!

সোয়ানের মুখে হাসি দেখা গেল: Then you appreciate the Christianity?

Certainly! তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েই মুখখানা অন্ধকাব কবে বললাম: কিন্তু এমনি যে First class first ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেরই কিছু জানা নেই আমার। জানবার কি কোনো উপায়ই নেই মিঃ সোয়ান? লাইব্রেরীতে এমন কোনো বই—

বাধা দিলেন সোয়ান: Do one thing—লাইব্রেরীর বই তুমি পাবে না, আইন নেই—I can do for you one thing—আমার বাড়ীতে New Testament আছে, সেখানা তোমায় দোব। But mind you, শুধু পড়বার

জন্য। যদি হারিয়ে ফেল বা তার একখানা পৃষ্ঠা এদিক-ওদিক কর, তাহলে Mrs Swan would kill me straight, বুঝলে ?

তথাস্তু।

মনাদা' বললেন: কৌশলের প্রথম স্তর অতিক্রম করেছো, দ্বিতীয় স্তর অত্যন্ত কঠিন। সেখানে বুদ্ধির খেলায় সোয়ানকে ঘায়েল করতে পারলে তবেই বুঝবো পাকা খেলোয়াড়।

ঘায়েল করতে খুব দেরী হলো না। মন দিয়ে না হোক, কার্যোদ্ধারের জন্য যতটুকু অভিনিবেশ দরকার, ততটুকু দিয়ে নিউ টেস্টামেন্টের বাছা বাছা গোটাকতক বয়েত মুখস্থ করে ফেললাম। সোয়ান এলেই তার দু' একটা আউড়ে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় একেবারে ডগমগ হয়ে উঠতে লাগলাম। নিত্য নতুন সুসমাচার শুনে এবং আমার সুনিবিড় ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে সোয়ান প্রথম প্রথম খুশী, পরে একটু একটু করে পরিতৃপ্ত, তারপর বিস্মিত বিগলিত এবং অবশেষে একেবারে সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। সম্মোহিত সোয়ানের কানে তখন গুঁজে দিলাম চূড়ান্ত খেলার উপক্রমণিকা: শুধু যে এই ধর্ম্মই best তা নয়, অন্যান্য ধর্ম্ম যে এই ধর্ম্মেরই ব্যর্থ নকল তাই নয়, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন মিঃ সোয়ান, মনে হয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে আমি উদার খ্রীষ্টধর্ম্মই গ্রহণ করি।

সীমাপরিসীমাহীন ভক্তি। সোয়ান একেবারে গলে গেলেন। বুকের সম্মুখে বাতাসে একটি ক্রস চিহ্ন এঁকে অনুরোধ জানালাম ভক্তি গদগদ কণ্ঠে: May I not attend the prayer ?

Of course। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন সোয়ান: Christianity-র প্রতি তোমার ভক্তির তুলনা নেই। তুমি তাই Christianity embrace করতে চাও, I understand and appreciate the depth of your faith—তাই গীর্জ্জায় তোমার যাবার পথে কোনো বাধাই থাকতে পারে না।

ব্যস, হুকুম হয়ে গেল। প্রতি রবিবার সকাল সাতটার মধ্যেই বাইবেল-হাতে সুবোধ বালকটির মতো ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাই সেনট্রাল টাওয়ারের নীচে গীর্জ্জায়। আলখাল্লা পরা দাড়িওয়ালা পাদ্রী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বাইবেল পাঠ শুরু করেন:.....Judge not, that ye be not judged. For with what judgement ye judge, ye shall be judged: and

with what measure ye mete, it shall be measured to you again……শ্রোতারা সবাই পাদ্রীর দেখাদেখি চক্ষু নিমীলিত করেন ও মাঝে মাঝেই 'আমেন' 'আমেন' বলে ওঠেন আর সেই অবসরে পশ্চাৎ দিকের বেঞ্চ ছেড়ে সুট্ করে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থামতো সত্যাগ্রহী বন্দী ইয়ার্ডের দিক থেকে দাদারা এসে পড়েন। মনাদা'র প্রেরিত সংবাদগুলি তাঁদের দিই, তাঁদের প্রেরিতব্য সংবাদগুলি সংগ্রহ করি। আমার নিজের কথাও কিছু বলি ও দাদাদের উপদেশ গ্রহণ করি। মাঝে মাঝে মনাদা'র লেখা চিঠিও দিই তাঁদের হাতে, আবার তাঁদের অথবা তাঁদের মারফত অপর বন্দীর প্রেরিত চিঠিও বহন করে নিয়ে আসি মনাদা'র কাছে। গীর্জ্জার মধ্যে পাদ্রীর কণ্ঠ শোনা যায়ঃ Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: For everyone that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened… আর বাইরে চলে আমাদের দ্রুত অনুচ্চ সলাপরামর্শ, চলে চিঠির আদান-প্রদান। দ্রুত এজন্য যে, কখন যে অতর্কিতে সোয়ান এদিকে এসে পড়বেন, কে বলতে পারে! টের পেয়ে গেলে আর রক্ষে রাখবেন না।

একদিন সত্যিই টের পেয়ে গেলেন। ধরা পড়ে গেলাম একেবারে হাতে-নাতে।

সে রবিবারও যথারীতি এসেছি গীর্জ্জায় অন্ধকার হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে সঞ্জীবিত হতে। যথারীতি স্বামী জ্ঞানানন্দ দরজার বাইরে রাস্তায় এসে গেছেন। যথারীতি দাড়িওয়ালা পাদ্রীর চক্ষু নিমীলিত হলো, শ্রোতাদেরও যথারীতি চোখ বন্ধ হলো, পাদ্রী শুরু করলেনঃ Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents……আমিও যথারীতি সুড়ুক করে বেরিয়ে পড়লাম। স্বামীজীর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলবার পরই অকস্মাৎ সোয়ান সম্মুখে এসে হাজির!

সার্পেন্টের মতো আর ওয়াইজ হওয়া হলো না, সোয়ান বলে উঠলেনঃ I see, so this is the trick you have been playing?

বলতে চেষ্টা করলাম যে, urinal-এ যাবো বলে সেইমাত্র বেরিয়েছি, কিন্তু

সোয়ান জেলার। জেলের অভ্যন্তরে urinal-এ যাবার ফাঁকি দিয়ে সিপাই ও বন্দী সবাই যে পিঠ বাঁচাতে চায় এবং এটা যে একটা অত্যন্ত সহজ বাজে ওজর, জেলার তা ভালোভাবেই জানেন। তাই আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন: বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তোমার অনুরাগ একটি ভাঁওতা। আসল কথা, এদের সঙ্গে দেখা করাই তোমার উদ্দেশ্য।—move on, move on to your Yard—জলদি চল।

আর দ্বিরুক্তি করা চলে না। পকেট থেকে নিউ টেস্টামেন্টখানা বার করে সোয়ানের হাতে তুলে দিয়ে সুবোধ বালকের মতো তাঁর আগে আগে এসে ১৬নং সেলস-এ প্রবেশ করলাম।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সদলবলে আবার এলাম সেই মুন্সীগঞ্জ মহকুমা জেলে। জেনানা ফাটকে রাখা হলো রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। একবার এসেছিলাম আইনভঙ্গের অপরাধে। সে অভিযোগ ছিল সামান্য। এবার এসেছি বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীরূপে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতার সীমা নেই।

কালীপদ মৈত্র বদলী হয়ে গেছেন কিংবা রিটায়ার করেছেন। তাঁর স্থানে মহকুমা হাকিম হয়ে এসেছেন রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে আমাদের বিচার করবেন ইনি। মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা মাত্র দুই বা বড় জোর তিন বৎসর কারাদণ্ড, আর স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে ইনি সাত বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ড দিতে পারবেন। কেরানী সুরেন মৈত্রকেও দেখলাম না। তিনিও বদলি হয়ে গেছেন। সেবার এসে বারেন্দ্রযুগলের দাপটে জেলের যে দুর্দ্দশা দেখেছিলাম, এখন যেন ততটা শোচনীয় মনে হলো না।

মামলার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছি। বাইরের আত্মীয়-স্বজনেরা একত্র হয়ে পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করেছেন ঢাকার রজনী দাসকে আর তাঁর জুনিয়র-রূপে কাজ করবার জন্য মুন্সীগঞ্জের মোক্তার জিতেন চক্রবর্ত্তীকে। শ্রীশ চাটার্জ্জী ঢাকা ছেড়ে আসতে পারবেন না। শেষ পর্য্যন্ত খগেন রায় অভিযোগপত্র পেশ করতে পেরেছেন মাত্র আমাদের ছ'জনের বিরুদ্ধে—রঙ্গলাল, কালাচাঁদ, খগেন, অনাথ, বিপদভঞ্জন ও আমি। অবশিষ্ট সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আই বি-র যথাকর্ত্তব্য তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করছে। তারা রটিয়ে দিয়েছে যে, এরা মারাত্মক আসামী। গভীর রাত্রে জেলের দেয়ালের বাইরে থেকে এদের লোক এসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কয় এদের সঙ্গে। নিজেরা তো ফাঁদে আটকে গেছে। রেহাই পাওয়া তো দূরের কথা, হয়তো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরই হয়ে যাবে। জেল থেকে আর বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। তাই সাংঘাতিক সব সংবাদ এরা পাচার করে দিচ্ছে বাইরে চ্যালাচামুণ্ডা যারা এখনো রয়ে গেছে, তাদের কাছে। সুতরাং প্রমাদ গনলেন সরকারী বুদ্ধিবিভাগ। মুন্সীগঞ্জ সাব-জেলের ইতিহাসে যা কোনোও দিন হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতেও যা কোনোদিন হবে না, তাই হলো। বারোজন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনার একটি স্কোয়াড ঢাকা থেকে এসে পড়লো এখানে। জেলের কাছেই পড়লো তাদের তাঁবু। চব্বিশ ঘন্টা তারা বাইরে থেকে জেলের দেয়াল পাহারা দিতে লাগলো বন্দুক কাঁধে। শুধু তাই নয়। আমাদের শাগরেদরা কখন এসে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর গুলী চালিয়ে দেবে কে জানে! তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভবেশ রায়ের একজন রিভলভারধারী দেহরক্ষী নিযুক্ত হলো। অর্থাৎ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মারফত কাগজে কাগজে বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসন্ন আরম্ভের সংবাদ ছাপিয়ে, জেলের বাইরে গাড়োয়ালী সান্ত্রী বসিয়ে, ম্যাজিস্ট্রেট ভবেশ রায়ের দেহরক্ষী নিয়োগ করে এবং সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক whispering campaign চালিয়ে আই বি-রা আবহাওয়া এমনি উত্তপ্ত করে তুললো যে, অবধারিতভাবেই সবাই বুঝে নিলেন, দ্বিজেন গাঙ্গুলী এবার সত্যিই তাহলে পরাজিত হলেন।······

মুন্সীগঞ্জে মামলা আরম্ভের দিনটিতে আদালতে যে নাটকাভিনয় হয় আজও তা বেশ মনে আছে।

অফিসের বাবুর মতো তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলাম আমরা। জেল-গেটের বাইরে এসে দেখি বারোজন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। শ্লোপ আর্ম করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। অর্ডার দিলাম:

ফল্ ইন

আইজ—ফ্রণ্ট

রাইট—টার্ণ

কুইক—মার্চ্চ

এগিয়ে চললো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গাড়োয়ালীদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে। একেবারে নিখুঁত মার্চ্চ! হাই স্কুলের পেছন দিয়ে এসে খালের ওপরকার বৃহৎ কাঠের সেতু পার হয়ে আদালত প্রাঙ্গণে পড়লাম। সেনাবাহিনী থামবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দিলাম: হল্ট।

আদালত কক্ষে প্রবেশ করামাত্রই দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো, প্রহরায় দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র একজন পুলিশ। আই বি-র অনুমতিপত্র ব্যতীত সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কক্ষ লোকে লোকারণ্য। উকিল-মোক্তারে একেবাবে ঠাসা, তাছাড়া কিছু দর্শক আর এসেছেন ফুলদা', অনাথের দাদা, মণি এবং আরো ক'জন। কোর্ট ইনসপেক্টার শক্ত ক্রিজওয়ালা খাঁকি ট্রাউজার পরে এসেছেন, রিভলভারের থাপ ও বেল্ট বার্নিশ করা, পিতলের চাকতিগুলো ঝকঝক করছে। এক পাঁজা ফাইল ও কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন শ্রীনগর থানার অফিসার-ইন চার্জ্জ খগেন রায় জুনিয়র কাউন্সিলের মতো। আমাদের মোক্তার জিতেন চক্রবর্ত্তী উসখুস করছেন, রজনী দাস ঢাকা থেকে এখনো এসে পৌঁছোননি। অতি সাধারণ দর্শকের মতো সাদা পোশাকে প্রথম বেঞ্চির এক পার্শ্বে ভালো মানুষটির মতো বসে আছেন অবিনাশ দারোগা—বোধহয় গ্র্যাসবি সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে।

মোটা কাঁচে ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেটের আসন। ওপারে বসে আছেন গাম্ভীর্য্যের খোলস পরে রায় বাহাদুর ভবেশ বায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে প্রত্যেক দিনের শুনানির জন্য পাবেন ২০০৲ টাকা করে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক।

মামলা শুরু করবার জন্য আদেশ উচ্চারণ করতেই জিতেন চক্রবর্ত্তী আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, আসামীপক্ষের প্রধান উকিল রজনী দাস ঢাকা থেকে এখনো এসে পৌঁছোতে পারেননি, তাই আধ ঘন্টা সময় দিতে আজ্ঞা হোক।

আজ্ঞা হলো। রঙ্গলাল কাঁচের ওপার থেকে আমার পানে চাইলো, আমি মৃদু হাস্য করলাম মাত্র। সেও হাসলো। এই হাসি কিন্তু অবিনাশ দারোগা দেখে ফেললেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে এমনিভাবে মুখবিকৃতি করলেন যেন বোঝাতে চাইলেন, হাসি! ও হাসির অর্থ আমি জানি। কিন্তু ওতে আর

ফল হবে না, বন্ধু, রোগ এখন হাকিমের বাইরে। তার চাইতে বরং রাম নাম উচ্চারণ কর, খাটিয়ার অর্ডার দাও, আম কাঠের জোগাড় দেখ!……

আধ ঘন্টা শেষ হয়ে যেতেই ইনসপেক্টার আবার আবেদন জানালেন, জিতেন চক্রবর্ত্তীও পাল্টা আবেদনে আরও আধ ঘন্টা সময় চাইলেন। কিন্তু এবার হাকিম হুকুম দিলেন: মামলা শুরু হোক। We can't wait any longer!

রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে একেবারে হাকিমের পাশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। রঙ্গলাল আর একবার চাইলো আমার পানে। এবার ভেল্‌কি দেখাতে আর ভুল করলাম না। ইশারায় জানিয়ে দিলাম: This is the time—

অবিনাশ দারোগা আবারও লক্ষ্য করেছেন আমায়। কিন্তু অবজ্ঞার চাপা হাসিতে মুখমণ্ডল তাঁর বিকৃত মনে হলো।…কিন্তু কতক্ষণ, কতক্ষণ তোমার এই আত্মম্ভরিতা, এই অবজ্ঞা?

যেই ইনসপেক্টার আসামীদের তালিকা পাঠের পর রাজসাক্ষী দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন, অমনি রঙ্গলাল ইংরেজীতে বললো: I have something to say, Sir!

বেশ, বল।—ভবেশ রায় জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন।

আমি যা বলেছি, পুলিশের শিখিয়ে দেওয়া কথা বলেছি। সুতরাং আমার বিবৃতি আমি withdraw করছি।—বলেই সে বার বার চিমটি কাটলো কালাচাঁদের হাতে।

সে কিন্তু রঙ্গলালের কথায় সায় দিল না পূর্ব্ব-ব্যবস্থামতো। কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভবেশ রায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি withdraw করছো কি?

নির্লজ্জ কালাচাঁদ মৃদুস্বরে জবাব দিল: না।

ভবেশ রায় হুকুম দিলেন: Then it is evident that Rangalal Ganguly is not a witness, but an accused. He may be led to the accused box!

বেরিয়ে এল রঙ্গলাল গটগট করে। আমাদের কাঠগড়ায় উঠে আসতেই সর্ব্বাগ্রে বিপদভঞ্জনই দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো তাকে, পিঠ চাপড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো: সাবাস রঙ্গুদা, সাবাস।

তাকিয়ে দেখলাম, কালাচাঁদ তেমনি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে দলের সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, রঙ্গলালের সঙ্গে, ঢাকা জেলের আমাদের শুভানুধ্যায়ী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে। কী শাস্তি এই দেশদ্রোহীদের ?······

তাকিয়ে দেখি, এবার ল্যাজ গুটিয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো অবিনাশ দারোগা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ যে কল্পনাও করতে পারেনি ও ব্যাটা!

কিন্তু এমন সময় ভেজানো দ্বার সটান মেলে দিয়ে উকিল-মোক্তার-দর্শকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গুটি গুটি পা ফেলে এসে হাজির হলেন খর্ব্বকায় স্বয়ং রজনী দাস। একেবারে পোশাক এঁটে এসেছেন রণং দেহি মূর্ত্তিতে। এসেই নাটকীয় ভঙ্গীতে চশমার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন : I see—the principal Approver is already led to the accused box, but still a remnant remains—a weakling as the last ray of hope of the Intelligence Branch. Well, my dear boy—বলে ছুটো প্রশ্ন করলেন কালাচাঁদকে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে : তুমি বুঝি রাজসাক্ষী ?

কালাচাঁদের মুখে কথা ফুটলো না।

লজ্জা কি ? নাচতেই যখন নেমেছো, তখন আর ঘোমটার বালাই কেন ?

তারপরই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন রজনী দাস। প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করলেন অনিবার্য্য বিলম্বের জন্য। স্টীমার লেট ছিল। তারপর জানালেন অভিযোগ, গুরুতর অভিযোগ। এ কাজীর বিচার নয় যে, খাসকামরায় বসে খুশীমতো কাজী শিরশ্ছেদের হুকুম দেবেন। এ প্রকাশ্য আদালত, জনসাধারণের আইনগত অধিকার আছে to be present and to watch the proceedings. আই বি এখানকার মালিক নন যে, তাঁরা খুশীমতো দরজা বন্ধ করে রাখবেন। This is a serious encroachment upon the jurisdiction of the Court and privileges of the public. I appeal to your honour—

কোর্ট ইনসপেক্টার উঠে দাঁড়ালেন : But Mr. Das, প্রকাশ্য আদালতে জনসাধারণের অবশ্যই প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। কিন্তু যেখানে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার question arise করেছে সেখানে—

সেখানে, you have taken all possible precautions, তৎক্ষণাৎ বাধা

দিলেন রজনী দাস : ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে মোটা কাঁচের দুর্ভেদ্য দেয়াল, পশ্চাতে জানালার বাইরে রিভলভারধারী দেহরক্ষী, হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রয়ারের মধ্যেও রাখা আছে লোডেড রিভলভার। তারপর, you Mr. Court Inspector, আপনার কোমরেও রয়েছে বিভলভার, আদালত কক্ষের বারান্দায় সশস্ত্র পুলিশ, আদালত প্রাঙ্গণে সশস্ত্র সেনাদল, তারপর নিশ্চয়ই চতুর্দ্দিকে সদা-জাগ্রত শ্যেনদৃষ্টি রাখবার জন্য ঢাকা থেকে দলে দলে সাদা পোশাকে এসেছেন তাঁরা, যাঁবা শুধু ম্যাজিস্ট্রেটের কেন, খোদ গভর্নমেন্টের দেহরক্ষার জন্য দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন, এমনি fortified iron room of Lakshinder তৈরী করবার পরও যদি a cunning cobra finds its way inside, well, আমাব মনে হয় তাহলে স্বয়ং Cobra-Goddess মনসা দেবীও পারবেন না রক্ষা করতে। Hence, I do again appeal to your honour—

কিন্তু এ্যাপিল আব করতে হলো না। এ যে বজনী দাস, ঢাকাব বিখ্যাত উকিল রজনী দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেব প্রাক্তন সহকাবী। রাজনৈতিক মামলা পরিচালনায় ধুবন্ধব রজনী দাস। সুতরাং তৎক্ষণাৎ দবজা খুলে দেবার হুকুম হলো, অনুমতিপত্রেব বাধা বাতিল করে দেওয়া হলো। সাধারণ দর্শকেরা দলে দলে এসে প্রবেশ কবলেন। মামলা শুরু হয়ে গেল।

একদিন একদিন করে পুরো বাইশটি দিন হলো মামলার শুনানি। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা। প্রতিদিনকার শুনানির বিবরণ প্রকাশিত হতে লাগলো 'স্টেটসম্যান' প্রমুখ বাংলার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। বেছে বেছে সাক্ষী জোগাড় করেছেন খগেন রায়। আমাদের গ্রামের গাঁজাখোর বদমাশ বিশু চক্রবর্ত্তী, তমিজদ্দী চৌকিদার, তারই জনকয়েক শাগরেদ, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার জমির কারিগব আর হাঁসাড়া প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির স্বনামধন্য সম্পাদক সেই মৃণাল সোম। ঠিক তেমনি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা খদ্দরের শার্ট, ময়লা ধুতি আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। গ্যাটাপারচার ফ্রেমের ওপর দিয়ে কুৎ কুৎ করে তাকিয়ে সত্য কথা বলবাব প্রতিজ্ঞা করে অবলীলাক্রমে ডাহা মিথ্যা বলে গেলেন যে, ঢাকা থেকে বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্ত, বিভূতি চৌধুবী প্রভৃতি বি ভি-র অফিসাররা হাঁসাড়ায় সামরিক ড্রিল শেখাতে এসে বাত্রিযাপন কবতো কেয়টখালীতে দ্বিজেন গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। কেয়টখালীব দ্বিজেন গাঙ্গুলী যে এই দলের সভ্য এবং এই সব আসামী তারই রিক্রুট, সবাই জানে তা। কথায়

কথায় মারধর করা, ছোরা-ছুরি চালানো এবং রিভলভার নিয়ে ঘোরাফেরা এদেরই কাজ। হাঁসাড়া, কেয়টখালী ও আশেপাশে গ্রামের সবাই তাই এদের ভয় করে।

কংগ্রেসের কাজে কোনো দিনই আমরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াইনি, কংগ্রেসও কোনো দিন এমনি প্রকাশ্যভাবে শত্রুপক্ষে যোগদান করে বিরুদ্ধাচরণ করেনি আমাদের। কংগ্রেসী কুলকলঙ্ক মৃণাল সোম একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলো।

তার চাইতেও বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম, সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং বিজয় সেন। আমার আবাল্য সুহৃদ, সহকর্মি, শহীদ বিনয় বোসের প্রাক্তন রুমমেট ও সহপাঠী গোপাল সেনের দাদা বিজয় সেন। সেই বিজয় সেন, গলায় সেই তুলসীর মালা, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের প্রতীক! বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রইলো না, যখন দেখলাম সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতো বিজয়বাবু গড় গড় করে বলে চললেন: হ্যাঁ, অনাথ চক্রবর্ত্তীর হাতের ক্ষত চিকিৎসা করেছি আমি। ঢাকা শহর থেকে আনা হয় কেলেগুলা। প্রতিদিন রঙ্গলালদের বাড়ীতে গিয়ে আমি অনাথের ক্ষত ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে আসতাম।

রজনী দাসের প্রশ্ন: কীসের জন্য ক্ষত হয়েছে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

কী বললেন দ্বিজেনবাবু?

দ্বিজেনবাবু নয়, রঙ্গলাল। সে বললো, তা দিয়ে আপনার দরকার কি?

এতে আপনার কোনো সন্দেহ হয়নি?

হ্যাঁ, হয়েছিল। কারণ তার দু'দিন আগেই ডাকাতির ঘটনা শুনেছিলাম।

সন্দেহের কথা বলেছিলেন কাউকে? এরাই যে ডাকাতি করতে পারে, তা মনে হয়েছিল কি?

মনে হলেও বলতে ভয় করেছে, কারণ—

কারণ আমি জানি।—সহাস্যে জুড়ে নিলেন রজনী দাস: কারণ কথায় কথায় ছোরা-ছুরি চালানো আর মারধর এদের কাজ।—The same sentence quoted by His Highness the Secretary of the Hashara Congress Committee—তোতা পাখীর বুলি!

কাঁচের দেয়ালের ভেতরে গিয়ে সরকারী সাক্ষীরা কী দিচ্ছে জবানবন্দী, রজনী দাসের মারাত্মক সব জেরার জবাবে কি সব কথা বলে ফেলছে তারা, মোটামুটি শুনতে পেলেও আমি একদিন ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম যে : আমরা ভাল শুনতে পারছি না। আর সাক্ষীকে আমাদের উকিল ছাড়াও আমাদের যখন জেরা করবার অধিকার আছে, তখন—

Certainly! তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন রজনী দাস : The accused persons must be able to hear and follow the proceedings…… সুতরাং আমি আবেদন জানাচ্ছি, সরকারী সাক্ষীরা কাঁচের বাইরে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিক, এই দরজাটা খোলা রাখলেই কোর্ট সব শুনতে পাবেন—

কোর্ট ইনসপেক্টার উঠে দাঁড়ালেন : But Mr. Das, সাক্ষীরা প্রায় সবাই গ্রামের নিরীহ লোক, আসামীদেরই আশেপাশে এরা চলাফেরা করতো, কেউ কেউ এদেরই সাথী ছিল। একেবারে আসামীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে এরা ঘাবড়ে যেতে পারে—

Let them then go to hell, Mr. Inspector—জবাব দিলেন রজনী দাস : লোকজনের সামনে এরা সত্য কথা বলতে পারে না, বলতে পারে বোধহয় আই বি পুলিশের গোপন কক্ষে ফিসফিস করে silver tonic-এ চাঙ্গা হয়ে উঠে। তারপর হেসে বললেন : অবশ্য আপনার সাক্ষীরা যদি এতই লাজুক হন যে, জনসমাজে মুখ দেখাবার মতো তাদের অবস্থা নয়, তাহলে let them use some sort of Borka, some veil—

হাসাহাসি পড়ে গেল। ভবেশ রায়ের পাথুরে মুখেও যেন হাসির আভা ঝিলিক মারলো। শেষ পর্য্যন্ত রজনী দাসের প্রস্তাবই রক্ষিত হলো। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে লাগলো।

একদিন কাঠগড়ায় দাঁড়ালো বিশু চক্রবর্ত্তী। বিশুর ইতিহাস সবই জানিয়ে দিয়েছিলাম রজনী দাসকে। তাই ওকে দেখেই প্রশ্ন করলেন তিনি : আচ্ছা বিশুবাবু, আপনার বাঁ হাতের তেলোটা অনুগ্রহ করে কোর্টকে একবার দেখাবেন কি?

বিস্মিত বিশু হাতখানা তুলে দেখাতেই রজনী দাস বলে উঠলেন : হাতের তেলোটা অমন কালো কালো কেন? নিশ্চয়ই ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথাটাও অমনি। কিন্তু কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি চক্কোত্তি মশাই?

বিশু মিনমিন করলো : হয়তো কি করে ময়লা লেগে গেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ময়লা লেগেছে, বললেন রজনী দাস : তবে সে যে-সে ময়লা নয়, গাঁজার ময়লা। আর কি করে বা কেমন করে লাগেনি। বাঁ হাতের তেলোয় রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়েই তো গাঁজা টিপতে হয়, তাই নয় কি?

বিশু প্রতিবাদ জানালো : আমি গাঁজা খাই না।

নিশ্চয়ই খান না, রজনী দাস তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন : আপনি গাঁজা খান, আমিও তা বলছি না। বরং বলি গাঁজা আপনি কথখনো খাননি, কথখনো খান না। তবে কি জানেন বিশুবাবু, আমাদের দেশে শরৎ চাটুজ্জে বলে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি গিরীশ মহাপাত্র নামক একটি অত্যন্ত পরোপকারী লোকের কথা বলেছেন, যিনি নিজে না খেলেও যাঁরা খান, তাঁদের সুবিধের জন্য মালটি বেশ জুৎসই করে তৈরী করে দেন। হ্যাঁ, বিশুবাবু, এই গিরীশ মহাপাত্র কি আপনার গুরু? তাঁরই মতো কি আপনিও—

কোর্ট ইনসপেক্টার উঠে দাঁড়ালেন : But Mr. Das, এই মামলার সঙ্গে বিশুবাবুর গাঁজা খাওয়া না-খাওয়ার কি সম্পর্ক আছে বুঝতে পারলাম না।

রজনী দাস হাসলেন : পারবেন, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন মিঃ ইনসপেক্টার। বুঝতে পারবেন যে, প্রসিকিউশন বেছে বেছে দাগী আসামী, চরিত্রহীন, গাঁজাখোর ইনফরমারদের ধরে নিয়ে এসেছে সাক্ষ্য দেবার জন্য। তারপর আরও বুঝতে পারবেন, একটু পর বললেন তিনি : যে বিশু চক্কোত্তির গাঁজার মতো সরকার পক্ষের পুরো মামলাটাই গাঁজা, unadulterated pure গাঁজা!

আদালত কক্ষে হাসির মৃদ গুঞ্জন শোনা গেল। রজনী দাস হাকিমকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন : Your honour, এঁকে জেরা করেই এঁকে দিয়েই আমি কবুল করিয়ে দেখাবো যে, ইনি একজন veteran গাঁজাখোর। এবং শুধু গাঁজাই খান না, পান করা যায় যে রঙ্গীন পানীয়, তাতেও এঁর সমান আসক্তি। এবং অতিরিক্ত পানের ফলে মনটা যখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তখন পথ ভুলে ইনি গভীর রাত্রে শরৎ দাসের বিধবা মেয়ে পুঁটুরাণীর ঘরেই ঢুকে পড়েন।— তারপরই আবার চশমার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বিশুর প্রতি : পুঁটুরাণীর ঘরে এক রাত্রে ঢুকেছিলেন না বিশুবাবু? তারপর ধরা পড়ে যাবার ফল কি হয়েছিল? ফলম্ চাঁদা করে বাজারিয়া প্রহারম্। তারপর সালিশী সভায় সওয়া

হাত নাকে খৎ আর সেই সভার সভাপতি ঐ আসামী দ্বিজেন গাঙ্গুলী। কেমন, ঠিক কিনা? পুঁটুরাণীর পায়ে ধরে তাকে মা বলে ডাকতে হয়নি আপনাকে?

বিশু একেবারে নীরব, নিশ্চল।

রজনী দাস বলতে লাগলেন: চুপ করে থেকে রেহাই পাবে না, হাকিমের সম্মুখে যে সব প্রশ্ন করেছি, তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়ে যেতে হবে। তুমি গাঁজাখোর, মদখোর, চরিত্রহীন, তুমি কয়েকটা টাকা পেয়ে এসেছো মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে—সত্যি কিনা?

বিশু পাথর হয়ে গেছে!

একটু পর বললেন রজনী দাস: তাহলে এক কাজ কর। ঐ কালো মুখ আর দেখিয়ো না, নেমে পড়, সরে পড়।

এই উপদেশটা খুব ভালো লাগলো বুঝি। তাই সে গুটি গুটি পা ফেলে একেবারে আদালত কক্ষের বাইরে প্রস্থান করে নিজের চামড়া বাঁচালো।

আদালত কক্ষে হাসির ফোয়ারা ছুটলো। ভবেশ রায়ও যোগ না দিয়ে পারলেন না।······

রাজসাক্ষী কালাচাঁদকে জেরা চললো চার দিন। সে বললো যে, সে বি ভি দলের সভ্য। বিপদভঞ্জন তাকে দলে টেনে নিয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যা ও ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহই এই দলের কাজ। দ্বিজেন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পূর্ব্বে বহুবার ডাকাতি ও হত্যার ষড়যন্ত্র চলেছে। নানা কারণে তা কার্য্যকারী হয়ে ওঠেনি। দেলভোগের ডাকাতিতে সে অংশ গ্রহণ করেছিল। দ্বিজেন গাঙ্গুলীর এক হাতে ছিল একটি ছোট লাঠি, আর এক হাতে সবুজ খাপে ভরা একখানা ছোরা। কোমরে ছিল রিভলভার জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য।

রজনী দাসের অবিশ্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠলো কালাচাঁদ। অসতর্ক মুহূর্ত্তে আই বি-র শেখানো অনেক কথাই বেরিয়ে এল, অসংলগ্ন জবাবকে শোধরাতে গিয়ে তা আরও জটিল করে ফেললো, উকিলের প্রত্যেকটি অভিমতকেই সোজা অস্বীকার করতে গিয়ে সহজ সত্যকেও শোচনীয়-ভাবে বিকৃত করে ফেললো। কিছুই মনে পড়ছে না বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টাকে রজনী দাস নির্ম্মম হাতে চূর্ণ করে দিলেন, প্রশ্ন করলেন: কী কী দিয়ে দুপুরে আজ খেয়ে এসেছো, মনে পড়ছে তা?

মূর্খ কালাচাঁদ বলে বসলো: না।

কেন, আই বি তা শিখিয়ে দেয়নি ? বলেনি, ভাত খেলে বলবে, খাইনি, মাছ খেলে বলবে, ডাল খেয়েছি, ডাল খেলে বলবে, তরকারি ?—আমি বলছি, তুমি একটি মিথ্যেবাদী—a downright liar……

দেলভোগের পথে যাদের ওপর রাহাজানি হয়েছিল, এবার প্রকাশ্য আদালতে দিনের আলোয় তাদের দেখতে পেলাম। সরল মুসলমান, সরলভাবেই বললো, যারা ডাকাতি করেছিল, তাদের চেহারা তাদের মনে নেই। তবে তাদের দাড়ি ও পরনে লুঙ্গি ছিল। এই আসামীদের মধ্যে কেউ ছিল বলে তাদের মনে পড়ছে না।

এদের তোতাপাখীর বুলি শিখিয়ে দেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি আই বি। কারণ F I R অর্থাৎ ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্টে এদের যে জবানবন্দী আড়াই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনগর থানার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তাকে তো উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। অথচ প্রধান সাক্ষী হিসেবে এদের আদালতে হাজির না করলেই নয়।

রজনী দাসও এদের বিশেষ জেরা করলেন না।

তারপর শুরু হলো সওয়াল। সাক্ষীদের নিরপেক্ষ বিবৃতি উল্লেখ করে বলতে লাগলেন কোর্ট ইনসপেক্টার : সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা সবাই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামক গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য এবং দ্বিজেন গাঙ্গুলী এদের নেতা। বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে হিংসাত্মক উপায়ে উৎখাত করাই এদের লক্ষ্য। গ্রামের লোকেরাও এদের জানতো, কিন্তু কথায় কথায় এরা মারধর করে, ছুরি চালায় বলে ভয়ে সে কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করতো না। দেলভোগে যে সব বেপারীদের ওপর ডাকাতি হয়েছে, তারা সরল, অনভিজ্ঞ মুসলমান চাষী। টাকা প্রথমটা দিতে না চাওয়ায় এরা ছুরির ফলা ওদের কাঁধে খানিকটে বসিয়ে দেয়। টাকা না দিলে হয়তো হত্যাই করতো ওদের। দ্বিজেন গাঙ্গুলীই হচ্ছে এই ডাকাত দলের প্রধান পাণ্ডা। তারই প্ররোচনায়, ব্যবস্থাপনায় এই ডাকাত দল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের চেষ্টা করে, সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে, ডাকাতির পরিকল্পনা করে। দ্বিজেনই এদের—

রজনী দাসের সওয়াল চললো চার দিন। ঐ খর্ব্বকায় ক্ষীণদেহ মানুষটির

মধ্য থেকে যে বজ্রনির্ঘোষ বেরিয়ে এসেছিল, আজও তা মনে পড়ে। সরকার পক্ষের প্রত্যেকটি সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে, তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে এবং এই মামলা দায়ের করার ব্যাপারে অযৌক্তিক বিলম্বের অন্তর্নিহিত কারণ দেখিয়ে রজনী দাস বললেন: বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসে একে একটি অভূতপূর্ব্ব মামলা বলা যেতে পারে। ডাকাতি হয়েছে আড়াই বছর আগে। ডাকাতি একে বলা যায় না, বলা উচিত highway robbery কিংবা তাও নয়। একে agressive type of snatching অর্থাৎ জবরদস্তি ছিনতাই বলা যেতে পারে। যাদের ওপর ছিনতাই হয়েছিল, তারা আসামীদের সনাক্ত করেনি। কোনো T. I. parade-ও হয়নি। বরং তারা বলেছে আসামীদের কাউকে তারা দেখেনি। শ্রীনগর থানার দারোগা দেলভোগ পাবলিক হাউস থেকে জনকতক লোককে চালান দিয়ে পরে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে মামলা ইতি করে রেখেছেন। সুতরাং আদালতেব কাছে আমার প্রশ্ন: এই ডাকাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে কেউ দেখেছেন কি আসামীদের? অকুস্থানের আশেপাশে এদের কাউকে দেখা গেছে কি? এদের গৃহ তল্লাশী করে কোনো রিভলভার বা ছোরা অথবা লুণ্ঠিত অর্থ পাওয়া গেছে কি? আমার এই প্রশ্নগুলির একটিরও উত্তব যদি না হয়, তাহলে your honour, the prosecution has failed to connect them with the crime……

কোর্ট ইনসপেক্টার উঠে দাঁড়াতেই রজনী দাস হাত নেড়ে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বললেন: Yes, Mr. Inspector, I am coming to the Approver, don't you worry—সরকার পক্ষের একটি মাত্র সাক্ষী—হারাধনের একটিমাত্র ছেলের মতো—এই রাজসাক্ষী কালাচাঁদ দাস। সম্রাটের ক্ষমা পেতে হলে যা-যা যেভাবে বলা উচিত, সে সে-ই ভাবে বলবার চেষ্টা করেছে। But where is his corroboration? যা সে বলবে, তাইতো আর gospel truth বলে মেনে নেয়া যায় না, আইনেও তার পথ নেই। সে বলেছে, দ্বিজেনের এক হাতে ছিল রিভলভার, অপর হাতে একটি পাচনবাড়ি, সাধারণতঃ গরু চড়াবার জন্য যা ব্যবহৃত হয়। ডাকাতি করতে যাবার সময় কোমরে রিভলভার এঁটে কেউ কি ঐ পাচনবাড়ি নিয়ে যায়? ওটা কি একটা কোনো হাতিয়ার? বরং হাট থেকে গরু নিয়ে যারা যাচ্ছিলো, তাদের হাতেই ওটা থাকা সম্ভব। কালাচাঁদের মুখে পাচনবাড়ির গল্পটা পুরে দিয়ে প্রসিকিউশন ডাকাতির সঙ্গে দ্বিজেনকে connect

করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ঘটনার কথা বাদ দিয়েও যদি কালার্চাদের সাক্ষ্য ও জেরার উত্তরগুলি একেবারে পৃথকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়, রজনী দাসের কণ্ঠস্বর এবার আদালত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে তুললো : তাহলে দেখা যাবে, সে সত্য কথা গোপন করেছে, সে অনেক half truth ও untruth বলেছে, আরব্যোপন্যাসের অনেক গল্প ফেঁদেছে সে এবং একা সব দিক সামাল দিয়ে নিজে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থকাম হয়েছে। He is a liar, a puppet in the hands of Police and an unsuccessful product of the brain of the Intelligence Branch······

বুঝতে পারলাম, দেশবন্ধুব তামাক খুব ভালো করেই সাজা শিখেছিলেন রজনী দাস!

বহু উকিল-মোক্তার এসে শুনতে লাগলেন স্মরণীয় সেই বক্তৃতা। এমনি যুক্তিপূর্ণ তাঁর ভাষণ যে, তাঁরা প্রকাশ্যেই বলাবলি করতে লাগলেন আই বি-র ব্যর্থতার কথা। টুকরো কথা কানেও ভেসে এল : এদের আর আটকাতে পারবেন না হাকিম। আমরাও আশান্বিত হয়ে উঠলাম যে, হয়তো বা তাই হবে।

কিন্তু আমাদের সকল আশা, শ্রোতাদের সকল ধারণা, আত্মীয়জনের সমস্ত কল্পনা চূর্ণ করে দিয়ে রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায় স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫৯৫ ধারা অনুযায়ী হত্যার চেষ্টাসহ ডাকাতি এবং ১২০থ ধারা অনুযায়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অপরাধে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করে যে দীর্ঘ রায় পাঠ করলেন, দেখা গেল, তাতে দ্ব্যর্থহীনভাষায় বললেন যে, সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা চোর, আমরা ডাকাত, আমরা খুনী, আমরা নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করি, ছুরি-ছোরা বোমা-পিস্তল নিয়ে আমরা চলাফেরা করি, আমরা ষড়যন্ত্রকারী, আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টকে হিংসাত্মক উপায়ে ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য, মহামান্য ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমই ছিল আমাদের কাজ, আমরা বিপথে-চালিত কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক, সংশোধনের অতীত সমাজের কলঙ্ক। সুতরাং—

সুতরাং রাজভক্ত স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায় রাজভক্তির পরকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রদত্ত রায়ে ব্যবহার করলেন মুখস্থ-করা বিদ্যার মতো কোর্ট

ইনসপেক্টারেরই সওয়ালের ভাষা, তাঁরই ব্যবহৃত যুক্তি ও ইডিয়ম এবং গম্ভীরমুখে দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলেন :

দ্বিজেন গাঙ্গুলী—৭ বৎসর
রঙ্গলাল গাঙ্গুলী
খগেন চাটার্জ্জী —প্রত্যেকে ৫ বৎসর
অনাথ চক্রবর্ত্তী
বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জী—২ বৎসর
কালাচাঁদ দাস—সম্রাটের অনুকম্পায় খালাস

স্পেশ্যাল ক্ষমতার একেবারে পুরোটাই যে ব্যবহার করবেন আমার বেলায় এতটা, এমন কি, অবিনাশ দারোগাও বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি। দণ্ডাদেশ শোনাবার পর পুলিশ অফিসে আনবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টই বললেন অবিনাশবাবু : জেল হয়ে যাবে, তা জানতাম দ্বিজেনবাবু, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতটা হবে আশাই করতে পারিনি। কোর্ট ইনসপেক্টারও সায় দিলেন : We could not even dream—

আমি হেসে জবাব দিলাম : There are many things in the world Horatio, which are not dreamt of···ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি স্বপ্নেও না ভাবতে পারলেও ভবেশ রায় স্বপ্ন দেখছেন 'স্যার' হতে পারেন কিনা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে।······

তখনই সবাইকে রওনা করে দেওয়া হলো মুন্সীগঞ্জ থেকে। ঢাকা জেলে যখন এসে পৌঁছোলাম, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। সংবাদ বোধহয় পূর্ব্বেই পাঠানো হয়েছিল। দেখলাম, রেজাক সাহেব অফিসে বসে আছেন প্রতীক্ষায়। অকস্মাৎ খুব গম্ভীর মনে হলো। সদালাপী, সদা হাস্যময় রেজাক সাহেব এমনি নীরব কেন? কেন মুখ তুলে চাইছেন না? এ্যাডমিশন রেজিস্টাররূপী বিরাট খাতাখানা খুলে কি দেখছেন তাতে মুখ নীচু করে? আবহাওয়া লঘু করার চেষ্টায় দু-এক টুকরো হাসির কথা বললাম। হাসলেন না। এমন কি, সেই পরিহাসে যোগদানও করলেন না। যেন আমার কথা শুনতেই পাননি। কিংবা অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক ও আলোচনার অনুপযুক্ত আমার কথা!

শুধু বললেন : ডিভিশন পেয়েছেন কিনা, কাগজপত্র থেকে তা বুঝতে পারছি না। আজ সিভিল ইয়ার্ডেই থাকুন, কাল যা হয় হবে।

চলেই যাচ্ছিলেন, ডাকলাম : রেজাক সাহেব !

ফিরে দাঁড়ালেন মুখ নীচু করে। বললাম : এবার আর ডেটিনিউ নই, কয়েদী। সাত বৎসরের মেয়াদী কয়েদী। কিন্তু একেবারে যে চিনতেই পারছেন না আমায়, ব্যাপার কি ?

কিছুই বললেন না তিনি। অকস্মাৎ পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বার করতে করতে ত্রস্তপদে গেটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গেট বন্ধ হয়ে গেল।

উদগত অশ্রু চেপে রাখতে না পেরেই কি রেজাক সাহেব পালিয়ে গেলেন ?······

সিভিল ইয়ার্ডে এসে দেখি সেই কক্ষ, যেখানে ক'মাস পূর্ব্বেও আমি রাজবন্দী হিসেবে রাজত্ব করে গেছি। কিন্তু আজ রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়েছে, এবার জন্মলাভ করেছে কয়েদী দ্বিজেন !

গোটা তিনেক করে ঘোড়ার কম্বল ফেলে দিয়ে গেল সিপাই। যেমন ময়লা, তেমনি এর দুর্গন্ধ। লোহার খাটে গদী পাতা বটে, কিন্তু চাদরও নেই, বালিশও নেই, মশারিও নেই। একটু পরই এল খাবার। এ্যালুমিনিয়ামের ধার-উঁচু থালায় মোটা চালের ভাত, কালো মটরের ডাল, ডাল নয়, ডালের জল বলা যায়। ভাতের মধ্যে একটা গর্ত্ত তরকারিতে ভর্ত্তি। এক কোণে এক টুকরো তেঁতুল। এই হচ্ছে খাদ্য। বছরের পর বছর এই খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিধা বা সঙ্কোচ করে লাভ নেই। বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। সবাই মেঝেতে বসে গেলাম এবং নাক দু' আঙ্গুলে টিপে রেখে দুর্গন্ধময় সেই খাদ্য বা অখাদ্য গোগ্রাসে গিলে ফেললাম। তারপর ঘোড়ার কম্বলে শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করে দিলাম। শীতের রাত, অসহ্য মশার উপদ্রবেও পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি শুতে যেন ভালোই লাগছিল।

কিন্তু সবাই চুপ, একেবারে চুপ। যেন কথা সব ফুরিয়ে গেছে। নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি, কেউ ঘুমোয়নি ওরা। চোখের পাতায় আগুনের হল্‌কা !—

বহুক্ষণ পর অকস্মাৎ বলে উঠলো বিপদভঞ্জন : দাদা, তাহলে সত্যিই কি শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হলাম আমরা আই বি-র কাছে ?

বললাম : এ পরাজয় সাময়িক। দু' বছর পরই তো তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ। আবার নতুন করে দল গঠন করবে, কাজ শুরু করবে, যাতে রঙ্গলাল, খগেন আর অনাথ পরে গিয়ে তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। হয়তো কোথাও ত্রুটি ছিল আমাদের, তাই এবারকার সংঘর্ষে পরাজিত হলাম। দু' বছর পর যে সংগঠন গড়ে তুলবে, তাতে যেন কোথাও কোনো ত্রুটি না থেকে যায়।

অনাথ বললো : কিন্তু আপনাকে যে একেবারে সাত বৎসরের জন্য আটকে ফেললো দাদা!

হাসবার চেষ্টা করলাম : তাতে কি হয়েছে? ইষ্টমন্ত্র যদি না ভুলে যাও, তাহলে গুরুদেবের অবর্ত্তমানেও ভক্তি ও নিষ্ঠার দৈন্য আসতে পারে না!

খগেন বলতে চেষ্টা করলো : তবু দাদা, আপনাকে ছাড়া আমাদের কাজ—

সে কথা কানে তুললাম না, বললাম : বিপ্লবীকে সরিয়ে ফেললেও বিপ্লবকে হত্যা করা যায় না, ভাই! তা যদি হতো, তাহলে ক্ষুদিরামের ফাঁসির সঙ্গেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের হতো যবনিকা পতন। তা হয় না, হতে পারে না। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলাম একদিন, আমার ভূমিকা শেষ হয়ে গেল, তাই প্রস্থান করলাম। কিন্তু নাটক কি তাতে শেষ হয়ে যায়? এই রক্তের হোলিখেলা চলবে তত দিন, যত দিন না আমার মায়ের শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়ে!······

কেউ আর কথা কইলো না, আমিও চুপ করে গেলাম।

জেলের গেটে ঘন্টা বাজলো—এক, দুই, তিন!

সতেরো

সেই গদীহীন খাটে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ঘোড়ার কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসেই জাঁক-জমকের সঙ্গে আমরা শেষ করলাম প্রাতরাশ। আত্মস্থ হয়ে উঠেছি আমরা ততক্ষণে। আগামী কয়েকটি বৎসর যে নিশ্চিতভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কহীন অবস্থায় কারাপ্রাচীরের মধ্যে কাটাতে হবে, সে সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে পড়েছি।

সবার চাইতে গম্ভীর দেখলাম রঙ্গলালকে। সে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার মনের কথা মন দিয়ে যেন শুনতে পেলাম আমি। এই মর্ম্মান্তিক নাটকের সেই তো রচয়িতা। বিপদভঞ্জনের সঙ্গে নিছক ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের সূত্র ধরে ওকে জেলে পাঠিয়ে জব্দ করবার ফন্দী আঁটতে গিয়ে অবশেষে যে অজানতে আমাকেও জড়িয়ে ফেলবে সে, মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবতে পারেনি তা। অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি ওর, দশটা বিভূতি সাহাকে সে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে, এ সত্য বিভূতি সাহা নিজেও জানতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে রঙ্গলাল বোধহয় এই প্রথম ও আমি জানি, এই শেষ একটি মহাভ্রম করে ফেলেছে। বিভূতি সাহার মিষ্টি কথার হাসনুহানার ঝাড়ের নীচে যে আই বি-র কালসাপ আত্মগোপন করে ছিল, রঙ্গলাল প্রথমটা বুঝতে পারেনি তা। বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বিভূতি সাহা যখন অকস্মাৎ ফণা তুলে ধরলেন, তখন আমি ঢাকা জেলে পৌছে গিয়েছি। আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটতে দেবেন না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তারপর যখন দেখা গেল গৈরিক পোশাকের অন্তরালে তাঁর লুকোনো রয়েছে তীক্ষ্ণধার ছুরি, রঙ্গলাল তখন প্রমাদ গনলো। আমার পত্র পাওয়ামাত্র মনে মনে সে শপথ গ্রহণ করলো যেভাবে হোক্ আমায় সে রক্ষা করবে। কালাচাঁদও তৎক্ষণাৎ তার হাতে হাত মিলাতে দ্বিধা করলো না। রঙ্গলাল বিভূতি সাহাকে যা বলেছিল, তার মধ্যেও ছিল তার শাণিত বুদ্ধির খেলা, নেহাৎ যতটুকু বললে বিপদভঞ্জনকে ও তার দলীয় ক'জনকে ফাঁদে ফেলা যায়, ঠিক ততটুকু ওজন করে তুলে দিয়েছিল সে সাহার হাতে। কিন্তু কালাচাঁদ শেষ পর্য্যন্ত সেজে বসলো পরম বৈষ্ণব। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের উন্মাদনায় সে একে একে মাটি খুঁড়ে

খুঁড়ে অনেক কঙ্কাল তুলে দিল আই বি-র হাতে। শুধু অসঙ্কোচে নয়, উৎসাহের সঙ্গে। কারণ গ্র্যাসবি ওকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদের সাজা হয়ে মামলার যবনিকাপাত হয়ে যাবার পরই ওকে পাঠিয়ে দেবেন একেবারে দার্জ্জিলিংএ। সেখানে পুলিশের দপ্তরে তার চাকরি একেবারে স্থির হয়ে আছে। তাই একদিকে সে যেমন সহাস্যে রঙ্গলালকে সমর্থন করলো, অপর দিকে সে সমস্ত গোপন তথ্য ও সর্ব্বশেষ পরিণতি জানিয়ে দিল বিভূতি সাহাকে।

বিভূতি সাহা আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কৌশলে রঙ্গলালের হৃদয় জয় করতে অবশ্যই কোনো কিছু প্রকাশ না করে। কিন্তু নিরাশ হয়ে যখন দেখলেন রোগ হকিমির বাইরে চলে গেছে, তখন 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি অনুসরণ করে কালাচাঁদকে আগলে রইলেন যক্ষের মতো!…অবশেষে কালাচাঁদই তাদের মুখরক্ষা করেছে।

রঙ্গলাল কিন্তু অটল রইলো তার সংকল্পে। রাজসাক্ষী যেমন সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষে করলে বৃটিশ সম্রাট অকৃপণ হস্তে করুণা বিতরণ করে থাকেন, তেমনি স্বীকৃতি অকস্মাৎ প্রত্যাহার করে সব দোষ পুলিশের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে উদ্যত হয়ে ওঠে তাদের কঠোর দণ্ড, তাদের ক্রোধ তৃণের মতো দহন করবার জন্য বিস্তার করে লোলজিহ্বা!…রঙ্গলাল তা জানতো এবং ভালো করেই জানতো যে, এতেও সে তার দাদাকে রক্ষা করতে পারবে না। তথাপি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যে ভুল সে করে বসেছে, তারই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করবার শপথ গ্রহণ করলো সে। ধূপের মতো নিঃশেষে নিজকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবার জন্যই অধীর হয়ে উঠলো সে। তাই জেঙ্কিন্‌স্‌এর এজলাসে প্রতিদিনই সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো আমার সঙ্কেতের প্রত্যাশায়। ভুল বুঝে একদিন সে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় গিয়ে আসল কথা গোপন করে অবশেষে তাঁকে জেলের থাকা ও খাওয়ার কতকগুলো কাল্পনিক অসুবিধের কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকার চেয়েছিল।

তারপর মামলার প্রথম দিনেই নাটকীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে আমাদের কাঠগড়ায় এসে ওঠবার পর বিপদভঞ্জন যখন উল্লাসে চীৎকার করে অভ্যর্থনা জানালো, ভাবাবেগে সে তখন বেশ কয়েক মিনিট রইলো মাথা নীচু করে! আত্মস্থ হতে একটু সময় লেগেছিল তার।

জানালার বাইরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও আমি জানি, মনে তার

এতটুকু শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই। কী মারাত্মক পরিণতি হলো ব্যক্তিগত মনকষাকষির! এ যে কল্পনাও করেনি সে। দাদা যে তার শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক এবং বিশেষ করে তার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে বিক্রমপুরের কাজের যে অপরিমেয় ক্ষতি হবে, সেই আশঙ্কাতেই একেবারে পাথর হয়ে বসেছিল রঙ্গলাল।……

রায় বাহাদুর ভবেশ রায় আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করবার আদেশ দেবার কথা চিন্তা করে দেখবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁর রায় শোনাবার সময়, কিন্তু দেখা গেল, সেটা একেবারেই ভাঁওতা।

খানিক পরই গেলাম আমরা গুদামে। সেখানে নিজেদের ধুতি, শার্ট, জুতো ত্যাগ করে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর পোশাক পরলাম। একটি জাঙ্গিয়া, অনেকটা আধুনিক আণ্ডারউইয়ারের মতো, তবে কোমর থেকে যেমন হাঁটুর প্রায় আধ হাত ওপর এসেই থেমে গেছে, তেমনি পা ঢোকাবার ফাঁকটুকুও বেশ ছোট। গায়ে দিলাম যা, তাকে বলা হয় কুরতা। ধরুন একটি খাটো-ঝুল পাঞ্জাবী, পকেট নেই তার। তারপর হাতা কেটে শর্ট স্লিভ করলেন একেবারে গেঞ্জির মতো। কলার তৈরী হলো এমনি যাকে প্রায় হাই-কলারের অপভ্রংশ আখ্যা দেওয়া যায়। কোনো মাপ নিয়ে তৈরী করা হয় না বলেই বেশ ঢিলেঢালা। মাথায় পরলাম টুপি। অনেকটা মুসলমানদের কিস্তির টুপির মতো। এক টুকরো কাপড় কুরতার ওপর দিয়ে কোমরে জড়ালাম। তারপর তিনটে কম্বল, একখানা এ্যালুমিনিয়ামের ধার-উঁচু মাঝারি আকারের থালা ও বেশ বড় সাইজের একটি এ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে এসে একেবারে সোজা হাজির হলাম চল্লিশ ডিগ্রিতে। সেখানে একা আমায় রেখে ওদের সবাইকে বিভিন্ন খাতায় নিয়ে যাওয়া হলো। আই বি নাকি পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের সবাইকে পৃথক পৃথক রাখতে Dangerous prisoners…

সম্বর্দ্ধনা জানালেন রাজনৈতিক বন্দীরা কলরব করে। কারণ তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো এবং তা দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দিয়ে। লেবং মামলার সুশীল বললো: জানতাম ওরা withdraw করলেও আপনাকে ছাড়বে না, কারণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়ে গেছে। তা—কদ্দিন?

হেসে জবাব দিলাম : স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কলমের জোর যতখানি—

অ্যাঁ, বলেন কি, একেবারে সাত বৎসর !—বিস্ময় প্রকাশ করলেন ক'জন। আর এ্যাপ্রুভারদের ?

বললাম। ঘটনা শুনে সুশীল বললো : তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার কালাচাঁদকে। অতটুকু ছেলে, কেমন যেন গম্ভীর, বেশী কথা কয় না—

কোথা থেকে এসে হাজির হলো মৈনুদ্দীন। থমকে দাঁড়ালো : এ কি, আপনি ! ডিভিশনও দেয়নি শালারা ? আপনি কি পারবেন বাবু এই খাওয়া খেতে ?

হাসি পেল।

সশ্রম কারাদণ্ড। সুতরাং পরদিনই সকালবেলা শ্রমের কাজ এসে পড়লো। এক মণ ডাল আর একটা ভারী যাঁতা, কুলো আর একখানা ছোট্ট ঝাঁটা। ঐ এক মণ ডাল ভাঙতে হবে, ঝাড়তে হবে, তারপর আবার বস্তাবন্দী করে জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। এমনি প্রতিদিন। কখনো কখনো একটি চালুনি ও একটা ডালাও দেয় পরিষ্কারভাবে কাজ করবার জন্য।

কিন্তু নিজে হাতে আর ডাল ভাঙতে হলো না আমায়। সুশীল বললো : আপনার কিছু করতে হবে না দ্বিজেনদা'।

দেখলাম সে বস্তা থেকে কয়েক সের ডাল ঢেলে নিয়ে ভেঙে, ঝেড়ে আবার তা বস্তায় ভরে দিয়ে বেশ টাইট করে বেঁধে রাখলো। জিজ্ঞেস করলাম : ও কী করলে ?

বললো : জানেন না, এটাই আমাদের রীতি। এক মাস এমনি ডাল ভাঙাবার নিয়ম এঁদের। কিন্তু এমনিভাবে গোঁজামিল দিই বলে দিনসাতেক পরই ওরা বদলে দেয় বিরক্ত হয়ে। তখন দেয় চৌকীদার-দফাদারের কোটে টাক দেবার কাজ। তাও-বা কে করে ? তারপর আর দেয় না।

গোলমাল করে না এজন্য ?

বহু গোলমাল হয়ে গেছে। বহু রাজনৈতিক বন্দীকে সাজাও দিতে কসুর করেনি প্রথম প্রথম। কিন্তু তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বিকেলের দিকে ডালের বস্তা নিয়ে যাবার সময় মৈনুদ্দীন জিজ্ঞেস করলো : ভালো করে ভেঙেছেন তো বাবু ?

জবাব দিল সুশীল: নিশ্চয়ই।—বলে মুচকি হাসলো। মৈনুদ্দীনও হাসলো। অর্থাৎ সেও জানে।

একদিন বিকেলে সারি দিয়ে খেতে বসেছি আমরা। কালো রংয়ের মটর ডাল, কিছু আস্তও আছে তাতে। একদিকে ডাল, আর একদিকে জল। দু'চারটে পেঁয়াজের খোসা ভাসছে আর অকস্মাৎ তাতে কোনো কোনো দিন দেখতে পাওয়া যায় এক-আধটি শুকনো লঙ্কা, ফোড়নের ভাজা কালো শুকনো লঙ্কা। জজের মুখে হাসির মতোই কচিৎ! আর পেয়েছি কালো, মিশমিশে কালো তরকারি। তাতে কি ছিল, কি আছে জানিনে। সব কিছুই সেদ্ধ হয়ে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। অনেকটা ঘাসের ঘণ্টের মতো। আমি আবার স্টাইল করে নিয়েছি খানচারেক রুটি, যেমন পাতলা, তেমনি বৃহদাকার, পূর্ণিমার চাঁদের মতো! টুকরো রুটি সেই ডালে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ব্যঞ্জন-সহযোগে গলাধঃকরণ করছি, এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল: সরকা—ঠ, শ্লাম।

রেজ্জাক সাহেব পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। চল্লিশ ডিগ্রির বাইরের লন্-এ বসেছিলাম আমরা। রেজ্জাক আমায় দেখতে পেয়েই হাসপাতালের পথ ছেড়ে ফিরে এলেন। একেবারে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। হেসে বললাম: ভালো আছেন?

জবাব দিলেন না। ভারী ক্ষুণ্ণ হলাম, রাগও হলো। এই সেদিনও সিভিল ইয়ার্ডে রাজবন্দী দ্বিজেনবাবুর অসুখের জন্য ব্যস্ততার সীমা ছিল না যাঁর, আজ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলতেই তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগলো? এতখানি দম্ভ সামান্য এক ডেপুটি জেলারের?···কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ভুল ভাঙলো আমার তার পরক্ষণেই। দীর্ঘ পাঁচটি মিনিট পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি আমার আহার্য্যের পানে, তারপর বোধহয়, বোধহয় কেন নিশ্চয়ই, একটি অবাধ্য দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপবার জন্য তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।······

বিকেল চারটের মধ্যেই শেষ করতে হয় রাতের আহার। তারপর যখন পৃথক পৃথক সেলে তালা পড়ে, তখনো জেলের ওপরকার টুকরো আকাশ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লাল কিরণে আলোকিত মনে হয়। তাই তখন বসে যায় আমাদের দৈনিক সভা বা বিচিত্রানুষ্ঠান। কেউ তোলেন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক

আলোচনা, কেউ ফাঁদেন হারুণ-অল্‌-রশীদের গল্প, কেউ আবৃত্তি করেন, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর—' আবার কেউ একখানা বাগেশ্রী বা বেহাগে টান দেন। হল্লা হয় না আদৌ, পর পর কাজগুলো শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে থাকে, পরিচালনা করেন চট্টগ্রামের মণি সেন। রাজবন্দী ছিলেন সাভারে। একদিন যাত্রা শোনবার জন্য নাকি বেশ কয়েক মাইল দূরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন আর-এক গ্রামে। দারোগার সঙ্গে ছিল মনোমালিন্য। তিনি সে রাতে ছিলেন মফস্বলে, তাই এই নৈশ অভিযান। কিন্তু রাত নাকি সেখানেই নামে, যেখানে ওৎ পেতে বসে আছে নেকড়ে বাঘ! দারোগা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে থানায় ফেরবার পথে সেই যাত্রা দেখতে গিয়ে হাজির।—ব্যস্‌, দুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল একেবারে রণক্ষেত্রে! মণিবাবুর সাজা মাত্র তিন মাস। ডিভিশন পেয়েছেন। গদী-আঁটা খাটে শয়ন করেন।

আর আমাদের জন্য বিছানো আছে পরিষ্কার মেঝে। পরিপাটি করে বিছিয়ে দিয়েছি একখানা কম্বল, তার ওপর পাতা হয়েছে সেই টুকরো কাপড়টি। একখানা কম্বল গুটিয়ে বালিশের মতো করে নিয়েছি। আর একখানা যেন মুড়ি দেবার ইটালিয়ান রাগ। রাজনৈতিক বন্দীদের একটা সুবিধে আছে, ইচ্ছে করলে তাঁরা বাড়ী থেকে মশারি আনিয়ে নিতে পারেন। রাত্রে মলত্যাগের ব্যবস্থাটি চমৎকার। আমাদের শয্যা থেকে ফুট তিনেক দূরে একটি পাত্র, মোটা করে আলকাতরা লাগানো। তলায় খানিকটে ফিনাইল। ঢাকনি আছে। ঘরে আছে সেই থালা ও বাটিভরা জল, ঘরের এক কোণে একটুখানি মাটি, অথবা মণি সেনের কাছ থেকে আনা ক্ষুদ্র এক টুকরো সাবান। সুতরাং অসুবিধে কোথায়? পাটহীন শিকের দরজায় কেউ কেউ একখানা কম্বল ঝুলিয়ে দেন, কেউ কেউ সেই সঙ্কীর্ণতার স্তর থেকে আরও অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছেন। অনেকেই আরও অনেক উর্দ্ধে উঠে গিয়ে প্রায় ত্রৈলঙ্গ স্বামী হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ ঐ পাত্রের ওপর বসে বসেই তাঁরা বারান্দার সিপাইজীর সঙ্গে দু'চারটে বাৎচিৎও চালান বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে।

পাকুড় রাজ এস্টেটের মামলার বিনয় পাণ্ডে ছিলেন আমার পাশের ঘরে। ছ'ফুট লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মিষ্টভাষী। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী নন, সিলেবাস-বহির্ভূত নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও প্রচুর। শুধু একেবারে অজ্ঞ রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে সে যুগের বিপ্লবীদের রাজনীতি।

একদিন নৈশ সভায় মন্তব্য করলেন তিনি : তাহলে তো মণিবাবু, ভারী সুবিধে রাজনৈতিক ডাকাতিতে। যেমন পাওয়া যায় এক কাঁড়ি টাকা, তেমনি মেলে দেশজোড়া খ্যাতি। টাকাকে টাকা, নামকে নাম—

মণি সেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : কিন্তু একবার ধরা পড়লে একেবারে দড়িকে দড়ি। সেখানে আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা নেই—

কক্ষে কক্ষে হাসির রোল পড়ে গেল। বিনয় পাণ্ডে বলে উঠলেন : ওরে বাব্বা, আর দড়ির কথা বলবেন না মণিবাবু। এগারো মাস আলীপুরে ফাঁসির সেল-এ থেকে সে দড়ির খেলা দেখেছি আমি। মনে হয় অন্ততঃ এগারো বার ফাঁসি হয়ে গেছে আমার।

ফাঁসির হুকুম হয়েছিল বিনয় পাণ্ডে আর তাঁর সহ-আসামী তারিণীর প্রতি। নামটি আজ আর মনে পড়ছে না, তারিণীও হতে পারে, হরিচরণও হতে পারে। এগারো মাস চলে হাইকোর্টের আপীলের শুনানি। এই এগারোটি মাসের মধ্যে একটি দিন, একটি রাত, একটি নিমেষের জন্যও ঘুমোতে পারেননি বিনয় পাণ্ডে। তারিণী তো পাগলই হয়ে গেল। তারপর বেরুলো হাইকোর্টের রায়—ওদের ফাঁসির হুকুম রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের মতলব ভাঁজছিলেন বিনয়, আমরাই বুঝিয়ে নিরস্ত করেছি। কে জানে সেখানে যদি আবার উল্‌টে ফাঁসি হয়ে যায়?……

ছয় ডিগ্রিতে মাত্র ছ'জন বন্দী আছেন, লেবং মামলার আসামী রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের অন্যতম। ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার যোগেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ফাঁসির হুকুমই হয়েছিল, কিন্তু পাদ্রী নর্থফিল্ড সাহেবের হস্তক্ষেপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। তাই সুশীলের পরামর্শে আমি নানা অভিযোগ শুরু করলাম সুপারের কাছে। পাটনী তখন ফিরে গেছেন প্রেসিডেন্সী জেলে, কারণ হোম থেকে ফিরে এসেছেন স্বনামধন্য লিওনার্ড। জেলর আছেন সেই সুধীন মুখার্জ্জীই। পর পর অভিযোগ জানাবার ফলে সহসা একদিন আমায় বদলী করা হলো ছয় ডিগ্রিতে নয়, চার নম্বর খাতার নীচের তলার কোণের ঘরে। সেখানে মাত্র পাঁচ জন রাজনৈতিক আসামী থাকেন আর পাঁচ জন সাধারণ কয়েদী। রবির ওখানে যেতে না

পারলেও তবু তো একসঙ্গেই একই ঘরে থাকতে পারবো দশ জন! তাই উৎসাহের সঙ্গেই চলে এলাম।

কে.কে ছিলাম, আজ আর মনে নেই। মনে আছে শুধু একজনের কথা, বরিশালের শান্তিরঞ্জন মুখার্জী। বয়স আমার চাইতে কয়েক বছর কমই হবে। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর চেহারা। সতীন সেনের দলের ছেলে। বরিশালের রাস্তায় একটি মস্যার পিস্তল সহ গ্রেপ্তার হন। পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

চার নম্বর খাতাতেই দোতলায় একেবারে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে ময়মনসিংহের জনকতক রাজনৈতিক বন্দীকে। ১১০ ধারায় সাজা হয়েছে তাঁদের। বিচারাধীন আসামী থাকতে পাগলা গারদে এঁদের জনৈক সহ-আসামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১১০ ধারার আসামী রাজনৈতিক বন্দীর সুবিধে পেতে পারে না। আর কয়েদীর পোশাকটি এমনি যে, ওর অন্তরালে আসল ব্যক্তির রূপটি একেবারে চাপা পড়ে যায়!

একদিন অকস্মাৎ শুনতে পাওয়া গেল, ময়মনসিংহের এমনি একজন দশ ধারার বন্দী ভূপেন সরকারকে ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে। তাঁর কম্বল তল্লাশী করে নাকি একখানা ক্ষুর পাওয়া গেছে।

পূর্ব্বেও বলেছি, একটি সামান্য দেয়ালের ব্যবধান থাকলেও জেল একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জগৎ। এর ভেতরকার কোনো কথা যেমন বাইরে আসতে পারে না, তেমনি বাইরের শোভনতা বা সামান্যতম ভদ্রতার বালাই এর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। কোনো জমাদার, সিপাই বা কোনো কয়েদী মেটের সঙ্গে আপনার মনকষাকষি হলেই জানবেন আপনি হয়ে পড়লেন তাদের টারগেট। কয়েদীদের তামাকপাতা দিয়ে হাত করে একদিন এমনি সন্তর্পণে আপনার কম্বলের ন.চে একখানা ক্ষুর ঢুকিয়ে দেয়া হলো যে, টেরই পেলেন না আপনি। অকস্মাৎ সিপাই এসে তল্লাশী করে সেখানা উদ্ধার করে নিয়ে গেল হয়তো আপনার অনুপস্থিতিতে ও অজানতেই। তারপর একদিন কেস্-টেবিলে হাজির করা হলো আপনাকে। সেখানে অভিযোগ পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল বিচার ও দণ্ডাদেশ! পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রয়োজন হয় না, ডাকা হয় না কোনো সাক্ষীকেও। এমন কি, অভিযুক্তের কী বলবার আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা, সে প্রশ্নও করা হয় না তাকে। কাজীর আসনে বসে সুপার তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না কিছুই, শুধু দণ্ডের বিবরণ লেখা ও রবার

স্ট্যাম্পমারা আপনার History Ticketএর নির্দিষ্ট স্থানে একটি কলমের আঁচড় রেখে যান।

তারপরই দেখা গেল, হয়তো আপনার খাদ্যের জন্য এসেছে পেনাল ডায়েট, পরনের জন্য এসেছে চটের পোশাক, অলঙ্কার হিসেবে এসেছে বেড়ি বা ডাণ্ডা-বেড়ি কিংবা এসেছে Night standing handcuffএর হুকুম। চালগুলো চালনিতে চেলে ও কুলোতে ঝেড়ে নেবার পর যে খুদ পড়ে থাকে, ফেনমিশ্রিত সেই খাদ্যকে বলা হয় পেনাল ডায়েট। সঙ্গে আর কিছু নেই, না ডাল, না তরকারি, না কিছু। যে জাঙ্গিয়া বা যে জামা পরেছেন, সুতোর তৈরি সে সব জিনিসের পরিবর্তে আপনাকে পরিয়ে দিয়ে যাবে চটের পরিচ্ছদ, চটের টুপি। দু'পায়ের কবজিতে দুটো লোহার বালা পরিয়ে কোমরের সামনের দিকে সুতো দিয়ে ঝোলানো আর একটি অমনি বালার সঙ্গে তা জুড়ে দেয়া হয় দুটো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, একে বলা হয় বেড়ি। ডাণ্ডা-বেড়ি একটু কঠোরতর সাজা। দেড় ফুট একটি ডাণ্ডা দিয়ে এক পায়ের বালার সঙ্গে আর এক পায়ের বালা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে পা অন্তত: দেড় ফুট ফাঁক করে চলতে হয়। Standing handcuff আরও কঠিন শাস্তি। ছ'ফুট উঁচুতে দেয়ালের একটি হুকের সঙ্গে হাতকড়া লাগানো হাত দু'খানা এঁটে দেওয়া হলো। এমনিভাবে থাকবে সারা রাত। অর্থাৎ সারাটি রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনাকে। হয়তো এমনিভাবে সাতটি দীর্ঘ রাত্রি!

প্রতিদিনকার ফলাফল লেখা হয়ে যাবে আপনার History Ticketএ। অর্দ্ধ ফুলস্ক্যাপ সাইজের খুব শক্ত এক-একখানা রুল-করা কার্ড, তাতে লেখা হয় বন্দীর কারাজীবনের খুঁটিনাটি সব ঘটনা—কবে এলেন, কোন্ খাতায় গেলেন, কবে কোন্ শ্রমের কাজ শুরু করলেন, কবে কোন্ অপরাধে কী সাজা পেলেন, কবে অসুখ হয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে গিয়ে পড়লেন, কবে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলেন, আবার কবে এক বৎসর সুবোধ বালকের মতো থাকার ফলে এক মাসের মেয়াদ কমে গেল—প্রত্যেকটি কথা এতে লেখা থাকে।

ভূপেন সরকারের এমনি টিকেটে এমনিভাবে একদিন লেখা হয়ে গেল যে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলের অভ্যন্তরে ন্যায়বিচারে তাঁর প্রতি ত্রিশ-ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। যে ক্ষুর তাঁর কম্বলের মধ্যে পাওয়া গেছে, তা দিয়ে নাকি মানুষের গলা কাটা যেতে পারে! সুতরাং—

সুতরাং একদিন ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসের এক সকালবেলায় আমাদেরই ব্যারাকের সমুখে একটি 'টিকটিকি' এনে খাড়া করা হলো। একে একখানা মই বলা চলে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করবার মতো ভূপেন সরকারের দুটি হাত প্রসারিত করে তার ওপর আটকে দেওয়া হলো, তেমনি করে পা দু'খানিও। জাঙ্গিয়ার বাঁধন আলগা করে দিয়ে অনাবৃত করে দেওয়া হলো তার নিতম্ব।

এবার বেতের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাত শুরু হবে সেই মাংসপিণ্ডের ওপর—একবার নয়, দু'বার নয়, দশবার নয়, গুনে গুনে পুরো ত্রিশ বার!

আঠারো

শুরু হলো দংষ্ট্রাঘাত এবং একসময় তা শেষও হয়ে গেল !, তালাবদ্ধ দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম শান্তি মুখার্জ্জী আর আমি। না, চোখ বুজিনি, কথা কইনি, নিঃশ্বাসও ফেলিনি বুঝি ! ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মুর্ত্তির মতো ! ······বেত মারবার বিশেষ কায়দা আছে একটি। দু'হাত দীর্ঘ শক্ত বেত, একেবারে নতুন। যে আঘাত করবে, সে ফুটবলের ব্যাকের মতো পেছন দিকে হটে গেল দশ বারো হাত, বেতখানা বাগিয়ে একেবারে না এসে দু'পা এগিয়ে এসে আধখানা ঘুরপাক খেল, তারপর ছুটে এসে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত হানলো সেই অনাবৃত নিতম্বের ওপর। অমনি বড় জমাদার গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, এক।

এমনি ত্রিশ বার। আঘাত হানার ভার নেয় সাধারণ কয়েদীরাই, এর জন্য এরা পায় তামাকপাতা, পায় বিড়ি আর মাসখানেকের রেমিশন অর্থাৎ দণ্ডমকুব। কিন্তু প্রত্যেকটি আঘাত কেটে যাওয়া চাই, নইলে আঘাতকারীরই উল্টে সাজা হয়ে যায়। এ জন্যই ব্যবস্থা আছে তিনজন জল্লাদের, প্রত্যেকে দশ ঘা করে মারবে। পরিশ্রান্ত হয়ে যাতে আঘাতের ভীষণতা এতটুকুও না কমে যায়, তাই এই সুষ্ঠু ব্যবস্থা !

প্রথম প্রথম চীৎকার শুনতে পেলাম ভূপেনবাবুর, দেখলাম হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা, দেখলাম সর্ব্বশরীরে প্রবলতম আকুঞ্চন······কিন্তু জমাদারের কণ্ঠে যখন পনেরো ঘোষিত হলো, তখন দেখলাম স্পন্দন থেমে গেছে, মাথা ঝুলে পড়েছে, নিতম্ব বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালো রক্ত···তারপর একসময় স্ট্রেচারে করে আমাদের সম্মুখ দিয়েই নিয়ে গেল ভূপেনবাবুর ক্ষতবিক্ষত দেহ। ঠাওর করতে পারলাম না তাতে প্রাণ আছে কি না।

তেমনি বুঝতেই পারলাম না যে, এই দশ মিনিট আমারাও বেঁচে ছিলাম কি না ! কোনো রাজনৈতিক বন্দীকেই সেদিন সকালে ঘরের বাইরে আসতে দেওয়া হয়নি, এমন কি রাজবন্দীদেরও দরজায় তালা ছিল।

কিন্তু ছুটে পালাইনি এই দৃশ্য দেখে, পলক ফেলিনি। দশটি চক্ষু মেলে এর সবখানি বীভৎসতা অন্তরে টেনে নিলাম। প্রত্যেকটি বেতের আঘাত আমাদেরও

মনে রক্ত ঝরিয়ে দিল। শুধু আমাদের নয়, যেখানে যত বিপ্লবী আছেন, তাঁদের শরীরেও কেটে কেটে বসে গেল বিষাক্ত চুম্বন। ক্ষুদিরাম-কানাইলালের চিতাভস্মেও বুঝি চাঞ্চল্য দেখা দিল!······অত্যাচারকে আবাহন জানাই আমরা, অভ্যর্থনা জানাই জার-কে, লুই-কে, মাইকেল ও'ডায়ার-কে। এদের নৃশংসতার আঘাতেই তো যুগে যুগে আহত সরীসৃপের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছে বিপ্লবের কালফণা! তাই তো জন্মলাভ করেছেন লেলিন, জেগে উঠেছেন রব্‌সপিয়ার, ফাঁসির মঞ্চে জীবন-তীর্থ সৃষ্টি করে গেছেন ভারতের অগণিত বিপ্লবী।

তাঁদের দু'কস্ বেয়ে ঝরে-পড়া রক্তকণিকা দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মূর্ত্তিমান বিপ্লব ভারতের নেতাজী!······

সারাদিনে কিছুই কথা খুঁজে পেলাম না আমরা। কিংবা কথা কওয়ার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিদিন দুপুরের গ্র্যাণ্ড হোটেলীয় খাদ্য নিয়ে বেশ রসালো সমালোচনা চালাতাম কিছুক্ষণ। ডালে নেই নুন, তরকারিতে নেই মসলা। ভাতে আছে কাঁকর, মাছের ঝোলে আছে বালি। এমনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার খানা!

আজ কিন্তু গোগ্রাসে গিলে ফেললাম সব। ভেতরটা কি খালি হয়ে গেছে একেবারে? স্বাদবোধ কি শেষ হয়ে গেছে?······

এর দু'দিন পরই আমাদের ঘরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। রিয়াজউদ্দীন ফরিদপুরের মুসলমান, ডাকাতি মামলায় পাঁচ বৎসর সাজা হয়েছে। বেঁটে, কম কথা কয়। মনে হয় নিরীহ, গোবেচারা। কিন্তু তার পেটে পেটে এত কে জানতো!

একদিন সন্ধ্যেবেলা শান্তি মুখাজ্জা গোপনে আমায় জানালেন যে, তার কম্বলের ভাঁজে একখানা তীক্ষ্ণধার লোহার পাত পেয়েছেন তিনি। কোনো কথা প্রকাশ না করে গোপনে তদন্ত করা হলো এবং অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের জবানবন্দীতে জানা গেল যে, এই অপকর্ম্ম রিয়াজই করেছে। পঞ্চম বাহিনীর লোকের মতো ধরিয়ে দিয়ে কিছু সুবিধে আদায় করাই শালার মতলব! সুতরাং—

পরদিনই রাত্রে ঘর বন্ধ হয়ে যাবার পর সবার সম্মুখেই শান্তি তাকে ডেকে

জিজ্ঞেস করলেন ক্ষুরের কথা। প্রথমটা বেমালুম অস্বীকার করে বসলো সে। তারপর জেরায় খানিকটে কাবু হয়ে পড়লো, অবশেষে হুমকিতে স্বীকার করলো অপরাধ, বললো সে কোন্ মেটের পরামর্শে এই কাজ করেছে। আর যায় কোথা, শান্তি প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে বসলেন তার থুঁতনিতে। ব্যাটা কোনো রকমে টাল সামলে নিতেই শান্তি আরও কয়েকটি ছেড়ে দিলেন পর পর। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রিয়াজউদ্দীন। হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। আমিও তার অভ্যর্থনা জানালাম প্রচণ্ড এক লাথি মেরে তার মুখে। তারপর শুরু হলো মার। সাধারণ কয়েদীরা দু'চার ঘা মেরে আমাদের দু'জনের মারের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো নিশ্চেষ্ট দর্শক হয়ে। চড়, কিল, ঘুষি ও লাথির চোটে এক সময় রিয়াজ সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো। আমাদের মাথায় তখন খুন চেপে গেলেও একেবারে খুনী হয়ে উঠিনি আমরা! তাই শান্তি ও আমি দু'জনে শালাকে শূন্যে তুলে নিয়ে জলের ট্যাঙ্কটার মধ্যে তার মাথাটা ডুবিয়ে ধরলাম। ওর সংজ্ঞা ফিরে এল। তারপর শুরু হলো আবার।

কিন্তু আশ্চর্য্য যে, লোকটা একটুও চীৎকার করলো না এবং যখন আধমরা করে তাকে ফেলে দিলাম, শান্তি তখন শেষ লাথিটা মেরে বলে উঠলেন: নে শালা, বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ কর্। অন্ততঃ ছ'মাস এবার থাকতে হবে হাসপাতালে।

অপরাধী রিয়াজউদ্দীন কোনো নালিশ জানালো না কারুর কাছে! পরদিন সকালেই ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল থালা বাটি ও কম্বল নিয়ে সিপাইয়ের পেছনে পেছনে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই গেল হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে। কিন্তু সেদিনই বিকেলে সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদেরই ইয়ার্ডের সম্মুখের প্রাঙ্গণে একদল কয়েদীর দ্বিতীয় সারির শেষে দাঁড়িয়ে আছে সেই বেঁটে ফরিদপুরের মুসলমান রিয়াজউদ্দীন।

শুধু রিয়াজউদ্দীনই যে চলে গেল তা নয়, আমাকেও বদলী করা হলো ছ' নম্বরে। ভাবলাম, সুবিধেই হলো, এবার রবির কাছে লেবং-এর ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যাবে। কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্য মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু স্থায়ী হলো না তা বেশীক্ষণ। একটু পরই আবার এল সিপাইরা। রবিকে যেতে হবে চল্লিশ ডিগ্রিতে। লেবং ঘটনায় রবি যে স্বীকারোক্তি করেছিল, সবাই জানে তা। তাই আই বি-র পরামর্শমতো রবিকে অন্যান্য সবার কাছ থেকে যতখানি সম্ভব

পৃথক করে রাখা হতো। আজ এই প্রথম সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে রবিকে নিয়ে যাওয়া হলো একেবারে চল্লিশ ডিগ্রির রাজনৈতিক বন্দীদের কলোনীতে। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে ওকে মিশতে দেওয়াকে আরও বেশী বিপজ্জনক মনে করা হয়েছে!

ছ' নম্বর ডিগ্রি মানে পাশাপাশি ছয়টি সেল। সেল মানে দশ ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া একটি খোপ, সম্মুখে লোহার শিক-আঁটা দরজা আর পশ্চাতে অনেক উঁচুতে লোহার শিক-আঁটা একটি ভেন্টিলেটার। খোপগুলির সামনে সাত ফুট চওড়া দেয়াল-ঘেরা রাস্তা বা প্রাঙ্গণ।

বৃটিশ কূটনীতির divide and rule policy সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তাই ছয়টি সেলের তিনটিতে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক বন্দী আর বাকি তিনটিতে তিনজন অ-রাজনৈতিক শুধু নয়, একেবারে 'বি' শ্রেণীর কয়েদীকে স্থান দেয়া হয়েছে। কি জানি, ছয় জন রাজনৈতিক বন্দী যদি কখনো একমত হয়ে একযোগে সিপাইকে আক্রমণ করে বসে, চাবি কেড়ে নেয়, ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পড়ে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড সৃষ্টি করে বসে, তাই ঐ 'বি' ক্লাসদের রাখা হয়েছে সিপাইয়ের দেহরক্ষীর কাজ করবার জন্য। শুধু তাই নয়, এরা জেলার সুধীন মুখার্জ্জীর স্পাইয়েরও কাজ করে থাকে। এখানকার সলা-পরামর্শ, আলাপ-আলোচনা, এমন কি, একটি সূঁচ পতনের হুবহু সংবাদটিও ঠিক পৌঁছে যায় জেলারের কানে। বিনিময়ে এরা পায় মহাপরাক্রম জেলার সাহেবের অনুগ্রহ, অবশ্য সরাসরি নয়, পরোক্ষভাবে। সরাসরি কাজ শুধু দৃষ্টিকটু হবে না, তাতে নানারকম কথা উঠতে পারে। তাই সুধীন মুখার্জ্জীর ইশারায় হয়তো ডাক্তার প্রায়ই এদের জন্য স্পেশ্যাল ডায়েট-এর ব্যবস্থা করে থাকেন। কখনো মাছ, কখনো মাংস, কখনো দুধ, কখনো দই, কখনো-বা মাখন-রুটি-ডিম! হিস্টি্র টিকিটে দেখা যায় এদের ওজন চিরকালই লুজিং অর্থাৎ স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। শুধু স্পেশ্যাল ডায়েটই নয়, জেলার সাহেবের করুণা কখনো বিড়িরূপে আসে, কখনো আসে তামাকপাতা হয়ে। মাঝে মাঝে গঞ্জিকারূপেও আসতো বলে মনে হতো, কারণ রাত্রে কোনো কোনোদিন গাঁজার গন্ধও নাকে আসতো।

সুধীন মুখার্জ্জীর এই সব শাগরেদদের আমরা অবশ্য এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু ছ' নম্বরের ঐ অপ্রশস্ত স্থানে তা কতোখানি সম্ভব হবে? তাই ব্যক্তিগত নিষ্পাপ কথা ছাড়া আমরা সর্ব্বপ্রকার আলোচনা থেকে বিরত থাকতাম।

যতদূর মনে পড়ে, আমি যেন সবার চাইতে বেশী গম্ভীর হয়ে পড়েছিলাম। দেড় বৎসর পূর্ব্বেকার একটি ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে চুকিয়ে-দেওয়া ডাকাতিকে কেন্দ্র করে নানারূপ মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে পুলিশ যে মামলা দায়ের করলো, অবশেষে তার আঘাতেই ধরাশায়ী হতে হলো? বড় গলায় পুলিশকে বলে বেড়াতাম যে, রাজবন্দী করে রাখার সহজ পন্থা গ্রহণ করতে পারে তারা, কিন্তু রাজনৈতিক কয়েদী করে জেল খাটানোর ক্ষমতা তাদের নেই। আজ থেকে আমার সেই বড় গলা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এক-আধ বছর নয়, দীর্ঘ সাতটি বৎসর পর পরাভূত মন নিয়ে যখন বেরিয়ে যাবো, পুলিশের সমক্ষে কি তখন আর পারবো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে?······

মেজদা' অবশ্য লিখেছেন যে, সবার পক্ষ থেকেই হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়েছে। অবশ্য অনেক কষ্টে। কারণ, আপীল দায়েরের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল অথচ বার বার তাগাদাসত্ত্বেও ভবেশ রায়ের রায়ের নকল পাওয়া যাচ্ছিল না। ত্রাণকর্ত্তারূপে এগিয়ে এলেন অ্যাডভোকেট সুরেশচন্দ্র তালুকদার সঙ্গে নিয়ে সুধাংশুভূষণ সেনকে। স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার যে ধারাবাহিক বিবরণ ও স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের সংবাদ বেরিয়েছিল, সুরেশ তালুকদার তার ওপর নির্ভর করেই এমনি জোরালো যুক্তিপূর্ণ আবেদন জানালেন যে, আমাদের আপীল হাইকোর্ট গ্রহণ না করে পারলেন না।

মেজদা' আরও লিখেছেন যে, অনাথ, খগেন ও বিপদভঞ্জনের পক্ষে দাঁড়াবেন সন্তোষকুমার বসু আর রঙ্গলাল ও আমার পক্ষে তালুকদার সময় না পেলে সুধাংশু-ভূষণ সেন। কানলিফ এ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের আদালতে আমাদের আপীলের শুনানি হবে।

এ সবই সংবাদ মাত্র, আশার কোনো বাণী নয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের রায় কখখনো বাতিল হয়ে যাবে না। বড় জোর সাত বছর কমে বছর পাঁচেক হতে পারে, অত্যন্ত আশাবাদী বন্ধুরাও এই ভরসাই উচ্চারণ করেছিলেন। ওদিকে কর্তৃপক্ষেরও উদ্যোগ-আয়োজনের কমতি ছিল না। সে সময় পাঁচ বৎসর বা তার অধিককাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে পাঠানোই ছিল রীতি। সবাইকে না হলেও অনেককেই পাঠানো হয়েছিল। সংবাদ পাওয়া গেল, আমাকেও পাঠানো হবে এবং সেইজন্যই সত্বরই আমায় আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হবে। আন্দামানগামীদের ওখানেই জড়ো করা হয়।

কাজেকাজেই, বাংলার বা ভারতের মাটির সঙ্গে দীর্ঘকালের জন্য সংযোগ ছিন্ন হতে চলেছে। বাড়ীর কারুর সঙ্গে আর দেখা হবার উপায় থাকবে না। মা নয়, দাদারা নয়, বৌদিরা নয়, পাড়াপড়শী গ্রামবাসী কেউ নয়। আকাশচুম্বী সাগরের মাঝে ক্ষুদ্র এক দ্বীপের ক্ষুদ্রতর এক প্রকোষ্ঠে বসে মুক্তির আশায় দিন গুনতে থাকবো! ঢাকা জেল থেকে সে সময় সোনাবৌদিকে যে চিঠি লিখেছিলাম, আজও তা একেবারে ভুলে যাইনি। লিখেছিলাম :

সোনাবৌদি,

সরকারী নিয়ম অনুসারে আমায় বোধহয় শীগগিরই আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হবে, তারপর সেখান থেকে আন্দামান। সাত বৎসর পর আন্দামান থেকে ফিরে আসবো কি? আসতে পারবো কি?

তাই তোমাদের অনুরোধ, পরিবারের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দিতে পার। ছয়-ছয়টি ঠাকুরপো তোমার, একটি না-হয় নাই-বা রইলো। কি এমন ক্ষতি হবে তাতে? মনে করো, আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি, আর ফিরে পাবে না আমায়!......

কিন্তু অঘটন ঘটে গেল। সপ্তডিঙ্গা মধুকর আবার জলের ওপর ভেসে উঠলো, মাঝিরা সমবেত কণ্ঠে হাঁক দিতে লাগলো, বদর! বদর!

মাস তিনেক পর একদিন সকালবেলায় অকস্মাৎ সহ-বন্দী বিভূতিবাবু দৌড়ে আমার কক্ষে এসে বলে গেলেন চীৎকার করে: উঠুন, উঠুন দ্বিজেনবাবু, শীগগির উঠুন, আপনি খালাস। হাইকোর্ট আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি মুক্তি? হাইকোর্ট কি সত্যিই আমায় ছেড়ে দিয়েছেন? একা আমায়? আমার অনুগামীরা? ওরাও কি ছাড়া পায়নি? এমনি নানা প্রশ্ন জাগতে লাগলো মনে।

আমার শরীর তখন ভালো নয়, হাসপাতালের অধীন আছি। অর্থাৎ সরু লাল স্ট্রাইপওয়ালা পায়জামা পরেছি, যার ঝুল নেমেছে ঠিক হাঁটুর নীচে অবধি। আমার খাদ্য আসে হাসপাতাল থেকে, ওষুধও।

আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলাম: কী করে জানলেন?

সোৎসাহে জবাব দিলেন তিনি: বাঃ, খালাসী মেট যে বলে গেল আপনাকে থালা কম্বল নিয়ে রেডি থাকতে। সে ঘুরে আসছে।

রেডি আর কী থাকবো ? খান চারেক কম্বল আর থালা ও বাটি, এই তো আমার সংসার। বগলদাবা করেই এই সংসার নিয়ে চলাফেরা করা যায় গন্ধমাদনের মতো !

একটু পরই মেট ফিরে এসে হাঁক দিল : কোথায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলী কোথায় ? আসেন, আসেন, শীগ্‌গির কইরা আসেন !

বিভূতি ছোঁ মেরে তার হাতের স্লিপখানা কেড়ে নিলেন, বলে উঠলেন : এই দেখুন, লেখা আছে For release ! দেখলাম আমার নীচে লেখা খগেন চাটার্জ্জী আর বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জীর নাম।

অসুস্থ শরীরে বেরিয়ে এলাম। চল্লিশ ডিগ্রির সম্মুখ দিয়ে আসবার সময় বন্দীরা একেবারে ঘিরে ধরলেন। অসংখ্য প্রশ্ন, জবাব দেবার সময় পেলাম না। শেষ পর্য্যন্ত সবাই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলীপুর সেনট্রাল জেলে, সেখান থেকে সোজা আন্দামান। ক'জন এগিয়ে এসে সহাস্যে করমর্দ্দন করে বলে দিলেন : যান্, আমরাও পরে আসছি।

ইয়ার্ডের বাইরে এসে মেট আমায় নিয়ে চললো গুদামের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম : সত্যিই খালাস, না কলকাতা চালান ?

মেট জবাব দিল : তা কইতে পারি না। তবে অফিস যাইতে অবে।

গুদামের দিকে যাচ্ছি কেন ?

আপনার নিজের জামাজুতা পরতে অবে যে !

গুদামে এসে পৌছোতেই বিপদ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আমায় : দ্বিজেনদা, সত্যিই আমরা খালাস পেয়েছি। খগেন, আপনি আর আমি। হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে, জানেন না ? অনাথ আর রণুদাকে ছাড়েনি।

পোশাক পরিবর্ত্তন করে পরলাম নিজেদের ধুতি ও জামা। তিনজন এসে হাজির হলাম অফিসে। দেখি, সেখানে কাগজপত্র নিয়ে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন স্বয়ং বিভূতি সাহা। আমাদের দেখেই নিঃশব্দে হাসলেন একেবারে বত্রিশটি সাদা ধবধবে দন্ত বিকশিত করে। ঠিক তেমনি চোখ দুটি ছোট হয়ে এল। বললেন : Congratulations ! দ্বিজেনবাবু, Congratulations ! সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত আপনিই জয়লাভ করলেন। আমাদের সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম : মানে ?

মহাবিস্ময়ে বললেন তিনি : সে কি, কিছুই জানেন না আপনি ? আজ যে সাত দিন হয়ে গেল হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে। কেন, স্টেটসম্যান-এ বেরিয়েছে তো বেশ বড় বড় হরফে, দেখেননি ?

বললাম : স্টেটসম্যান তো দেওয়া হয় না আমাদের ।

আমাদের দেখে ও কথোপকথন শুনে টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এলেন রেজাক সাহেব । জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার দ্বিজেনবাবু ?

এইবার মওকা পেলাম বলবার : বুঝলেন না রেজাক সাহেব, বিভূতিবাবু মনে করেছিলেন মুন্সীগঞ্জের ভবেশ রায়ই হচ্ছেন আমাদের জেলে আটকে রাখবার একমাত্র মালিক। কিন্তু বাবারও তো বাবা আছে, সে কথা ওঁদের মনে ছিল না। বলেছিলেন নাগপাশ আর পাশুপাত একেবারে রেডি, ছাড়লেই হয়। আমিও বলেছিলাম, আমার বর্ম্মও খাঁটি ইস্পাতে তৈরী। কুস্তির প্রথম রাউণ্ডে অবশ্য আমায় প্রায় কাবু করে ফেলেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ও শেষ রাউণ্ডে একেবারে চিৎ হয়ে পড়েছে আই বি-র দল। তাই না বিভূতিবাবু ?

সেই চোখ-ঢাকা হাসি ! বললেন : তবে শুধু খোলস বদলানো হবে ।

অর্থাৎ আবার রাজবন্দী, এই ত ? তা হোক্।—বলে একটু গম্ভীর হয়ে বললাম : কিন্তু পরাজিত হলেন তো। পূর্ব্বেই বলেছিলাম, দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে রাজবন্দী করে রাখতে পারেন সারাজীবন ; কিন্তু, নির্দ্দিষ্ট কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে আটকে রাখতে পারবেন না। আমায় ধরবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। এবার স্বীকার করেন তো ?

আবার সেই নিরুত্তর, নিঃশব্দ হাসি !······

বিপদভঞ্জনকে মুক্তি দেওয়া হলো সর্ত্তাধীনে আর খগেন ও আমায় রাজবন্দীর তকমা এঁটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো রাজবন্দীদের ইয়ার্ডে। পূর্ব্বে এটা ছিল জেনানা ফাটক, এখন জেনানাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে একে রূপান্তরিত করা হয়েছে রাজবন্দী ইয়ার্ডে। সংখ্যায় খুব বেশী নয়, জন ত্রিশেক। দুটি লম্বা হল-এর মতো ঘর, তার মধ্যেই সারি সারি শয্যা। একসঙ্গে এতগুলো লোক থাকায় সুবিধে ছিল, রাত্রে ঘরে তালাবন্ধ হয়ে যাবার পরও আমাদের নানা রকম আলোচনা, পড়া, ক্লাস ও খেলা চলতো ।

এসেই আমি সিপাই মারফত একখানি পত্র পাঠালাম রঙ্গলালের কাছে। বন্দী হলেও আমি এখন আবার রাজবন্দী, সরকারী অফিসের পিতলের চাকতি

লাগানো পোশাক-পরা পিওনের মতো। পিওনের মধ্যে এরা কুলীন, হাঁকডাক বেশী। তেমনি বন্দীদের মধ্যে রাজবন্দী। রঙ্গলালকে লিখে পাঠালাম: "আইনের মারপ্যাচে আমি মুক্তি পেলাম সত্য, কিন্তু নিজের ভ্রম সংশোধনের জন্য স্বেচ্ছায় দীর্ঘ কারাবাস বরণ করে নিয়ে তুমি যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। দাদাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলে তুমি, তোমার পণ রক্ষা হলো। কিন্তু তোমার দীর্ঘ কারাদণ্ডের বিনিময়ে যে মুক্তি ক্রয় করলাম, তাতে পুরো আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না।"

চিঠির জবাব পেলাম সিপাইয়ের মুখে। হিন্দী ও বাংলা মিশিয়ে সে যা বললো, তার মর্ম্মার্থ এই যে, "আপনার মুক্তিই ছিল তার কাম্য, তাই সে খুব খুশী হয়েছে। নিজের জন্য সে ভাবে না।"

তারপরই একখানা দরখাস্ত করলাম মুন্সীগঞ্জের সেই বিখ্যাত স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপী মহকুমা হাকিম ভবেশ রায়ের কাছে। দরখাস্তখানার প্রতিপাদ্য বিষয় ও কিছু ভাষার প্রাখর্য্য আজও আমার মনে পড়ে:

"সবিনয় নিবেদন,

যথাবিহিত সম্মানের সহিত জানাইতেছি যে, আশা করি মহামান্য হাইকোর্টের রায় আপনার গোচরীভূত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম আপনার দীর্ঘ রায়ে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও আমাদের জবানবন্দী বিবেচনা করিয়া ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং কোর্ট ইনসপেক্টার যে আবেগময় ভাষায় সওয়াল করিয়াছিলেন, সেই জ্বালাময়ী ভাষাতেই আমাকে সাধ্যমতো সর্ব্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বৃটিশ সরকারের প্রতি আপনার দাসসুলভ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন একেবারে বেহায়ার মতো!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনারও বাবা আছেন এবং সকল বাবাই আপনার মতো পুলিশের তাঁবেদার নন। তাই আপনার ন্যায়বিচার সেখানে ফাঁসিয়া গিয়াছে।"

জেলার সুধীন মুখার্জ্জী সেলাম পাঠালেন আমায়। একেবারে কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন: আসুন, আসুন দ্বিজেনবাবু, বসুন। আপনি সিগারেট খান কি? আনিয়ে দোব?

খাইনে জানাতেই হা-হা করে এক গাল হেসে উঠলেন: ঠিক আমারই মতো।—তারপর যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছেন এমনি ভাব দেখিয়ে অতি

মোলায়েম সুরে বলতে লাগলেন : দেখুন, কিছু মনে করবেন না, দ্বিজেনবাবু। অবশ্য আমি নিজেই যেতাম আপনার ওখানে এবং আমারই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু—কি জানেন—মানে, কাজের চাপে এই চেয়ার ছেড়ে একটি মুহূর্ত্তও আর উঠবার ফুরসত পাইনে। মাথা প্রায় খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা! তাই, মানে, সেই জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিতে হলো।

জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

মানে, আপনি মুন্সীগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে দরখাস্তখানা করেছেন, বললেন তিনি: সেটা, মানে, আমি পড়ে দেখলাম—ওটা আবার শেষটায় contempt of Court হয়ে দাঁড়াবে না তো?

তাতে আপনার কোনো অসুবিধা আছে কি?—সোজা প্রশ্ন করলাম।

না, না, আমার কি অসুবিধে?—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: আপনার দরখাস্ত—আপনি যা-ই লিখুন না কেন—পাঠাতে বাধ্য আমি। পাঠাতে মানে, আই বি-র কাছে পাঠাতে। তবে কি জানেন, দরদী বন্ধুর মতো বলতে লাগলেন: ও ব্যাপারটা যখন চুকে-বুকেই গেছে, তখন কেন আর ও নিয়ে লেখালেখি। ভালোই তো আছেন—খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, পড়াশুনা—এখন ওসব কথা তুলে একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়া সৃষ্টির কিছু দরকার আছে কি, সে কথাটাই ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

এখন আমার কদর অত্যন্ত বেশী। যে সুধীন মুখার্জ্জী দু'দিন পুর্ব্বেও কয়েদী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর প্রতি কদাচিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং বহু সাধ্যসাধনার পর নাসিকা উঁচু করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন চরম তাচ্ছিল্যভরে মেরী এ্যান্টিওনেটের মতো, এখন তিনি যেন আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজেন গাঙ্গুলীর পায়ে যাতে কাঁটাটি না বিঁধতে পারে, সেজন্য যেন সর্ব্বদাই বিছিয়ে রেখেছেন নিজের কোমল বুক!······

বললাম হেসে: ডাকাতি মামলায় হয়েছিল সাত বৎসর, আদালত অবমাননার দায়ে না হয় হবে সাত দিন জেল। তিন মাস তো আপনাদের ফার্স্ট ক্লাস গরুর খাদ্য হজম করলাম, না হয় আর সাত দিন গলাধঃকরণ করবো সেই মোগলাই খানা!—পাঠিয়ে দিন।

আবার সেই হা-হা করে এক গাল হাসি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এর জবাবে ভবেশ রায় লক্ষ্মী ছেলেটির মতো পাঠিয়ে দিলেন

তাঁর নিজের দীর্ঘ রায়ের এক খণ্ড ও হাইকোর্টের রায়ের এক খণ্ড অনুলিপি। না চাহিতে দান!…রীতিমতো পয়সা ব্যয় করে যা সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, তাই এসে গেল আপসে। ভালোই হলো।

সবাই মিলে দুটোই মিলিয়ে পড়া গেল।…ময়মনসিংহের নগেন্দ্র চক্রবর্তী (গালপোড়া নামে যিনি খ্যাত) পড়তে লাগলেন আর আমরা তা উপভোগ করতে লাগলাম। দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভবেশ রায়ের রায়। মনে হয় কোর্ট ইনসপেক্টারের দীর্ঘ সওয়াল পুরোটাই ভদ্রলোক শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিয়েছিলেন। আর হাইকোর্টের বিচারপতি কানলিফ ও হেণ্ডারসনের রায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র ফুলসক্যাপের এক-চতুর্থাংশ। অন্যান্য কথার পর লিখেছেন:

The learned Magistrate could not even frame the charges. The Approver's statement is misleading. Hence, the principal accused Dwijen Ganguly should be set at liberty at once along with…ইত্যাদি ইত্যাদি।

পান্নালাল মিত্র বলে উঠলেন: ভবেশ রায় একেবারে His Master's Voice ছেড়েছেন!

ময়মনসিংহের কমিউনিষ্ট মণি সিং বললেন: আসুন, ওঁকে একখানা অভিনন্দন-পত্র পাঠাই আমরা। এমনি সারগর্ভ রায়…

সবাই হেসে উঠলো।

হাইকোর্টে আমাদের আপীলের শুনানির ইতিবৃত্ত পরে শুনেছিলাম।

আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার সওয়াল শেষ হয়নি বলে তালুকদার তখনো এসে পৌছুতে পারেননি। সুধাংশু সেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন আর সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে জজের আগমন প্রতীক্ষা করছেন সন্তোষকুমার বসু।

কানলিফ ও হেণ্ডারসন এলেন এবং প্রথমেই নিলেন আমাদের আপীলের ফাইল। তালুকদারকে দেখতে না পেয়ে বোসের পানে চাইলেন। বোস উঠে দাঁড়ালেন।

বোস দাঁড়িয়েছেন খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জনের পক্ষ থেকে। সুতরাং প্রথমেই সে কথা জানিয়ে তিনি সওয়াল শুরু করলেন। খানিকপরেই বাধা দিয়ে কানলিফ জিজ্ঞেস করলেন: But what do you know of the principal accused Dwijen Ganguly?

বোস জানালেন যে, তিনি আমার জন্য দাঁড়াননি। রঙ্গলাল ও আমার জন্য মিঃ তালুকদার—

কিন্তু তালুকদার আসেননি। সুতরাং হেণ্ডারসন বললেন: But certainly you have gone through the entire case, certainly you know everything of the principal accused as you know of your clients—

সুতরাং বোসকেই আদালতের অনুরোধে রঙ্গলাল ও আমার সপক্ষেও বলতে হলো কিছু। যুক্তিগুলো শ্রবণ করে বিচারকদ্বয়ের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো।

ঘন্টাখানেক পর বোস আসন গ্রহণ করতেই উঠে দাঁড়ালেন সুধাংশু সেন। প্রথমেই নিবেদন করলেন যে, তালুকদার এসে না পৌঁছোনোতে তাঁকেই বলতে হচ্ছে। দু'চার কথা বলবার পরই বাধা দিলেন কানলিফ: We have heard this from Mr. Bose. Any new point ?

সেন আবার কোনো নতুন পয়েণ্ট বলবার চেষ্টা করতেই হেণ্ডারসন বললেন: We have heard this.

অবশেষে সেন বললেন যে, তাঁর দু'জন মক্কেল সম্বন্ধে মিঃ বোস প্রায় সব কথাই বলেছেন। যা দু'-একটা পয়েন্ট আরো elaborate করা দরকার, মিঃ তালুকদার এলে—

বাধা দিলেন কানলিফ: We write down judgement. বলেই ডিকটেশন দিতে লাগলেন আর স্টেনোগ্রাফার তা টুকে নিতে লাগলো।

দীর্ঘ বাইশ দিনের যুগান্তকারী বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার আপীলের শুনানি দু'ঘন্টাতেই শেষ হয়ে গেল।

এর অনেক দিন পর মুক্তি পেয়ে সুধাংশুভূষণ সেনের কাছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একখানা চেক পাঠিয়ে দেওয়াতে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন যে, সন্তোষ বোসকেই প্রকৃত পক্ষে আমার পক্ষে সওয়াল করতে হয় জজদের 'নির্দেশে, তাঁকে বিশেষ' কিছু বলতে হয়নি।...

১৯৩৬ সালের জুন মাস। বেশ গরম পড়লেও আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে হলো না। রাত্রে বিরাট বিরাট পাটবিহীন জানালাপথে বেশ হাওয়া খেলতো, আর আমরা খেলতাম তাস, পাশা, ক্যারম, মাজাং প্রভৃতি।

হঠাৎ একদিন দেয়ালের বাইরে শহরের রাস্তায় প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল, ঠিক দুপুরবেলায়। মাঝে মাঝে পট্‌কার শব্দ। আশঙ্কা হলো ঢাকা শহরে আবার হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা লেগে গেল বুঝি! সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম, সিপাইদের মধ্যেও বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে, দু'একজন ছুটোছুটিও শুরু করে দিয়েছে।

একটু পরই একজন সিপাই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সংবাদ দিয়ে গেল: রাজ মিল গিয়া!—বলেই আবার হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরেই জানতে পারলাম, ভাওয়াল মামলার রায় বেরিয়েছে। বিচারপতি পান্নালাল বসু বাদীকেই ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলে ঘোষণা করেছেন। তাই এই শোভাযাত্রা, বাজী পোড়ানো, হল্লা ও সিপাইদের মধ্যে অফুরন্ত উল্লাস ও উচ্ছ্বাস!……

পান্নালাল বললেন: আপনার কানলিফ-হেণ্ডারসনের মতোই পান্নালালের যুগান্তকারী রায়। হবে না কেন, ও যে পান্নালাল! শুধ্ মিত্র নয়, বসু।

সবাই হেসে উঠলাম।

এই জুন মাসেরই মাঝামাঝি একদিন একখানা দরখাস্ত পাঠালাম আমার চিরদিনের শত্রু ঢাকা আই বি-র কর্তা গ্র্যাসবি সাহেবের কাছে। লিখলাম: দয়া করে অবিনাশ দারোগাকে পাঠিয়ে দেবেন। গোপনে কিছু কথা আছে আমার। সত্বর।

গোপনতা নিয়ে যাদের কারবার, গোপন কথার সংবাদ পেলেই স্বভাবতঃই তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রেঙ্গার্স-এ বিজয়ী 'লাকি ডগ্-এর' মতো। কী কোহিনূর যেন কুড়িয়ে পেল এরা! কোন্ আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে!···

সাত দিনের মধ্যেই এসে হাজির অবিনাশ দারোগা।

নমস্কার, নমস্কার দ্বিজেনবাবু! আরে মশাই, ও আমি আগেই জানতাম। সাত বৎসর যে আমরাই কল্পনা করিনি। ভবেশ রায়ের কাণ্ড!

বললাম: There are many things Horatio···

বললেন: বিলক্ষণ! ও আমি আগেই জানতাম।—আসুন সুপারের ঘরেই বসি আমরা। অফিসে লোকজন গিজগিজ করছে। ওখানে কাজের কথা হয় কখনো?

সুপারের ঘরে এলাম। দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হলো! অবিনাশ বলতে

লাগলেন : ও আমি আগেই জানতাম। আপনার মতো জুয়েল কেন শুধোশুধি জেলে পচবেন বলুন তো? দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে সামনে। ছিলাম মশাই ছুটিতে, প্রিভিলেজ লিভ, পাওনা ছুটি। অকস্মাৎ সাহেবের টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, চলে এসো। চলে এলাম। সাহেব বললেন, যাও, দ্বিজেনবাবু তোমায় ডেকেছেন। কী গোপন কথা আছে তোমার সঙ্গে। কী কথা, তা আমিও জানি। বিশ্বাস করুন দ্বিজেনবাবু, I feel for you—

বললাম : আমিও আপনার জন্য ফিল্ করছি অবিনাশবাবু!—

ও আমি আগেই জানতাম।—বলে খুক খুক করে হাসতে লাগলেন অবিনাশ। বললাম : সবই দেখছি আপনি জানতেন সাজাহান নাটকের জয়সিংহের মতো।

অবিনাশের হাসির শব্দ উচ্চগ্রামে উঠলো : হা হা হা, শিক্ষিত ব্যক্তি আপনি, সব কথাতেই বেশ উপমা দিতে পারেন! সাজাহান নাটকের জয়সিংহ—বলে আবার সেই গর্দ্দভের হাসি। হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন : কী হবে মশাই, দুটো ভাঙ্গা রিভলভার নাড়াচাড়া করে? ওর দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল না। যেন ছেলের হাতের মোয়া আর কি!

আবার সেই উল্লুকের হাসি : এই পাগলামো যে একেবারে নিরর্থক, স্রেফ ইয়ারকি, যাক্, অবশেষে আপনিও তা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে যে একদিন পারবেন, ও আমি আগেই জানতাম—

গম্ভীর হয়ে এবার বললাম : জয়সিংহের মতো সবই জানতেন বটে, কিন্তু জুলিয়াস সীজারের মতো একটা কথা জানেন না। জানেন না যে, বিপ্লবীদের যে একখানা ব্ল্যাক বুক আছে, আপনার নাম উঠে গেছে তাতে—

অকস্মাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিল! হাসি উবে গেল অবিনাশের, হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে বলির পাঁঠার মতো! বলতে লাগলাম : অবশ্য আই বি-দের কাউকেই বিপ্লবীরা দোস্ত মনে করেন না কখনো। তবে তাই বলে সবারই নাম ব্ল্যাক বুকে তোলা হয় না। নিশ্চিত কোনো চার্জ্জ কারুর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে তবে লাল কালি দিয়ে তার নাম চিহ্নিত হয়ে যায়। আপনার বিচার হয়েছে, আর সে বিচারে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অপরাধী! কেন আমি কী করেছি?—অবিনাশের হাঁ আরও একটু বড় হয়ে উঠলো, দৃষ্টি ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে নিষ্পলক। তৎক্ষণাৎ বললাম : আপনি অনিল দাসকে টরচার করে মার্ডার করেছেন! আপনি মার্ডারার!

বলেন কি, আমি !—তারপর তোতলার মতো ঠেকে ঠেকে একই কথা বার বার উচ্চারণ করে, অজস্র অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ ও শৃগালের যুক্তির অবতারণা করে, একেবারে কিছুই জানিনে বলে অবশেষে অবিনাশ যখন তাঁর দীর্ঘ সওয়াল শেষ করে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন স্পষ্ট দেখলাম তাঁর কপালে অজস্র স্বেদবিন্দু চক্চক্ করছে।

মৃদু হেসে বললাম : এই মাত্র বলেছিলেন না যে, সবই জানেন আপনি এবং আগেই জানতে পারেন। আর এই দুঃসংবাদটি রাখেন না যে, এবার আপনিই হচ্ছেন বিপ্লবীদের টারগেট ? অনিল দাসকে আপনি হত্যা করেছেন নৃশংসের মতো, তাই ব্ল্যাক বুকে আপনার নাম এবার সবার ওপরে উঠেছে by order of merit—এই দুটি সংবাদ প্রত্যেক বন্দিশিবিরে ও জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জেলের বাইরেও যে তা যথাস্থানে যেতে পারেনি, তা মনেও স্থান দেবেন না। সুতরাং—কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অনাবশ্যক খাটো করে বললাম : একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন অবিনাশবাবু! ঢাকা শহরের গলিগুলো বড্ড অপরিসর ও নোঙরা, ধারেই বয়ে চলেছে বুড়ীগঙ্গা নদী। একখানা আঠার ইঞ্চি ছোরা নিঃশব্দে আপনার পেটের মধ্যে চালিয়ে দিলেই গল গল করে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। তারপর একখানা ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে এনে লাসটা নদীতে ছেড়ে দিলেই—ব্যস, কাজ সাফা ! মাছগুলোর বেশ কিছুদিনের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারবেন—

অবিনাশ দারোগা বেঁচে আছেন কি না, বোঝা গেল না। পাথরের মতো চেয়ে রয়েছেন তিনি। সে দৃষ্টি শূন্য। মনে হলো সত্যই তার পেটে আঠারো ইঞ্চি একখানা ছোরা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে !······

মনে মনে হেসে সবিনয়ে নিবেদন করলাম : এই সংবাদটুকু দেবার জন্যই আপনাকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার প্রিভিলেজ লীভটা মাঠে মারা গেল। আহা ! সত্যিই আপনাকে আমার বন্ধু মনে করি অবিনাশ-বাবু, তাই শুভানুধ্যায়ীর মতো সময় থাকতে সাবধান করে দিলাম। আচ্ছা, এবার চলি ?

কিন্তু আই বি পুঙ্গব অবিনাশ তখন মৃত। বোধহয় পচনও শুরু হয়ে গেছে সেই বাসি মড়ায়।······

গট্ গট্ করে বেরিয়ে এলাম নন্দের রাজসভা থেকে চাণক্যের মতো।

উনিশ

রাজবন্দী ইয়ার্ডের ম্যানেজার তখন আমি। ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে কিচেন ম্যানেজ করা। আমাদের বরাদ্দ টাকার মধ্যে যা যা আমরা চাই, একখানা বিশেষ খাতায় তা লিখে জেলারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হয় রোজ। জিনিসগুলো পাওয়া যায় তার পরদিন। সকালবেলা রোজই অফিসে গিয়ে সরবরাহকারীর কাছ থেকে সেগুলো মিলিয়ে ও ওজন করিয়ে নিয়ে আসতে হয়। তার পরের কাজ হচ্ছে বাবুর্চির।

জেল গেট-এ সরবরাহকারীর কাছ থেকে তরি-তরকারি, মাছ-মাংস প্রভৃতি বুঝে নেবার সময় শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও জেলার সুধীন মুখার্জ্জী একবার এসে ঢুঁ মারবেনই। না, শুধু ঢুঁ মারা নয়, বেশ কয়েক মিনিট ধরে জিনিসপত্র পরীক্ষা, সমালোচনা এবং ভালো জিনিস না দিলে রিস্‌ক্‌ পারচেজের হুমকি দেওয়া। সরবরাহকারী যতোই ভালো জিনিস আনুক না কেন, তবুও আরো ভালো চাই, নইলে রিস্‌ক্‌ পারচেজ, মানে, সোজা নগদ দামে বাজার থেকে কিনে নোব, বাড়তি যা ব্যয় হবে, কেটে নোব তোমার বিল থেকে। নেকড়ে বাঘের যুক্তি আর কি! জল নীচের দিকে গেলে কি হবে, নীচে থেকেই তুমি তা ঘুলিয়ে দিচ্ছো, তাই ওপরের জল এত ময়লা! সরবরাহকারী মেষশাবকের মতোই ভয়ে কাঁপতে থাকে!······

এসেই হয়তো বলে উঠলেন: এ কি মশাই, এ কি রকম রুই মাছের পেটি দিয়েছেন? অন্ততঃ সের চারেক ওজনের মাছ না হলে তার আবার পেটি হয় নাকি? সে যাই হোক, কিন্তু এ কি করেছেন? পেটি মানে কি? ঘাড়ের কাঁটা থেকে অন্ততঃ দু' ইঞ্চি বাদ দিয়ে পেট যেখানে শেষ হয়েছে, সেটুকুকে বলে পেটি। আর এ কি এনেছেন? কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু কাগজের মতো পাতলা, তার সঙ্গে আবার ঘাড়ের হাড়টা আটকে রয়েছে। ওদিকে আবার টেনে নিয়ে গেছেন প্রায় লেজপর্য্যন্ত।—এমনি ফাঁকি দিয়ে ডেটিনিউবাবুদের বুঝিয়ে দিতে গেলে আমি কিন্তু রিস্‌ক্‌ পারচেজ করে বসবো, বুঝলেন?

তারপরই হয়তো মাংসের পাত্রটা চোখে পড়লো: এ কি! এ কি খাসীর মাংস? কিছুতেই হতে পারে না। নিশ্চয়ই পাঁঠার মাংস। খাসী বলে পাঁঠা

চালাচ্ছেন ? ওঁরা কি শুকতো খাবেন যে, পাঁঠা দিয়েছেন ? আর এই হাঁটুগুলো কেন দিয়েছেন ? আর এই ব্যাকবোনের হাড়গুলো ? আশ্চর্য্য, কোথাকার মাংস যে বেস্ট, তাও জানেন না, অথচ কনট্রাক্ট নিয়েছেন ! কাল থেকে এমনি এলে রিজেক্ট করে দোব, রিস্ক্ পারচেজ করবো, বুঝলেন ?

সরবরাহকারী কি মাথামুণ্ডু বুঝতেন জানি না, আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, সুধীন মুখার্জ্জী রাজবন্দীদের মাসীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এমনি দরদ !······

একদিন সকালবেলা অফিসে গিয়ে কাজ শেষ করে চলে আসবো, এমন সময় অকস্মাৎ যতীন দারোগার সঙ্গে দেখা। তিনি একেবারে কলরব করে উঠলেন।

কুশলাদি প্রশ্নের পর নিজের কথাও বললেন যে, শ্রীনগর থেকে তিনি লালবাগ থানায় বদলি হয়ে এসেছেন। সাধারণ ডাকাতি মামলায় চারজনের সাজা হয়ে যাওয়ায় এসেছেন জেলে তাদের হাতের ছাপ নিতে। ছাপ নেওয়া চলতে লাগলো প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রত্যেকটি আঙ্গুলের, তারপর একসঙ্গে চারটি আঙ্গুলের। এমনিভাবে দু'হাতের।

বসে বসে খোসগল্প চলছিল, এমন সময় যতীন দারোগা আর-একজন খাঁকি পোশাক-পরা দারোগাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন : ওহো, এঁর সঙ্গে তো আপনার পরিচয়ই করিয়ে দিইনি। ইনি হচ্ছেন মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, লালবাগের তৃতীয় দারোগা, আগে ছিলেন আই বি-তে, আর ইনি হচ্ছেন···ইত্যাদি।

চট্ করে যেন ঘা খেলাম মনে ! ফস্ করে মনে পড়ে গেল, আই বি-তে ছিলেন মনোরঞ্জন······

নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পর প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা, আমাদের মামলার কোনও সংবাদ রাখেন আপনি ?

সস্মিতমুখে জবাব দিলেন : তা একটু রাখি। বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জী আপনার সহ-আসামী ছিলেন তো ? আমাকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হয়। আই বি-তে থাকতে এমনি অনেক অপ্রিয় কাজই করতে হতো দ্বিজেনবাবু। তাইতো ছেড়ে এলাম থানায়। আপনার নামও শুনেছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। ভারী আনন্দ পেলাম আজ পরিচিত হয়ে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম : আমিও ভারী আনন্দ পেলাম আপনার সঙ্গে দেখা

হয়ে। আমিও আপনার নাম শুনেছিলাম, বিশেষ করে বিপদভঞ্জনের কাছেই। কারণ আই বি অফিসে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার আপনিই করেছিলেন তার ওপর।

কই, না!—বলে সমস্ত অতীতের কালি যেন এক পোঁচেই হোয়াইটওয়াশ্ করে ফেললেন মনোরঞ্জন!

কিন্তু আমি তাতে ভুলবো কেন? বলতে লাগলাম: অবশ্য তার সাক্ষী কেউ নেই। বিপদ ও আপনি ছাড়া ঘরে ছিল একটা সিপাই, যে ব্যাটা আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য বিপদের চুলের মুঠি ধরে ওঠ-বোস্ করিয়েছিল আর তাকে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল আপনারই হাণ্টারের সম্মুখে। ভুলে গেছেন সে সব কথা?

বেগতিক দেখে যতীন দারোগা আঙ্গুলেব ছাপ নেবার কাজে একেবারে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দিলেন আর আসামী মনোরঞ্জন ছুরি-হাতে ধরা-পড়ে-যাওয়া অপরাধীর মতো তখনো সাফাই গাইতে লাগলেন অসংলগ্ন ভাষায়।

ও সব প্রলাপে কর্ণপাত না করে আমি বলে গেলাম: গ্রেপ্তার তো আমাকেও করা হলো এই জেল গেটে ঘটা করে। কিন্তু বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীকে অমনি জামাই-আদরে রাখা হলো কেন? নিলেই পারতেন আপনি আমারও ভার। কেরামতি একবার আপনার দেখে নিতাম আমি। —লজ্জা করে না আপনার এই ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে হাত তুলতে? চাকরি করতে হবে বলে কি কুকুরের প্রভুভক্তি দেখাতে হবে?—শুনুন মনোরঞ্জনবাবু, চাকা একদিন ঘুরবে। দেশ স্বাধীন হবে। সেদিন আর এমনি করে আপনাদের হাতের ছাপ দিতে আসবো না আমরা। চৌরাস্তার মোড়ে প্রকাশ্য দিনের আলোয় আপনাদের মতো সমাজের কলঙ্কদের সেদিন গিলোটিন করা হবে, যেমন হয়েছিল ফ্রান্সে। আর আপনার বেলায় পাঠিয়ে দোব ঐ বিপদভঞ্জনকেই। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, বুঝলেন?

মনোরঞ্জন তখনো আবোল-তাবোল বলে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে লাগলেন, আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম: Shut up, রাস্কেলের মতো আর বক্ বক্ করতে হবে না। বিপদভঞ্জন ছাড়া পেয়ে চলে গেছে আর আছে এই ঢাকা শহরেই। বিপদভঞ্জনকে মার দেবার কী প্রতিফল, তা সে শীগগিরই ভালো করেই বুঝিয়ে দেবে আপনাকে।

বেরিয়ে চলে এলাম। এবং ইয়ার্ডে এসে বন্দীদের সঙ্গে বসে প্রাণ ভরে হাসলাম অনেকক্ষণ। সে রাত্রিতে মনোরঞ্জন অন্ততঃ দুঃস্বপ্ন দেখবে নিশ্চয়ই !···

এর কিছুদিন পরেই একদিন দুপুরবেলায় অফিসে ডেকে পাঠালেন রেজাক সাহেব। এসেই পেলাম আবার বদলির হুকুম। কিন্তু একি? ছাপানো ফরমের ফাঁকা অংশে টাইপ করে লেখা, নামতে হবে দিনাজপুর জেলার দারোয়ানী স্টেশনে এবং সেখান থেকে যেতে হবে খানসামা গ্রামে !

দারোয়ানী কখনো কোনো রেলওয়ে স্টেশনের নাম হয় ? খানসামা কখনো গ্রামের নাম হয় ? আই বি সহ-দারোগা বললেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর কিছুই বলবার নেই।

পরিষ্কার বলে দিলাম : কিন্তু মশাই, দারোয়ানী আর খানসামা যদি না হয়, তাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবেন, তা আগেই বলে রাখছি। অপর কোথাও আমি যাবো না কিন্তু। সরকার বাহাদুরের হুকুমমতো কাজ করতে হবে তো। কী বলেন ?

রেজাক সাহেবও হাসলেন, সঙ্গে সহ-দারোগাও। এবং ইয়ার্ডে ফিরে এসে এই আজগুবী সংবাদ পরিবেশনের পরই সবাই একচোট হেসে নিলেন।

দারোয়ানী ! খানসামা !···সে আবার কোন্ দেশ ?···

সত্যিই কোন্ সে দেশ, আদৌ জানা নেই। পূর্ব্ববঙ্গের লোক আমি, সেই দেশের সঙ্গেই নাড়ীর সম্পর্ক। তারপর স্বদেশীর দলে নাম লিখিয়ে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়। রাজবন্দী হয়ে সরকারের স্কন্ধে চেপে দক্ষিণবঙ্গে ঘুরে আসা গেল। এত জেদের মামলা যখন টিকলো না, আশা করছিলাম বোধ হয় আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারবো। সর্ত্তহীন না হলেও সর্ত্তাধীনে মুক্তি পেয়ে যেতে পারবো কেয়টখালীতে, আমার ফেলে-আসা গ্রামে, ফেলে-আসা বাড়ীতে, ফেলে-আসা মায়ের কোলে।

কিন্তু জেদের মামলায় পরাজিত হয়ে আই বি-র জেদ যেন আরও বেড়ে গেল। আমি যেমন জানতাম, তেমনি নিশ্চিতভাবে তারাও বুঝেছিল যে, হাসাড়া, ষোলোঘর প্রভৃতি স্কুলের জাতীয়তামূলক বইগুলি আমিই সরিয়ে ফেলেছি, বুঝেছিল যে, দেলভোগের ডাকাতি আমারই প্ররোচনায়, আমারই সংগঠনে ও আমারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়োজনে তাদের এতটুকুও

ত্রুটি ছিল না কোথাও। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট তাদেরই চাহিদা মতো তোতা পাখীর কাজ করলেন, কিন্তু হাইকোর্টের ঝড়ের ঝাপটায় পাখীর বাসা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ওদিকে আর কিছু করবার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আই বি তাই অন্য পথ বেছে নিয়েছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ হয়ে গেছে, এবার তাই পার করে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গে।

উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই আমার। তাই দারোয়ানী বা খানসামা নামে কোনো গ্রাম থাকতে পারে, তা ভাবতেই পারছিলাম না। যদি সত্যিই সরকারী কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাহলে হয় এখানেই, নয়তো যাবার পথেই সরকারী প্রতিনিধির সঙ্গে যে আর-একটা সংঘর্ষ বেধে যাবে, সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

কিন্তু আমাদের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে এর দু'দিন পর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ১৭ই জুলাই সন্ধ্যার দিকে সত্যিই এসে নামলাম দিনাজপুর জেলার দারোয়ানী স্টেশনে। সেখান থেকে আট মাইল যেতে হবে গরুর গাড়ীতে। মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ী থানায় যাবার সময়ও কাঁথি রোড স্টেশন থেকে আট মাইল যেতে হয়েছিল গরুর গাড়ীতেই। সে রাস্তা তেমন খারাপ মনে হয়নি। এখানে কিন্তু রেলওয়ের সীমানা পার হয়ে মেঠো রাস্তায় পড়তেই প্রবল ঝাঁকুনি খেতে লাগলাম।

সঙ্গী আই বি-র সহ-দারোগা কে ছিলেন, তাঁর নাম মনে নেই। বললেন: বসে থাকতে পারবেন না, দ্বিজেনবাবু, রাস্তা বড্ড খারাপ। কত আর মাথা ঠুকবেন ছইতে? আর বাইরে কিছুই তো আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, সন্ধ্যে হয়ে গেল। শুয়ে পড়ুন।

সত্যিই সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাইরে কিছুই আর দেখা যায় না। ওপরে কালো মেঘে ছাওয়া আকাশ আর নীচে ঝোপঝাপের আড়ালে এখানে ওখানে কাদের সব বাড়ীতে স্তিমিত আলোর আভাস। গ্রামের আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে বিশ্রীভাবে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে আমাদের গো-যানখানি। কেমন করে এগিয়ে চলেছি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ভারী সুন্দর লাগে যদি দেখতে পেতাম—ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়ছে চাষীদের কুটিরগুলি, তাদের ধানের মড়াই, কুমড়ো মাচা আর গরু-বাঁধা গোয়ালঘর। এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ী কোন্

চাঁপাডাঙ্গার মধ্য দিয়ে, কোন্ কঙ্কাবতীর ঘাট পেরিয়ে, কোন্ বৌ-মারী খাল ডাইনে রেখে, কোন্ বাবলা বনের নীচে নীচে। ভারী ভালো লাগে দেখতে—দিনের শেষে ক্ষেত থেকে ফিরে আসছে চাষী ঘর্মাক্ত কলেবরে, কাঁধে লাঙল, হাতে গরুর দড়ি। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে তখনো পাট ধুচ্ছে চাষী-বৌ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব করে ছুটোছুটি করছে, আর আমরা এগিয়ে চলেছি মাইলের পর মাইল। ঘুরছে আমাদের গাড়ীর চাকা, তাই পেছিয়ে পড়ছে ছায়ায় ঢাকা গ্রাম, ধানে ঢাকা মাঠ, দামে ভরা বিল, পেছিয়ে পড়ছে জেলা বোর্ডের মাইল পোস্টগুলি একটির পর একটি।···

কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, অকস্মাৎ বৃষ্টির শব্দে চমকে উঠলাম। হ্যাঁ, সত্যিই বৃষ্টি নেমেছে চড়বড় করে। ছইয়ের ওপর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দু'পাশে দু'টো পরদা এঁটে দিলাম। দিলে কী হবে, ছইয়ের অসংখ্য অদৃশ্য ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগলো। বিছানা গুটিয়ে ফেললাম বটে, কিন্তু গা বাঁচাবার উপাই নেই দেখে ভিজতে লাগলাম চাদর গায়ে জড়িয়ে অনন্যোপায় দাঁড়কাকের মতো। কালি-ধরা লণ্ঠনটা দোল খাচ্ছে, ঝাঁকুনি খাচ্ছি আমরাও, পরদার বাইরে শুনতে পাচ্ছি গাড়োয়ানের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ: আরে হুরুৎ হুরুৎ, ডাইনে কুন্ঠে যাচ্ছিস্? গাড়াৎ পড়বি নাকি রে? হুরুৎ হুরুৎ···

এত দুঃখেও হাসি পেল। জিজ্ঞেস করলাম ভদ্রলোককে: কি বলছে মশাই? এটা কি ভাষা?

সঙ্গীও হেসে জবাব দিলেন: এটা বাহেদের ভাষা। এ দেশের আদি বাসিন্দাদের ভাষা। গরুকে সম্বোধন করছে, বলছে, ডান দিকে কোথায় যাচ্ছিস্? গর্তে পড়বি নাকি?—তবে খানসামাতে, আর শুধু খানসামা কেন, গোটা দিনাজপুর জেলাতেই বহু পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দা এসে বাড়ী করেছেন, জায়গা-জমি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

যাক, তবু ভালো এই বাহেদের হাতে গিয়ে পড়তে হবে না। বললাম: এই অন্ধকারে রাস্তা ঠিক রেখে চলতে পারবে, না সত্যিই গরু কোনো গর্তে গিয়ে নেমে পড়বে?

সঙ্গী বললেন: না, না, ভয় পাবার কিছু নেই। অন্ধকার হলে কি হবে, গরুই পথ চিনে চলে যাবে। বিশেষ করে বাড়ী ফেরার সময় ওরা কখনো পথ ভুল করে না।

গতি মন্থর হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই, তবুও এগিয়ে চলেছে। রাত যতই হোক, পৌঁছোতে হবে খানসামা থানায়। নিশ্চয়ই সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই সেখানে পৌঁছে গেছে। অভ্যর্থনা করবার জন্য হয়তো অপেক্ষায় আছেন দারোগাবাবু। হয়তো ক্ষীরোদ দত্তেরই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ। কিংবা হয়তো অবিনাশ জমাদারেরই ভায়রা ভাই।

একসময় বর্ষণ আবার থেমে গেল। গলা বাড়ালাম বাইরে। নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, লণ্ঠনের স্তিমিত আলো তা যেন ভয়াবহ করে তুলেছে। মনে হচ্ছে সম্মুখের জমাট অন্ধকার শিংয়ের ঘায়ে ঘায়ে বিদীর্ণ করে ও খুরের ঘায়ে ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাহনযুগল ল্যাজ নেড়ে নেড়ে।

রাত্রি প্রায় দশটায় এসে প্রবেশ করলাম থানা কম্পাউণ্ডে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোরেখায় স্পষ্ট পড়লাম এ্যালুমিনিয়মের নীল সাইনবোর্ড, খানসামা পোলিস স্টেশন। তাহলে শুধু দারোয়ানী নয়, খানসামা নামেও আছে একটি গ্রাম এই বিশ্বে! বারান্দায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন যিনি, তিনিই বোধহয় অসিসার-ইন-চার্জ্জ। তারপর টেবিলের বিপরীত দিকে উপবিষ্ট একজন সুপুরুষ বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন: ইনি হচ্ছেন আমাদের ইনসপেক্টার সাহেব।

বসলাম। চারিদিকেই অন্ধকার। মনে হলো কোন্ সুন্দরবনে আমায় আনা হয়েছে কিংবা থারাবাড়ির গহন অরণ্যে। কে জানে, হয়তো এ গ্রামের সবাই খানসামা, তাই এর নাম খানসামা।···

নীরবতা ভঙ্গ করলেন ইনসপেক্টার সাহেব: কিন্তু এত রাতে ডেটিনিউবাবুর খাবার কী ব্যবস্থা হবে দারোগাবাবু? রঘুর দোকান কি বন্ধ হয়ে গেছে? না হয় একজন সিপাইকে পাঠান কিছু খাবার কিনে আনতে।

বিশ্বেশ্বরবাবু তা আগেই আনিয়ে রেখেছেন স্যার!—বলেই হাঁক দিলেন দারোগা: রবি, রবি, বিশ্বেশ্বরবাবুকে একবার ডাক তো। বল, দ্বিজেনবাবু এসে গেছেন।

থানাঘর থেকে বেরিয়ে রবি পাশের বেড়া-দিয়ে-ঘেরা ছোট্ট বাসাটিতে প্রবেশ করলেন। একটু পরেই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বিশ্বেশ্বরবাবুকে। মালপত্র তোলা হলো আমার ঘরে। বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমি এসে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় প্রবেশ করলাম।

একখানাই ঘর, মাঝে ছিটে বেড়ার পার্টিশন তুলে দুটি কক্ষে বিভক্ত। মাটির মেঝে, খড়ের চাল, তক্তপোশটা অন্ততঃ কেশিয়াড়ীর মত পাঁচ ফুট নয়, আর প্রস্থেও বেশ।

দোকানের লুচি, তরকারি ও মিষ্টি খেতে খেতে বিশ্বেশ্বরবাবু মোটামুটি সবই জানিয়ে দিলেন। এ গ্রামের প্রায় সবই হিন্দু। বেশ কিছু মাড়োয়ারীও আছেন। পাশেই খানসামা বন্দর। পূর্ব্ববঙ্গের বন্দরের সঙ্গে অবশ্যই তুলনীয় নয়। তথাপি খুব ছোট নয়। বড় দোকান গোটাকয়েক আছে। খাবার-দাবার মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। সপ্তাহে দু'দিন হাট আর রোজ বিকেলের দিকে দু'চার ঝুড়ি মাছ আসে। লোকাল ফিশ, অদ্ভুত নাম—খড়কি, ভাংনা, কুরসা, দাইরকা ইত্যাদি"। ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত যাঁরা, তাঁরা প্রায়ই বিদেশী, এখানে এসে জমিজমা কিনে এ দেশীয় লোক অর্থাৎ বাহেদের ওপর রাজত্ব করছেন। ধোপাও আছে, নাপিতও আছে এবং তাদের কাজও চলনসই। দুর্গাপূজোও হয় বেশ ঘটা করে এবং কখনো কখনো নাটকাভিনয়। দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, পোস্টঅফিসও আছে। ছেলেদের আছে এম ই স্কুল আর মেয়েদের ইউ পি। ফুটবল খেলাও হয়ে থাকে। আর এই সব পূজা পার্ব্বণ, খেলাধুলা, অভিনয়, জলসা—বলতে বলতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: গ্রামের প্রত্যেকটি কাজে অগ্রণী ও লীডার হচ্ছেন এখানকার চাটার্জ্জী ফ্যামিলি। সাতটি ভাই, প্রায় সবাই মাস্টার। এঁদের বাবা এম ই স্কুলের হেডমাস্টার, এক ভাই ঐ স্কুলেরই হেডপণ্ডিত, একজন এল পি স্কুলের মাস্টার, আর এক ভাই দূরে আর একটি এম ই স্কুলের হেডমাস্টার। আর এক ভাই স্কুলমাস্টার না হলেও মাইল কয়েক দূরে এক গ্রামে পোস্টমাস্টার।

হেসে বললাম: মাস্টার পরিবার দেখছি।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: শুধু তাই নয়। রাজনৈতিক ব্যাপারেও এঁরাই অগ্রগামী। এঁদের এক ভাই নজরবন্দী হয়ে আছে বাড়ীতে, কাজও কিছু করছে মনে হয়। পলাতক নরেন ঘোষকে এঁরাই আশ্রয় দিয়েছিলেন একবার। পুলিশের ভারী নেকনজর এঁদের ওপর। কালই হাট আছে, দেবো আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে।

থানার পরিচয়ও মোটামুটি পাওয়া গেল। দারোগার দেশ বিক্রমপুরে। ভীষণ বদমাশ। বোকা, অথচ মহাবিজ্ঞের ভান করে থাকেন। ব্যবহারে

একেবারে চাষার মতো। সেইজন্যই আগেকার রাজবন্দী বীজেশ বোস ব্যাটাকে স্যাণ্ডেল দিয়ে দু' ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন।

সম্মুখে জমাট অন্ধকার দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম: চারদিকে সবই তো জঙ্গল দেখছি।

বাধা দিলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: না, না, জঙ্গল আদৌ নয়। সামনেই থানার মাঠ, ওপাশে গোটা দুই কাছারী, সেখানে নায়েবরা বাস করেন সপরিবারে। ঐ কোণের বাসা কিশোরীমোহন ঘোষের, আমাদের নন-অফিসিয়েল ভিজিটর। ডাক্তারী করেন। ওর পরেই বন্দর, বন্দরের ওপারে চাটার্জ্জীদের বাড়ী। আর এদিকে একটু পরেই আত্রাই নদী! নামেই নদী, বর্ষাকালে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর চৈত্রমাসে একেবারে হাঁটুজল।

যা তথ্য সংগৃহীত হলো, তাতে বেশ বুঝতে পারলাম যে, দারোয়ানীর wayside স্টেশন দেখে যতটা মুষড়ে পড়েছিলাম, খানসামা গ্রামের কাহিনী ততটা নিরাশাব্যঞ্জক তো নয়ই, বরং আভিজাত্যে ও প্রগতিবাদে একেবার নবাববাড়ীর খানসামা মনে হতে লাগলো!......

অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প হলো এবং রাজনৈতিক পরিচয় আদানপ্রদানে জানা গেল, বিশ্বেশ্বরবাবু চট্টগ্রামের অনুশীলন দলের সভ্য। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলাম বৈ কি!

পরদিন সকালবেলা অকস্মাৎ বাড়ীর বাইরে কার হাঁকডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেশী রাতে শুয়েছি রেলগাড়ী ও গরুর গাড়ী জার্নির পর, তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ভোর কাটাতে ভালই লাগছিল। কিন্তু বার বার ডাকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম এবং বাড়ীর ঝাপের দরজা খুলে দিতেই দেখি একজন জীর্ণবস্ত্র পরিহিত ঘোড়সওয়ার। ঘোড়সওয়ার?

পর পর প্রশ্ন করলাম: কি চাই? কাকে চাই? কেন চাই? এত সকালে কেন? কোথা থেকে আসা হয়েছে? কোথায় যাওয়া হবে?

আমার এতগুলো চোখা চোখা প্রশ্নের জবাবে অশ্বারোহী শুধু বললেন দুটি কথা: ভিখ্ দেন।

ভিখ্? মানে ভিক্ষা? ঘোড়ায় চড়ে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা? সে কি? ঘোড়ার জন্য যে খাবার সংগ্রহ করতে পারে, সে কি আগে নিজের পেটের ব্যবস্থা

করে না? এ কী রকম ভিক্ষুক? কলকাতায় অবশ্য দেখেছি ভিক্ষুকের সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা। কেউ চলেছে গড়াতে গড়াতে, কেউ কেরোসিন বাক্সের গাড়ীতে, কেউ চলেছে অনাবৃত থকথকে ঘায়ের মাছি তাড়াতে তাড়াতে, ওদেরই সঙ্গে কোনো ঘাগরা-পরা মেয়ের হাতে হয়তো একটি খঞ্জনীজাতীয় কোনো যন্ত্র, তাই বাজিয়ে অবোধ্য ভাষায় চলেছে কোরাস্ সঙ্গীতে, ভিক্ষুকেরা দোতলায় দৃষ্টিপাত করে চাইছে কাপড় বা খাদ্য, পথচারীর কাছে হাত পেতে চাইছে পয়সা···এসব ভিক্ষুককে চিনি। কিন্তু একেবারে ঘোড়সওয়ার ভিক্ষুক তো দেখিনি কোনো দিন। কল্পনারও বাইরে। দেখে মনে হলো, এসেছেন যেন কোন্ মিঃ আউটরাম কিংবা ক্রমওয়েল, এখনই দাবী করবেন খিঁজির খাঁর বজ্রকণ্ঠে হতভাগ্য আলীখাঁর ছিন্ন শির!···

বৃথা কালক্ষেপ না করে বিদায় করে দিলাম অশ্বারোহীকে দুমুঠো চাল দিয়ে। অশ্বের খুরের ঘায়ে কিছু ধুলো উড়িয়ে রাস্তার বাঁকে ভিক্ষুক অদৃশ্য হয়ে যেতেই এবার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। বেশ বড় কম্পাউণ্ড। ইচ্ছে করলে ছোট-খাটো ফুটবল খেলার মাঠ করা যেতে পারে। দূরে একদিকে দু'খানা কোঠাবাড়ী, একখানা সাদা রংয়ের, অপরখানা লাল। আয়তন দেখে বেশ বুঝতে পারলাম সাদাখানি দারোগা পরিতোষের আর লাল রংয়েরখানা জমাদার কামাখ্যা মুখার্জ্জীর। সামনেই প্রকাণ্ড একটি আম্রবৃক্ষ, তার নীচে বাঁশের মাচা। বসে হাওয়া খাওয়া যেতে পারে। ওপারে বাঁশের চেগার দিয়ে ঘেরা সারি সারি বাড়ী। বোধহয় কিশোরীবাবুর ও নায়েববাবুদের। যাক্, ভদ্রলোক আছেন তাহলে খানসামা গ্রামে।

একটু পর যেই বাসার মধ্যে পা দিয়েছি, অমনি আবার বাইরে শোনা গেল হাঁক: উই মাছ নিবেন বাবু?

উই মাছ? কই, এ মাছের নাম তো শুনিনি কোথাও। বিশ্বেশ্বরবাবুও এ নামে কোনো লোকাল মাছের নাম তো করেননি কাল। যাকৃগে, সোজা জবাব দিয়ে দিলাম: না, না, উই মাছ-টাছ চাই না।

বলে আবার ঘরে প্রবেশ করছিলাম, এমন সময় ওঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: ও কি মশাই, মাছ তাড়িয়ে দিলে খাবেন কি?

বললাম: দূর মশাই, উই মাছ কি খাদ্য?

না, অখাদ্য।—বলে বিশ্বেশ্বরবাবু ডাকলেন মাছওয়ালাকে। তারপর তার ঝাঁকা নামিয়ে ডালাটা সরিয়ে ফেলতেই দেখলাম মাঝারী সাইজের সব রুইয়ের বাচ্চা।

জিজ্ঞেস করলাম : কোথায়, তোমার উই মাছ কোথায় ?

বিরক্তি প্রকাশ করলো মাছওয়ালা : ক্যানে চৌখৎ দেখিবার পান না ?

তাহলে কি রুই মাছই এদেশে উই মাছ ? পরে বিশ্বেশ্বরবাবুর মুখে শুনলাম, কথাটা সত্য। এই বাহের দেশে 'র' অক্ষরটি শব্দের প্রথমে থাকলে তার উচ্চারণ হয় 'অ', আবার 'অ' থাকলে হয় 'র'। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমবাবুর রামবাগানে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঃ, চমৎকার দেশে এসে পড়েছি তো! বহরমপুর বন্দীশিবিরে তো উত্তর-বঙ্গের, এমন কি, এই দিনাজপুর জেলারই অনেক বন্দীর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। স্বয়ং করালীকান্ত বিশ্বাস এই দিনাজপুরেরই। কিন্তু তাঁদের মুখে তো এই দুটি অক্ষরের এমনি দুর্দ্দশা শুনিনি !···

বিকেলে হাট। চাকর নেই। সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি। এসে আবার রান্না করবেন তিনি! বেশ বড় হাট বলা যায়। তরি-তরকারি, মাছ প্রভৃতি সবই প্রচুর উঠেছে। কতকগুলো মাড়োয়ারীর দোকান দেখলাম। সেগুলো প্রায়ই মণিহারী, কাপড়ের বা পাইকারী ও খুচরা মুদীর দোকান। বিশ্বেশ্বরবাবু সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। কুঞ্জলাল আগরওয়ালা, বাসুদেব ঘোষ, মতিলাল সমাদ্দার, লাট্টু বিশ্বাস, স্যানিটারী ইনসপেক্টার অমূল্য গুপ্ত, রঘুপদ হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার শেষ করে বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন : কিন্তু বড়দা'কে তো দেখছি না।

প্রশ্ন করলাম : বড়দা' ?

হুঁ। বড়দা', চাটার্জ্জী পরিবারের বড় ছেলে। খানসামার সবারই বড়দা'। হাটে তাঁর আসা চাই-ই। তাঁর বাবা তারকবাবুও আসেন বা অন্যান্য ভাইরাও আসেন। কিন্তু যত লোকই আসুক, বড়দা' আসবেনই এবং কিছু-না-কিছু সওদা করে ঠকে যাবেন অথচ বাড়ীতে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে দাবী প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করবেন যে, তিনি ঠকেননি। কোনো দোকানীর সাধ্য নেই যে তাঁকে ঠকায়। জীবনে ঠকেননি তিনি।

বিশ্বেশ্বরবাবু হেসে বললেন : ভারী সরল ও সোজা মানুষ।

কিন্তু চাটার্জ্জী পরিবারের কাউকে দেখা যাচ্ছিল না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন তিনি। আমাদের কেনবার দ্রব্য সামান্য। আলু পটল ও কিছু মাছ নিলেই চলবে। তাই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ একসময় বলে উঠলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: ঐ যে, পণ্ডিতকে দেখা যাচ্ছে কালুবাবুর দোকানে, চলুন।

কিন্তু যাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম, পণ্ডিত বলে তাঁকে কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বয়স বাইশ-তেইশের বেশী হবে না, ক্লিন শেভ, বড় বড় চুল ব্যাক ব্রাশ করা, কোছা-আঁটা পাতলা ধুতি ও গায়ে সাদা হাফশার্ট, কলারটি তোলা আর পায়ে আধুনিক স্যাণ্ডেল। কীভাবে ইনি স্কুলের হেডপণ্ডিত হবেন? হেড-পণ্ডিত বলতেই যে মূর্ত্তিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হচ্ছে—অন্ততঃ চল্লিশ বছর বয়েস, স্কন্ধে তেল চিটচিটে উত্তরীয়, মুণ্ডিত বা কদম-ছাঁট মস্তকের দীর্ঘ শিখাগ্রভাগে জবা ফুল, অন্ততঃ সাতদিন ক্ষৌরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, বেশ সুডৌল একটি ভুঁড়ি, তার ওপর লম্বমান স্বেদসিক্ত ময়লা যজ্ঞোপবীত, পায়ে বিদ্যাসাগরী বা সাধারণ চটি, হয়তো কোনো তর্কচঞ্চু অথবা বিদ্যাদিগ্‌গজ! কায়দাদুরস্ত অতি আধুনিক ফিটফাট্ বাইশ বছরের ছোকরা কী করে স্কুলের হেড-পণ্ডিত হতে পারে?

পরিচয় হলো এবং নানা কথার মাঝখানে চিত্তবাবু যখন পকেট থেকে বার করে একটি বিড়ি অফার করতে চাইলেন, তখন না হেসে পারা গেল না। বললাম: এই একটিমাত্র নিশানা রেখেছেন হেডপণ্ডিতের—বিড়ি, the only indication······

খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেশ জমিয়ে ফেলা গেল। এ-বাসা ও-বাসা করে বেশ কাটিয়ে দিই সকালটা, দুপুরের আহারের পর নিদ্রা আর বিকেলে থানা কম্পাউণ্ডে ভলি খেলা। পূর্ব্বেই বলেছি বহরমপুর বন্দীশিবিরে ভলি খেলায় নাম ছিল আমার। অবশ্য তিন বছর আর অভ্যাস নেই। তথাপি কয়েকদিনের মধ্যেই আবার হাত খুলে গেল। গ্রামের অনেকেই খেলতে আসেন। সেখানেই নতুনদের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং আরও আড্ডা মারবার স্থান পাওয়া যায়।

দারোগা পরিতোষও আসেন। খেলবার স্টাইলটি তাঁর একেবারে নিজস্ব। প্রত্যেকটি বল্ ফেরাবার জন্য তিনি প্রায়ই কামান দাগেন দু'মুষ্টি একত্র করে এবং ফলে ওভার-বাউণ্ডারী চাপ হয় বটে, কিন্তু হেরে যেতে হয়।

অমূল্য গুপ্তও আসেন এবং চেষ্টা করেন তাঁর ভুঁড়ি নিয়ে লাফিয়ে চাপ মারতে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে চাটার্জী পরিবারের ছেলেদের নিয়ে। সেজভাই নীরদ মাইল ছয়েক দূরে বীরগঞ্জ গ্রামের পোস্টমাস্টার। বিকেলে অফিস বন্ধ করে প্রায়ই চলে আসেন সাইকেলে, রবিবার হলে তো আসবেনই। মেজভাই প্রমোদ মাইল বারো দূরে একটি স্কুলের হেডমাস্টার। রবিবার তিনি আসবেনই এবং ফিরে যাবার সময় প্রায়ই সোম চলে যায়, মঙ্গলও কখনো কখনো। তাই তিনিও আসেন। আর সত্যরঞ্জন অর্থাৎ বিলু তো বাড়ীতেই থাকে, হোম ইনটার্নড। এবার ম্যাট্রিক দেবে প্রাইভেটে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এঁরা প্রত্যেকেই প্রায় ছ' ফুট দীর্ঘ। ফলে নেটের ওপর দিয়ে চাপ মেরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা এঁদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। এঁরা যেদিকে থাকেন, সেদিকের জয় অবধারিত বলা যায়।

খেলার পর ফিরে এসে আমরা বেশ করে স্নান করি কূয়োর জলে। তারপর রাঁধতে বসেন বিশ্বেশ্বরবাবু। একেবারে পাকা রাঁধুনী। তবে শাকসবজি বা লতা-পাতা ডাঁটার জাবেদা রান্না নয়, কালিয়া, কোর্মা, দোপেঁয়াজী, তা না হলে ডিমের ডালনা বা পটলের দোলমা রাঁধতে সিদ্ধহস্ত তিনি। জানা গেল, দেশের নেতারা চট্টগ্রাম শহরে গেলে রান্নাঘরের একচ্ছত্র আধিপত্য ছেড়ে দেওয়া হতো তাঁর ওপর। হাতা-খুন্তি নাড়তেন অবশ্য মেয়েরাই, কিন্তু রন্ধনশালার একমাত্র হাইকোর্ট ছিলেন তিনিই। খাবার পর আম গাছের নীচে মাচার ওপর বসে বা শুয়ে চলে আমাদের গল্পগুজব যতক্ষণ খুশী ততক্ষণ।

দু'এক মাসের মধ্যেই বেশ খাপ খাইয়ে নিলাম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। গাইডের কাজ করতে লাগলেন বিশ্বেশ্বরবাবু এবং তা কৃতিত্বের সঙ্গে।

যেদিন ভলি খেলা হতো না অথবা হলেও, কোনো কোনোদিন খেলতে ভালো লাগছে না বলে একটা ওজর দেখিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়তাম গ্রামের পথে। বন্দরের ভিড় পশ্চাতে রেখে এগিয়ে যেতাম যেকোনো দিকে যতদূর খুশী। বাঁধানো রাজপথ নয়, খোয়া ও এ্যাসফালটামের কেরামতি নয়, মেঠো পথ, ধুলোবালিতে ভর্ত্তি, গরুর গাড়ীর চাকায় দু'পাশে তৈরী দুটি সরু ড্রেন-এর মতো, এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও কাঁটা গাছ, কোথাও কোনো গাছের ডাল নেমে এসেছে পথের ওপর। সাবধানে পা ফেলতে হয়, সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে হয়।

তবু ভালো লাগে গ্রামের পথে হাঁটতে। আম বাগানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাঁশবনের নীচে দিয়ে এই পথটা সম্মুখের ঐ মাঠ পেরিয়ে কোথায় গেছে, দেখতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবো, কতদুর যাবো, কেন যাবো, কিছুই ঠিক না করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে গ্রামের মেঠো পথে। কত নাম-না-জানা ফুল ফুটে রয়েছে নিভৃতে, কত নাম-না-জানা গাছ, গাছের ডালে কত নাম-না-জানা পাখী, সে পাখীর কি বিচিত্র কলরব! ধুলো হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে আসে, বন্ধুর পথে হোঁচট খেয়ে ব্যথা লাগে, ঘামে গায়ের জামা ভিজে যায়, তবুও আমরা হাঁটি, শুধু হাঁটি।

বিশ্বেশ্বরবাবু যেমন গ্রামের ছেলে, তেমনি আমিও। চট্টগ্রাম তাঁর দেশ। হয়তো সেখানকার গ্রামে পাহাড়-পর্ব্বত নদী-নালার প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও সুন্দর। আমার দেশ বিক্রমপুরে। বর্ষাকালের কথা বাদ দিলে আমার গ্রাম প্রায় এমনিই হবে। এই খানসামা গ্রামের মুকুরেই যেন আমি কেয়টখালীর সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত দেখতে পেতাম! এখানকার নৈসর্গিক রূপ-ঐশ্বর্য্য পিপাসার্ত্ত দুই চক্ষু দিয়ে প্রাণভরে পান করতাম। এখানকার বাতাসে যেন কেয়টখালীরই চেনা সুবাস ভেসে আসতো!

কুড়ি

কিন্তু প্রবাদ আছে যে, যে ডাকাত, সে হাতের কাছে আর কিছু না পেলেও কচুগাছ কেটেও অভ্যেসটা বজায় রেখে যায়। আমারও হলো তাই।

প্রথমেই স্থির করলাম চাটার্জ্জীদের ঐ স্বগৃহে অন্তরীণ ভাই বিলুর সঙ্গেই করতে হবে পরিচয়। প্রকাশ্যে নয় গোপনে! কোন্ দলের সভ্য সে, অনুশীলন, না যুগান্তর, কোন্ গ্রুপের কর্ম্মী, তা জানা না থাকলেও বহরমপুরে থাকাকালীনই জানতে পারা গিয়েছিল যে, দলীয় সচেতনতা উত্তরবঙ্গের কর্ম্মিদের মধ্যে তখনো তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে অনেক কাজ, অনেক দুঃসাহসিক কাজও তাঁরা করেছেন, কিন্তু বাংলা দেশে তখন যে অনুশীলন ও যুগান্তর নামে দুটি বৃহৎ বিপ্লবী দল ছিল এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল অসংখ্য দল, উপদল, গ্রুপ, উপ-গ্রুপ, এসব সংবাদ তাঁরা রাখতেন না অথবা এসব সংবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না।

সুতরাং বিলু এর ব্যতিক্রম হবে কেন? যদিও হয়, তাহলেও তাকে আমার আওতায় টেনে নিতে বেগ পেতে হবে না। তারপর ওরই মারফত স্ুঁচ হয়ে প্রবেশ করবো এই গ্রামে। কে জানে, হয়তো এই সুদূর দিনাজপুর জেলার খানসামা গ্রামেই একদা স্থাপিত হবে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটি প্রাণবন্ত শাখা। বিশ্বেশ্বরবাবুকে বললাম সব। অনুশীলনের হলেও আমার কাজে বাধা দেওয়া তো দূরে থাক, বরং কোনো সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া তাঁর করায়ত্ত হলে তাও করে দিতে স্বীকৃত হলেন। সেই দলাদলির যুগে ও সুতীব্র দলীয় চেতনার যুগে এমনি উদারতা ছিল চিন্তার অতীত। স্পষ্ট দুটি বিরোধী দলের সভ্য হয়েও খানসামার অন্তরীণ জীবন আমাদের পারস্পরিক সখ্য ও সহযোগিতায় মধুময় হয়ে উঠেছিল।

বিলুর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় হলো গ্রামের বাইরে ফুটবল খেলার মাঠের ধারে একটি ঝোপের আড়ালে। কোনো উপক্রমণিকার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না কোনো জ্বালাময়ী ভাষার। দেশপ্রেমের আগুন আগে থেকেই যার বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছে তুষের আগুনের মতো, সেখানে প্রয়োজন শুধু তাতে ইন্ধন জোগানো। তাহলেই সেখান থেকে একদিন প্রসারিত হবে সর্ব্বগ্রাসী

আগুনের লোল জিহ্বা। আবার জল ফুটে উঠবে, স্টীম তৈরী হবে, আবার সংগঠন-স্টীমারের প্রপেলর ঘুরবে !……

বিলু বললো : খানসামা গ্রামে ছেলের চাইতে অনেকগুলো ভালো ভালো মেয়ে আছে, যাদের নিয়ে চমৎকার একটা অর্গানিজেশন গড়ে তোলা যায়। তাদের মধ্যে কেউ প্রাইভেট পড়ে ম্যাট্রিক দেবার জন্য, কেউ তাও পড়ে না। তথাপি ওদের দিয়ে কাজ করানো যাবে।

বললাম : কোথায়, একজনকেও তো এই ক'মাসে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

দেখেছেন, হয়তো লক্ষ্য করেননি। তারা কিন্তু সবাই দেখেছে আপনাকে ও বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে আপনার সম্বন্ধে। আপনাদের নন-অফিসিয়েল ভিজিটর কিশোরী ঘোষেরই দুটি নাতনী আছে—শান্তি আর ছুটুন।

ছুটুন ?

হ্যাঁ ছুটুন। ভাল নাম লীলাবতী। তারপর চাঁদপুর কাছারির নায়েব উমাচরণ সেনের দুটি মেয়ে আছে—বীণা ও রেণু। রেণু প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। তারপর আমাদের বাড়ীর উল্টো দিকে ভবেন সান্যালের আছে একটি মেয়ে—বিলু।

বিলু—মেয়ে ?

হেসে জবাব দিল বিলু : হ্যাঁ, বিলু ছেলে আমি আর সে বিলু মেয়ে। এ দেশের নামগুলো এমনি অদ্ভুত দ্বিজেনবাবু। আষাঢ় মাসে জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় আষারু। বৈশাখে হলে বৈশাখু। সোমবার জন্ম হলে সে হয় সোমারু। রাত পোহালে তার নাম রাখা হয় পোহাতু। ছোটবেলা যে কাঁদে, সে হয় কান্দুরা। এমনি সব।

নামাবলী শুনে কিছুক্ষণ হাসা গেল দু'জনে। তারপর বিলু বলতে লাগলো : আমার বড়দির মেয়ে আছে, টুকু। তবে সে বড়লোকের কন্যা, সহজে হাত করা যাবে না। আর আছে আমার ছোট বোন খুকু।

বয়েস খুব কম বুঝি ?

না, না, কম নয়।—বলতে লাগলো বিলু : তবে হ্যাঁ, মাস্টারী করছে একেবারে এগারো বছর বয়স থেকে, তখনো ফ্রক পরতো। আমাদেরই বৈঠকখানায় ক'জন মেয়ে নিয়ে একটা কোচিং ক্লাসের মতো খুলেছিল। তারপর

বৃত্তি পরীক্ষায় তিনটি মেয়ে বৃত্তি পাওয়ায় স্কুলটি এবার গভর্নমেন্ট এইড্ পাচ্ছে। এবং সারা দিনাজপুর জেলার সবগুলো মেয়ে এল পি স্কুলের মধ্যে সবার চাইতে বেশী এড্ পায় আমার বোন খুকু। বয়স সতেরো-আঠারো হতে পারে। ভাল নাম শিশিরকণা।

কিন্তু মেয়েদের অর্গানিজেশন? শুধুই মেয়ে?…একটু ভাবনায় পড়লাম বৈ কি! জীবনে শুধু ছেলেদের অর্গানিজেশনই করে আসছি। পথেঘাটে, ট্রেনে, স্টীমারে, হাটে বাজারে যেখানেই সুযোগ পেয়েছি, বিপ্লবের অগ্নিকণা ছড়িয়ে দিচ্ছি ছেলেদের অন্তরে। কিছু কিছু কণা নিভে ছাই হয়ে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু অনেকগুলোই এখনো জ্বলছে। কোনোটা জ্বলছে ধিকিধিকি, কোনোটা হয়ে উঠেছে গনগনে, কোনোটা শিখা বিস্তারের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে, কোনোটা সত্যিই লেলিহান, আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেছে কোনোটা!…কিন্তু সে সবই ছেলে।

আগুন ছড়াতে গিয়ে মেয়েদের কি সাক্ষাৎ পাইনি? তারাও কি অঞ্জলি-ভরে চায়নি আগুনের আশীর্ব্বাদ? অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষায় তারাও কি পাগল হয়ে ওঠেনি? জানি, সবই সত্য, ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছে আত্মবিসর্জ্জনের পথে। কিন্তু শুধুই মেয়েদের সংগঠন? খুব অসুবিধা হতো না যদি কোনো মেয়ে ভার নিত এই সংগঠনের। আমরা ছেলেরা থাকতাম নেপথ্যে, সেখান থেকেই এদের পরিচালনা করতাম। হয়তো তাই শেষ পর্য্যন্ত করতে হবে।

কিন্তু এই অজানা অচেনা গ্রামে অপরিচিত পরিবেশে মেয়েদের সংগঠন গড়ে তোলার ঝুঁকি নেওয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে? ইতস্ততঃ করতে দেখে বিলু সোৎসাহে বলে উঠলো: কোনো অসুবিধে হবে না। সব আমি ব্যবস্থা করে দেবো দ্বিজেনবাবু। প্রত্যেকের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একেবারে পরিবারের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দেবো। এদের বাবা-মাদের প্রায়ই আমরা মেসো-মাসী বা কাকা-কাকী বলে ডাকি। সুতরাং কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।……

তথাস্তু।

এর পরই বেরিয়ে পড়লাম গ্রামে। আর পথে পথে নয়, এবারে বাড়ীতে বাড়ীতে। বন্দরের মাড়োয়ারী গদীগুলোতে হানা দিলাম। তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। বাঙালী দোকানদারদের দোকানে প্রায়ই যাতায়াত শুরু করলাম।

বার কয়েক দোকানে দেখা হবার পর স্বাভাবিকভাবেই বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবার অনুরোধ এল। সেসব অনুরোধ তৎক্ষণাৎ রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠলাম। গোটা কয়েক তুচ্ছ দাবী নিয়ে একদিন আমাদের নন-অফিসিয়েল ভিজিটর ডাক্তার কিশোরী ঘোষের বৈঠকখানাতে গিয়েই হাজির হলাম। তারপর আর দাবী নয়, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ। বৈঠকখানাতেই নানা গল্প ও চা-জলখাবার। ক্রমে বৈঠকখানার গণ্ডী অপসারিত হলো এবং ডাক্তার ঘোষের পুত্রবধূরা আমার বৌঠান হয়ে পড়লেন।

পাশের কাছারি বাড়ীতে দুপুরে তাসের বৈঠক শুরু হলো। জমে উঠলো আড্ডা। যাঁরা আসতে লাগলেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলো, তারপর পার্টনার হয়ে খেলা চললো, অন্তরঙ্গতা হলো, তারপর একদিন গরীবের বাড়ীতে চা খেতে যাবার আমন্ত্রণ এলো।

একটি লোকও সন্দেহ করতে পারলো না যে, এই নতুন-আসা রাজবন্দীটির মনে মনে কোনো পরিকল্পনা আছে!···

কিন্তু একজন বেশ সন্দেহ করতে লাগলেন। তিনি আর কেউ নন, পরিতোষ দারোগা। গ্রামের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তা সহ্য হচ্ছিল না তাঁর। যে বাড়ীতে যাই, সেখানেই সবাই আদর করে অভ্যর্থনা করেন আমায়, সবাই ঘিরে বসেন, দেশবিদেশের কত গল্প শোনেন, মেয়েরা গান করে, ছোটরা এসে কোলে চেপে বসে, বাড়ীর ভাদ্রবধূরাও আমার সঙ্গে হাসিপরিহাস করেন, প্রায়ই চা পানের বা আহার করবার নেমন্তন্ন আসে···এর প্রত্যেকটি ঘটনা পরিতোষের গায়ে এক একটি ফোস্কা পরিয়ে দিল যেন উত্তপ্ত লোহার শিক ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে! এর পর যখন সে শুনতে পেল পুজোর সময় যে নাটকাভিনয় হবে, আমিই তার অন্যতম উদ্যোক্তা, সংগঠক ও নাট্যপরিচালক এবং যখন দেখতে পেল যে, প্রতিদিন অপরাহ্নে আমারই উপস্থিতিতে মতিলাল সমাদ্দারের কাছারি বাড়ীতে পুরোদমে মহলা হচ্ছে, পরিতোষ তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলো!

কেশিয়াড়ীর ক্ষীরোদ দত্তের মতোই পরিতোষ চরিত্রহীন। তবে ক্ষীরোদের চরিত্রহীনতায় অনেকখানি সাহস আছে, আছে বেপরোয়াভাব। লালসায় মাতাল হয়ে সে যেখানে খুশী হানা দেবে, আবার তার ফলে মার খেয়ে ড্রেনে পড়ে থাকতেও তার লজ্জা নেই। কোনো মেয়ে প্রকাশ্যে তার গণ্ডে স্যাণ্ডেল প্রহার করলেও ক্ষীরোদ দারোগা তার আঁচলের বর্ণনায় মেতে উঠবে। আর

পরিতোষ অনেকটা ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো। অস্থিচর্ম্মসার, রোগজর্জ্জর! অথচ লোভ আছে সীমাহীন। ঘেউ ঘেউ করে দাবী জানাবার মতো হিম্মৎ নেই, তাই ঘ্রাণের টানে মাটি শুঁকতে শুঁকতে ব্যাটা ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। কাছে গিয়ে আহ্লাদে ল্যাজ নাড়ে নয়, ল্যাজই তাকে নাড়ায়। বিরক্ত হয়ে যদি লাথি মারা যায়, তাহলেও প্রস্থান করতে চাইবে না। চার পা হটে গিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদুনি গাইবে, তারপর আবার শুক শুক করে মাথা নীচু করে দু'পা এগিয়ে আসবে প্রসাদের প্রত্যাশায়!…

ক্ষীরোদ গৃহিণীকে দেখেছি দ্ব্যর্থহীনভাষায় বরাবর স্বামীর চরিত্রহীনতার নিন্দা করতে। নিষ্পাপ মহিয়সী মহিলা কোনোদিন স্বামীকে ক্ষমা করেননি। সাধ্যমতো বাধা দিতে চেষ্টা করে হয়তো কচিৎ কৃতকার্য্য হয়েছেন, ক্ষোভে দুঃখে নিরুপায়ের মতো দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা খুঁড়েছেন, হয়তো লম্পট স্বামীর ঘর করার চাইতে মৃত্যুকেই কামনা করেছেন। আর পরিতোষ গৃহিণী ঠিক তাঁর বিপরীত। চরিত্রহীন স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। সহজ ভাষায় যাকে বলা যায় দালাল। কেশিয়াড়ীর হরিমতীর মতো। হরিমতী ছিল ক্ষীরোদের দালাল। বাড়ীর কর্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে তার পক্ষে দালালী চালানো কিছুটা কঠিন ছিল বটে, কিন্তু এখানে বাধা দেবার আর কেউ নেই। লাম্পট্যে স্বামী-স্ত্রী একেবারে হরিহর আত্মা!…

ভদ্রলোকদের বাড়ীতে টোপ ফেলবার কায়দাটা পরিতোষের ভারী কৌতুকপ্রদ ও অভিনব বলা যায়। যে বাড়ী টারগেট ঠিক করা হয়, প্রথমে তাঁর সহধর্ম্মিণী সেখানে যাতায়াত শুরু করে দেন। কোথাও তিনি মাসী, কোথাও কাকী, কোথাও জ্যেঠী, কোথাও আবার মামীও বটে। দশমহাবিদ্যার মতো। কিন্তু তাহলে কী হবে? বাড়ীর অবিবাহিতা বড় মেয়েটির যেন তিনি সমবয়সী, যেন সমপাঠিনী, যেন কতকালের বান্ধবী, একেবারে মাই ডিয়ার মাসীর মতো! জমিয়ে নিতে খুব দেরী হয় না। তারপর একদিন মহা দুঃখ করে বিনিয়ে বিনিয়ে আধা পূর্ব্ব ও আধা পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষায় বলেন: তোদের বাড়ীতেই তো খালি আসি, কিন্তু ছুটুন, আমাগো বাসাতেও তো একবার যেতে পারিস্। তব্ মামা কত দুঃখু করে—ছুটুন আসে না। কাউলকা বিকেলে তরে বুঝি দেখছিল চাঁদপুরের দিকে যেতে। বললো, কি সোন্দর লাল রংয়ের শাড়ি পরছিলি!—যাবি নাকি রে?

অনেকবার অনুরোধ জানাবার পর তারপর একদিন ছুটুন যায় হয়তো। তার পরই আসে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর-মামা পায়ের কাছে পদলেহনের অনুরোধ জানাতে। চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু মুখে কথা ফোটে না, তাই একসময় এসে একটুখানি গায়ের গন্ধ নিয়ে যায় কিংবা হয়তো লক্‌লকে জিভ ঠেকিয়ে দিয়ে যায় পায়ের আঙ্গুলে। হয়তো লাথি মারে ছুটুন, দু'পায়ের ফাঁকে তখন ল্যাজ গুঁজে কেঁউ কেঁউ করতে করতে বেরিয়ে যায় ঘিয়ে-ভাজা কুকুর পরিতোষ দে।

আবার হয়তো একদিন পরিতোষিণী (পরিতোষ দারোগার স্ত্রীকে সবাই এই নিক্‌-নেম দিয়েছিল) গিয়ে হাজির উমাচরণ সেনের বাড়ীতে।

কি রে রেণু, কি করিস ?

উমাচরণ সেনের অনূঢ়া কন্যা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। খাতাখানা বন্ধ করে বললো : অঙ্ক করছি মাসীমা।

টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পরিতোষিণী রেণুর মুখের দিকে এবং তারপরই বন্ধ-করা খাতাটার দিকে সন্দেহের চক্ষে চাইলেন। তারপরই তাম্বুলচর্চিত কয়েকটি মূলো-দাঁত বার করে হি হি করে হেসে উঠলেন : হ—অঙ্ক করতেছিস, না মুণ্ডু করতেছিস। খাতার মধ্যে কি লুকোলি দেখি !

রেণু বললো : কিছুই না মাসীমা।

কিছুই না বললেই পরিতোষিণী তাতে কর্ণপাত করবেন কেন ? ঝপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন, তারপর মুখ টিপে টিপে হেসে বললেন : আরে, তোদের বয়সে আমরাও অমনি গুরুজনেরে দেখে ফস্‌ করে খাতা বন্ধ করছি আর বলছি, অঙ্ক করছিলাম মাসীমা।—তারপর খোলা দরজা দিয়ে একবার ফাঁকা উঠোনে দৃষ্টি ফেলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন একটুখানি অনুচ্চকণ্ঠে : একবার তো ধরা পড়ে গেলাম পিসিমার কাছে। চার পৃষ্ঠা পত্র সবে শেষ করেছি, এমন সময় পা টিপে টিপে পিছন থিকা এসে পিসিমা একেবারে খাবলা দিয়ে খাতাশুদ্ধ পত্রখানা কেড়ে নিলেন। কত পায়ে ধরলাম, কোনো কথাই শুনলেন না, সোজা নিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। পত্র পইড়া মা আমার চুলের ঝুঁটি ধরে পিট্টি দিলেন আর সেই ছেলেটারও আমাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ হলো।—আরে, তোদের বয়সে ওরকম দু'চারখানা চিঠি আমরাও লিখছি। দেখা না রেণু, কারুকে কবো না।

রেণু ভারী লজ্জা পেল। বললো : সত্যি বলছি মাসীমা—

আবার দুটো মুলো-দাঁত দেখা গেল মাসীমার : আরে, লজ্জা পাস কেন? ওতে দোষ নেই। যে বয়সের যা ধর্ম্ম! তবে হ্যাঁ, উনি কন, তোমারে আরও একবার বিয়ে দেয়া যায়।—তারপরই আবার মুচকি হাসি : অখনোও একেবারে ফুরিয়ে যাইনি, কি বলিস রে রেণু, তাই না?

পূজনীয়া মাসীমা স্নেহের পাত্রী বোনঝির সঙ্গে নিজের বিগত যৌবন ও বিস্মৃত রোমান্সের সরস আলোচনায় এমনিভাবে ডগমগ হয়ে উঠলেন যে, রেণু আর তিষ্ঠিতে পারছিল না। সে উঠে দাঁড়াতেই পরিতোষিণী এবার দালালী টোপ ফেলতে তৎপর হয়ে উঠলেন : শোন্, শোন্ রেণু, তোর মেসো বলে, খানসামা বন্দরে যতগুলো মেয়ে আছে না, তাদের সক্কলের মধ্যে সেরা মেয়ে রেণু। ভালোমন্দ রান্না হইলেই তর্ কথা, আহা, রেণু এলে ভালো হতো। আমার জন্য আনছে রঙীন ব্লাউজ, বলে, এই রংয়ে রেণুরে খুব ভালো মানায়। তর্ লইগা মেসোর চিন্তার আর সীমা নেই। একবার গেলেই তো পারস্ আমাদের বাসায়।

এমনি বার বার অনুরোধ এড়াতে না পেরে হয়তো রেণু একদিন বিকেলে যায় বেড়াতে। গেলেই লম্পট মেসো একেবারে গদগদ হয়ে অভ্যর্থনা জানায়। মোসাহেবরা যেমন তাদের বাবুর শ্রীচরণের ছুঁচো হয়ে থাকতে পারলেই জীবন সার্থক মনে করে, তেমনিভাবে পরিতোষও যেন তার তৃষিত বক্ষ প্রসারিত করে দেয় রেণুর শ্রীচরণের স্পর্শ পাবার কামনায়। হয়তো বেশ স্পষ্ট করেই পায়ের ছাপ ফুটে ওঠে তার সর্ব্বাঙ্গে। তবুও লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, মান-মর্য্যাদার আদৌ বালাই নেই পরিতোষের। খানসামা বন্দরের মেয়েদের স্যাণ্ডেল অনেকবারই পড়েছে ওর পিঠে ও গালে, তবুও শিক্ষা হলো না এই নরাধমের, শিক্ষা হলো না ওর স্ত্রীর।...

সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করলাম বিলুর কাছ থেকে এবং এমনি চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি জানবার পর থেকেই খানসামা গ্রামে মেয়েদের একটি আদর্শমূলক সংগঠন তৈরী করবার কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করলাম।

আমার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় হবার পর পরিতোষিণী ব্যবসা আর বিশেষ জমাতে পারলেন না। মন্দা পড়তে লাগলো। মেয়েদের মধ্যে তখন এসে গেছে নতুন ভাবের জোয়ার। তারা ইতিহাস পড়ে, ব্যায়াম চর্চ্চা করে, ভোরবেলা

দল বেঁধে বেড়াতে বেরোয় খানসামা বন্দরের বুকের ওপর শত গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে, তাদের সাপ্তাহিক আলোচনা সভা বসে। চাঁদা তোলে, ভালো ভালো বই কেনে, তারা দৈনন্দিন সংবাদপত্র পাঠ করে। এ কাজে নেমেছে সবাই। আত্রেয়ী, শান্তি, ছুটুন, বীণা, রেণু, ওদের দাদা জ্যোতিষবাবুর স্ত্রী, ওদের বিধবা বড় বৌদি এবং এমন কি, স্বয়ং ভবেন সান্ন্যালের কন্যা বিলু! ......সুতরাং কুকুরের গায়ের ফোস্কা পাকতে শুরু করলো। প্রতিশোধ নেবার হিংস্রতায় সে তার ধারালো দাঁত বার করলো।

শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে পরিতোষিণী বাড়ী বাড়ী গিয়ে এবার আমাদের নিন্দে ছড়াতে লাগলেন। কিন্তু পরিতোষিণী বেশ দেরী করে ফেলেছিলেন। নিন্দার দুর্গন্ধময় ভাণ্ড নিয়ে যখন তিনি আসরে নামলেন রণচামুণ্ডা বেশে, প্রতিটি পরিবারেই আমি তখন অমৃতের বাণী শুনিয়ে ফেলেছি। শুধু শোনাই নয়, দেশাত্মবোধক সেই বাণী ততদিনে পরিবারের প্রত্যেকের কানের মধ্য দিয়ে মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করেছে। চঞ্চল করে তুলেছে তাদের, ভাবিয়ে তুলেছে, উতলা করে তুলেছে, জীবনের বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত একটা অংশ যেন নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে, নব উন্মাদনায় তারা যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে!...

এমনিভাবে বিপ্লবের বীজ যেখানে অঙ্কুরোদ্গমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছে, পরিতোষিণীর ছড়ানো ও ছিটানো হলাহল সেখানে কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে? তাই নিশ্চিন্ত মনে আমরা ওকে-দেখানো বেপরোয়াভাব আরও প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলাম। টিলের বদলে পাটকেল।

বাসার বাইরেই কাটা হলো ব্যাডমিন্টন কোর্ট। বিকেলে রীতিমতো স্যুট পরে খেলা শুরু করলাম বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি। মাঝখানে ব্রেক দিয়ে হাঁক দিই: বাচ্চা!

বাচ্চা মানে, আমাদের চাকর, আমাদের ঠাকুর, আমাদের বাজার সরকার, আমাদের এ্যাকাউনটেন্ট! বাচ্চা মানে, বাচ্চা বর্ম্মণ, দিনাজপুরের জনৈক বাহে।

আমাদের আহ্বান শুনেই বাচ্চা ফোল্ডিং টেবিলখানা বাইরে এনে পেতে দেয়, দু'পাশে দুটো চেয়ার। তারপর ট্রেতে করে নিয়ে আসে টিফিন—মামলেট বা পোচ বা ডিমের বড়া, আর টি-পট ভর্ত্তি চা। বসে যাই টিফিন করতে। টুকরো টুকরো করে খাই আর খোশগল্প করি। তারপরই র‍্যাকেট হাতেই বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। বেশ বুঝতে পারতাম যে, জানালা দিয়ে পরিতোষিণী

সবই লক্ষ্য করছেন এবং জ্বলেপুড়ে মরছেন! সংবাদও পেতাম যে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে মায়েদের কাছে গিয়ে বলতেন: জানেন গো দিদি (কিংবা মাসীমা), ঐ তুগাই বদের হাঁড়ি। নইলে মাঠে বইসা মামলেট খায় কেন গো? আমাদের বড়লোকি দেখানো হয়! পিছা মার্ অমন ফুটানিরে!

কেশিয়াড়ীতে ছিলাম একা আর এখানে তু'জন। আর এমনি তু'জন যাদের বন্ধুত্ব অটুট। সুতরাং কূটনীতির সূক্ষ্ম ব্লেডের প্রয়োজন নেই এখানে, সহজভাবে ছুরি দেখিয়েই চলতে লাগলাম আমরা দারোগাকে ও দারোগাণীকে ভ্রূক্ষেপ না করে। এখানকার এল সি রবি মুখার্জ্জীকে দেখলাম বিশ্বেশ্বরবাবু একেবারে হাত করে রেখেছেন। শুনলাম দারোগা নাকি এই রবিকেই অভদ্রের মতো গাল দিয়েছিল বলেই প্রাক্তন রাজবন্দী মাদারীপুরের বিজেশ বোস পরিতোষের গণ্ডে স্যাণ্ডেলাঘাত করেছিলেন। সেদিন থেকে রবি রাজবন্দীদের কেনা হয়ে রয়েছে।

স্যাণ্ডেলাঘাত ও তার পরিণাম পর্ব্বটি ভারী মজার, পাঠকদের তা উপহার দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

একদিন বেলা প্রায় দশটার সময় থানায় পরিতোষের খুব চটাচটি কানে যাওয়ায় নিছক কৌতূহলবশতঃই রাজবন্দী বিজেশ বোস থানায় এলেন। থানার ঘরের পাশেই রাজবন্দীদের কোয়ার্টার্স। সুতরাং পরিতোষের ইংরেজী-বাংলা-হিন্দী মিশ্রিত বকুনির ভাবাটি স্পষ্ট বোধগম্য না হলেও তিনি যে রেগে গেছেন এবং ভয়ানকভাবে রেগে গেছেন, তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন বিজেশ বোস। এসে দেখলেন, সত্যাই কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! কোটরগত চক্ষু থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে, টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে, তর্জ্জনী উঁচিয়ে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কখনো বাংলা, কখনো হিন্দী, কখনো-বা ইংরেজীতে যাচ্ছেতাই করে বকুনি দিচ্ছেন পরিতোষ আর নিরীহ গোবেচারা এল সি রবি মুখার্জ্জী নীরবেই প্রায় সবটুকু হলাহলই গলাধঃকরণ করছে, শুধু মাঝে মাঝে এক-আধটা কথায় মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে, যতটা দোষী পরিতোষ তাকে মনে করছেন, ঠিক ততটা দোষী সে নয়।

বিজেশ নীরবে এসে একখানা চেয়ারে বসলেন এবং নীরবেই এদের অফিসিয়েল কলহ শুনছিলেন। রবিকে তাঁর ভালো লাগতো, তু'জনের মধ্যে পরিতোষের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল। তথাপি, ওদের

চাকরী ও অফিস সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয় বলেই জানতেন বিজেশ বোস।

কিন্তু তিনি তা জানলে কি হবে? তাঁকে দেখেই পরিতোষের ক্রোধ যেন বোমার মতো ফেটে পড়লো। রবিকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল শুরু করলেন।

বিজেশ আর বাধা না দিয়ে পারলেন না। তবুও যথাসম্ভব শান্ত স্বরেই বললেন: দেখুন দারোগাবাবু, কিছু মনে করবেন না। আপনার অফিসের কাজে কোথায় রবিবাবুর ত্রুটি হয়েছে, অফিস মাস্টার হিসেবে অবশ্যই তা বলবেন আপনি, প্রয়োজন হলে তাঁকে ধমক দেবেন, এমন কি, দরকার হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্র করবেন। কিন্তু অফিসের ব্যাপারে কারুর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কটাক্ষপাত করাটা বোধহয় শোভন ও সঙ্গত নয়—

That's not your look out!—ধমক দিয়ে উঠলেন পরিতোষ: আমার সিপাইকে যা খুশী তাই বলবো আমি, তাতে আপনার কি?

কিছুই না, বিজেশ তবু ধৈর্য্য হারালেন না: শুধু এইটুকু যে, ব্যক্তিগত গালাগালিটা শুনতে ভালো লাগে না আর শুনে মনে হতে পারে যে, আপনার হয়তো কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে রবিবাবুর ওপর, সুযোগ পেয়ে এক হাত দেখে নিচ্ছেন।

পরিতোষ জ্বলে উঠলো: যদি নিয়েই থাকি, তাতে আপনার কি?

কিছুই না, তখনো ধৈর্য্য হারাননি বিজেশ: তবে ভদ্রলোক ভদ্রলোককে এক-হাত দেখে নিতে গেলেও ভদ্র ভাষাতেই নিয়ে থাকেন বলে জানি। সদর রাস্তা একটু দূরে হলেও ঐ দেখুন, দু'একজন লোক আপনার পাড়া-মাথায়-করা চীৎকার শুনে দাঁড়িয়ে গেছে। কিশোরীবাবুর চেগারের ওপাশে বাড়ীর মেয়েরা চোখ পেতে দেখছেন কিনা কে জানে।

নিন, নিন, আর শাস্ত্রবাক্য শোনাতে হবে না, কড়া জবাব দিলেন পরিতোষ: আপনার মতো ডেটিনিউ বহুৎ দেখা হ্যায়—

তব্ ইস দফে একঠো নয়া চীজ দেখলেওগে, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বিজেশ বোস: আপনি যদি আমার মতো অনেক ডেটিনিউ দেখে থাকেন, তাহলে আমিও আপনার মতো অফিসার-ইন্-চার্জ্জ অনেক দেখেছি।

কি, আমার থানায় এসে আমাকেই insult! পরিতোষ এবার বিজেশকেই

হুকুম করে বসলেন : বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি, নইলে—নইলে I will arrest you—

Arrest-এর কি ভয় দেখাচ্ছেন, বিজেশ এবার উঠে দাঁড়ালেন : Arrest হয়েই তো আছি। আর থানা কি আপনার বাবার সম্পত্তি যে, এখানে আসা না-আসা আপনার খুশীর ওপর নির্ভর করবে ?

Shut up ! চীৎকার করে উঠলেন পরিতোষ : শালা ডেটিনিউয়ের নিকুচি করি !—দরওয়াজা, লাঠি মারকে নিকাল দেও এ বদমাশকো—

আর কিছু বলতে হলো না। মুহূর্ত্তে বিজেশ স্যাণ্ডেল হাতে নিয়ে পরিতোষের গালে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন : ডেটিনিউয়ের নিকুচি করেছিস, এবার ছ্যাখ্, দারোগার নিকুচি কিভাবে করতে হয়—

আরো স্যাণ্ডেল চালাতে যাচ্ছিলেন বিজেশ, ঐ রবিই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে : কি করেন বিজেশবাবু, কি করেন—চলুন, চলুন, বাসায় চলুন—

টেনে নিয়ে যাবার সময় বিজেশ হাতের স্যাণ্ডেলটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে গেলেন : কুকুরকে প্রহার করা স্যাণ্ডেল পায়ে দিতেও ঘৃণা করি। নে, ওখানা মেডেলের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখিস্।

ব্যস্, বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। দূরে রাস্তায় আরও লোক জমে গেল, কিশোরী ঘোষের চেগারের ওপারে রীতিমতো গুঞ্জন শোনা যেতে লাগলো, জানালা-পথে ভীতা, সন্ত্রস্তা পরিতোষিণীকে দেখা গেল আর খানসামা থানার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ অফিসার-ইন্-চার্জ্জ মিস্টার পরিতোষ দে স্যাণ্ডেলের আঘাতে যেন একেবারে চুপসে বসে রইলেন ঘাড় গুঁজে ফুটো-হয়ে-যাওয়া বেলুনের মতো।

একটু পরই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন : দরওয়াজা, হামারা ডায়েরী কিতাব !

তার ক'দিন পরই ঠাকুরগাঁয়ে মহকুমা হাকিমের এজলাসে মামলা শুরু হয়ে গেল। বাদী পরিতোষ আর বিবাদী বিজেশ বোস। অভিযোগ, বাদীকে স্যাণ্ডেল দ্বারা প্রহার ও সরকারী কার্য্য সম্পাদনে বাধা দান।

স্যাণ্ডেল প্রহার ! ঠাকুরগাঁয়ে মোক্তারদের মধ্যে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়ে গেল। লাঠি প্রহার, লোহার রড প্রহার বা ছুরি চালানো, রাজবন্দীদের

সম্পর্কে এমনি ধরনের প্রহার বা আঘাতের কথাই শোনা যায়। স্যাণ্ডেল প্রহার এবং তার জন্য ঘটা করে প্রকাশ্য আদালতে মামলা, এ কোনোদিন শোনা যায়নি। গণ্ডগ্রামের থানা, তবুও সেখানে কয়েকজন সিপাই আছে, গোটা-কয়েক বন্দুকও আছে। স্যাণ্ডেলের বদলে সিপাইদের দিয়ে ধোলাই দিল না কেন দারোগা? কে আর টের পেত? গণ্ডগ্রামে রাজবন্দী প্রহারের কাহিনী কোনোদিন এই শহরে আসতো কি? আর তেমনি সাহস যদি না থাকে, তাহলে স্যাণ্ডেল প্রহারটা স্রেফ হজম করে ফেললেই হতো। কে আর দেখতে যেত সেই গণ্ডগ্রামে. কে আর রটাতে যেত স্যাণ্ডেল প্রহারের কাহিনী? মার খেয়ে তো একদফা অপমান হয়েছেই, আবার সেই লজ্জাকর ঘটনা আদালতে টেনে এনে আর-একদফা কেলেঙ্কারী!…

মামলা চালাতে গিয়ে কোর্ট ইনসপেক্টারও মনে মনে হাসছিলেন।

যথারীতি চার্জ্জ গঠন করা হলো। বিজেশ বোসের দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় মোক্তার থাকাতেও বিজেশ তাঁকে দাঁড়াতে দিতে সম্মত হননি। আদালতে তিনি শুধু নীরব দর্শক।

বিজেশ বোস আদালতকে জানালেন যে, পরিতোষকে তিনি জেরা করতে চান।

পরিতোষ কাঠগড়ায় উঠলেন।

দেখুন পরিতোষবাবু, আপনি বলেছেন যে, আমি স্যাণ্ডেল দিয়ে আপনাকে প্রহার করেছি এবং ঐ স্যাণ্ডেলখানা তাই একজিবিট করেছেন। কিন্তু স্যাণ্ডেলখানা পেলেন কোথায়? আমার বাসা সার্চ্চ করে কি?

না। ওখানা আপনি থানাতেই ফেলে এসেছিলেন।

কি বলে ফেলে এসেছিলাম? জিজ্ঞেস করলেন বিজেশ।

পরিতোষ স্পষ্ট জবাব দিলেন: কিছুই বলেননি।

বিজেশ বললেন: হ্যাঁ, ওটা আপনাকে উপহার দিয়ে এসেছিলাম।—আচ্ছা পরিতোষবাবু, আবার শুরু হলো জেরা: আপনি বলেছেন যে ঐ স্যাণ্ডেল দ্বারা আপনাকে প্রহার করেছিলাম, কোন্ অঙ্গে প্রহার করেছিলাম?

গালে।

কোন্ গালে?

বাঁ গালে।

বাঃ, বেশ পরিষ্কার মনে আছে আপনার, বিজেশ বললেন। তারপর প্রশ্ন করলেন : রাস্তায় তখন লোকজন জড়ো হয়েছিল কি ?

হ্যাঁ।

থানার সিপাইরা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল কি ?

হ্যাঁ।

আমি কি আপনাকে আরও কয়েক ঘা মারতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনার এল সি রবি মুখার্জ্জী এসে আমায় বাধা দেয় ?

হ্যাঁ।

তাহলে আপনি বলতে চান পরিতোষবাবু যে, বিজেশ বোস পাশ-করা মোক্তারী ঢংয়েই বলতে লাগলেন : রাস্তার লোকজন ও থানার সিপাই সবার সমক্ষেই আমি ঐ স্যাণ্ডেল দিয়ে আপনার গালে প্রহার করেছি ?

হ্যাঁ।

ঠিক ক'ঘা মেরেছিলাম পরিতোষবাবু ?

তিন ঘা।

থ্যাঙ্ক ইউ ! সবই তো বেশ মনে আছে আপনার, বিজেশ হেসে বললেন : মার খাবার সময় আঘাতগুলি গুনে রাখবার কথাটিও ভোলেননি দেখছি। কিন্তু পরিতোষবাবু, স্যাণ্ডেলের মারগুলোতে আপনার ব্যথা লেগেছিল কি ?

জেরা করবার ধরন ও জেরাগুলি যে আদালত কক্ষে উপস্থিত সকলের বেশ কৌতুক উৎপাদন করছিল ও সবাই বেশ উপভোগ করছিলেন, এতক্ষণে টের পেলেন পরিতোষ। তাই প্রথমটা এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না। ইতস্ততঃ করতে দেখে বিজেশ বলে উঠলেন : না, না, লজ্জা কি, পরিতোষবাবু। স্যাণ্ডেলের মার খেয়ে যখন আদালতেই আসতে পেরেছেন, তখন ব্যথা লাগার কথাটা বলতে আর সঙ্কোচ কেন ? আর আদালত যখন আমার প্রশ্নটা নাকচ করেননি, তখন এর জবাব যে আপনাকে দিতেই হবে। ব্যথা লেগেছিল কি ?

গোমরা মুখ করে পরিতোষ জবাব দিলেন : হ্যাঁ।

আহা-হা, ভারী দুঃখের কথা, মহাদুঃখ প্রকাশ করে বললেন বিজেশ : কিন্তু স্যাণ্ডেলখানা দেখছি পুরোনো, মাঝে মাঝে কাঁটা উঠে রয়েছে। আপনার গালে স্যাণ্ডেলের কাঁটা বিঁধে রক্তপাত হয়নি পরিতোষবাবু ?

না।

কি করেই বা হবে, বিজেশ মন্তব্য করলেন : আপনার গালে তো আর মাংস নেই, কাঁটাগুলো বিঁধবে কিসে? তোবড়ানো গালে আছে শুধু চোয়াল, সেই চোয়ালের হাড়ে প্রতিহত হয়ে স্যাণ্ডেল ফিরে এসেছে। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন বিজেশ বোস : কিন্তু মারবার কারণটা কি ছিল পরিতোষবাবু?

কোনো কারণ ছিল না। স্পষ্ট জবাব দিলেন তিনি।

বাসা থেকে বেরিয়ে এসে সোজা থানার বারান্দায় উঠে স্যাণ্ডেল দিয়ে মারলাম আপনাকে? প্রশ্ন করলেন বিজেশ : একেবারে বিনা কারণে বিনা প্রভোকেশনে!

হ্যাঁ।

কোনো কথাই বলিনি? কোনো গালাগাল দিইনি?

বলেছেন, দারোগার নিকুচি করি।

আদালত কক্ষে এবার হাসির মৃদু আওয়াজ শোনা গেল। হাকিম বললেন যে, স্যাণ্ডেল প্রহারটাই চার্জ্জ, গালাগাল করাটা চার্জ্জে নেই।

বিজেশ তৎক্ষণাৎ বললেন হাকিমকে : আমি স্বীকার করছি এই অকর্ম্মণ্য, চরিত্রহীন, মিথ্যেবাদী দারোগা পরিতোষ দে-কে আমি ঐ স্যাণ্ডেল দিয়ে বেশ কয়েক ঘা মেরেছি এবং রবি এসে বাধা না দিলে মেরে ওকে ফ্ল্যাট করে দিতাম।

Pleads guilty—সুতরাং খচ খচ করে হাকিমের কলম চললো, দু' শো টাকা জরিমানা অনাদায়ে দু'মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

বিজেশ বললেন : তিন ঘা-র দাম যদি দু'শো টাকা হয়, তাহলে না হয় আরও তিন ঘা মারতাম। কিন্তু ওর মতো চামচিকেকে মেরে টাকা নষ্ট করতে চাই না, আমি দু'মাসের জন্য জেলেই যেতে চাই।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিজেশ বোসের আর জেলে গিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করা হয়ে ওঠেনি। সেই আত্মীয় মোক্তার বিজেশকে জিজ্ঞেস না করেই জরিমানার টাকাটি জমা দিয়ে দেন। বিজেশকে স্থানান্তরিত করা হয় রংপুর জেলার কোনও থানায় অন্তরীণরূপে।

আর বিজেশ বোসের সেই শূন্যস্থান আমি এসে পূরণ করেছি।

একুশ

মেয়েদের সঙ্গে আমার দেখা হয় ওদের বাড়ীতেই দিনের বেলায় সবার সামনে। ওখানেই একটু একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুটো কাজের কথা বলে দিই ও শুনে আসি। মাইল দুয়েক দূরে বাশুলী কাছারির নায়েব হচ্ছেন জ্যোতিষ সেন, চাঁদপুর কাছারির উমাচরণের পুত্র। কোনো কোনো সময় সেখানেও যায় বীণা বা রেণু আর আমিও গিয়ে হাজির হই অন্যপথে।

একদিন বিলু বললো সে তার বোন খুকুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু আমি ততটা উৎসাহ দেখালাম না, বরং এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে অন্য কথা পাড়লাম। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ও তাদের পরিবারের সবার সঙ্গেই খানিকটা অন্তরঙ্গতাও স্থাপিত হয়েছে। অন্য মেয়েরা কাজও শুরু করেছে। প্রথম দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল, এখন তা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে বলা যায়। তারা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করে এবং সারা দুনিয়ার সংবাদ নিয়ে সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে আলোচনা করে।

কিন্তু বিলুর বোন শিশিরকণার সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। প্রথমতঃ, আজও চাটার্জ্জী বাড়ীতে যাইনি আমি। বিশ্বেশ্বরবাবু এই পরিবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও এবং ও বাড়ীর দু' একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেও চাটার্জ্জীদের বাড়ীতে যাবার কোনো প্রস্তাব আজও করেননি। করেননি বলেই আমার দিক থেকে প্রস্তাব করা বা আগ্রহ দেখানো যুক্তিযুক্ত হবে না বলেই আমিও চুপ করে রয়েছি। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বেশ্বরবাবুকে বাদ দিয়ে বিলুর সঙ্গেই ও বাড়ীতে গেলে তিনি কিছু মনে করতে পারেন। আর সেটা ভালো দেখাবে না। তৃতীয়তঃ, বোনের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে বিলুর বাবা-মায়ের সঙ্গেই পরিচয় হওয়া দরকার। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হলে স্বাভাবিকভাবেই শিশিরকণার সঙ্গেও পরিচয় হয়ে যাবে।

তবু বিলু মাঝে মাঝেই তাগাদা দেওয়াতে একদিন বলে দিলাম: আচ্ছা, সে হবে একদিন। সেজন্য ব্যস্ত হয়ো না। তোমার বোনের জন্য আমার চিন্তা নেই, তুমি অন্য মেয়েদের দিকে ভালো করে নজর দাও তো!

পরে একদিন বিশ্বেশ্বরবাবুকে বললাম: বিলু আমায় তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি যাইনি।

তিনি বললেন: গেলেই পারতেন।

বললাম: আপনাকে বাদ দিয়ে যাওয়া—

আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাবো। বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: বিলুর ছোট একটি বোন আছে, নাম শিশিরকণা। সে তাদের বৈঠকখানাতেই একটি ছোট মেয়েদের স্কুল জমিয়ে ফেলেছে। She is an accomplished girl. চেহারা সুন্দর নয় সত্যি, কিন্তু other qualities-এ একেবারে অতুলনীয়।

প্রশ্ন করলাম: আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

জবাব দিলেন তিনি: সামান্য। আগে ওদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম। বৈঠকখানায় দেখা হতো মাঝে মাঝে। আরও একটি মেয়ে মাঝে মাঝে আসে ওদের বাড়ীতে। ওদের বড়দির মেয়ে। ভালো নাম জানি না, ডাকনাম টুকু। বড়লোকের কন্যা। ভারী সুন্দর দেখতে আর তেমনি আলাপে-সালাপে অত্যন্ত ভদ্র ও সপ্রতিভ। তার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। An examplary family, ওদের বাবা তারকেশ্বরবাবু শুধু এই গ্রামেই নয়, আশেপাশে বোধহয় দশখানা গ্রামের মধ্যে the single person who is revered by all alike. শুধু গ্রাম বা পাড়া নয়, পারিবারিক ব্যাপারেও প্রত্যেকটি লোক এঁর পরামর্শ নিয়ে যান। আরও মজা হচ্ছে এই যে, তাঁকে কোথাও যেতে হয় না, সবাই আসে তাঁর কাছে। A god-like gentleman……

বললাম: ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন।

তখন আবেগ এসে গেছে বিশ্বেশ্বরবাবুর: আর ওদের ভাইগুলো দাদা ও ভাই নয়—একেবারে যেন বন্ধু। দাদা-ভাইয়ের সম্মানজনক ব্যবধান নেই, মনে হয় সবাই সমবয়সী, সহপাঠী। বলেছি তো, ওদের পরিবার গ্রামের নেতৃত্ব পেয়েছে automatically……

তারপর একদিন সকালবেলা যাওয়া গেল বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে চাটার্জ্জীদের বাড়ীতে। সেদিন রবিবার। মেজভাই প্রমোদবাবু সোনাহার থেকে এসে গেছেন আর বীরগঞ্জ থেকে এসে গেছেন সেজভাই নীরদবাবু। বৈঠকখানায় আসর জমিয়ে বসা গেল। নীরদবাবুর কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি না হলেও গাইবার ঢংটি ভালো। সঙ্গীতচর্চ্চা রাজবন্দী কোয়ার্টারে আমরাও যে না করি, তা নয়।

বিশ্বেশ্বরবাবুর বেশ দামী হারমোনিয়াম আছে একটি। তবলাও। হারমোনিয়াম আমি নিলে বিশ্বেশ্বরবাবু তবলা টেনে নেন। কিন্তু তিনি যখন গান ধরেন, তখন তবলা পড়ে পড়ে কাঁদে। আমি চড় মারতে জানি, কিন্তু চাঁটি মারতে জানিনে।

পর পর গান গেয়ে চললেন নীরদবাবু, বিলু এবং যতদূর মনে পড়ে, প্রমোদবাবুও। বড়দা'কেও ভাইয়েরা সবাই ধরে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের দক্ষিণ অঙ্গ অবশ না হলেও তাতে কম জোর। ভাইদের পীড়নে বাধ্য হয়ে তাঁকেও গাইতে হলো······দেহি দেবী দরশন ওমা তারা······

অকস্মাৎ হাঁক দিলেন নীরদবাবু: ও মেজবৌদি, waterfood কী হলো? আরে Ram's shop থেকে কিছু juice ball নিয়ে এসো না! এদিকে গলা যে একেবারে wood হয়ে গেল!

Waterfood! Juice ball!! Wood!!!—এ আবার কী নীরদবাবু?

ব্যাখ্যা শোনা গেল। Waterfood হচ্ছে জলখাবার, juice ball মানে রসগোল্লা আর wood মানে কাঠ, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল! আর Ram's shop হচ্ছে রঘুর দোকান।

বাঃ চমৎকার ভাষা তো! শুনলাম, নীরদবাবুর এটা মৌলিক আবিষ্কার! a patent!

একটু পর চা ও খাবার নিয়ে এলেন একটি অবিবাহিতা পরমা সুন্দরী মেয়ে। সত্যিই অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। অত্যন্ত গৌরবর্ণা, তন্বী, মাথার চুল যেমন কালো মিশমিশে, তেমনি তা ঘন ও তাতে সুশৃঙ্খল তরঙ্গ। টানা টানা চোখ, পক্ষ্মগুলি ঘন ও খুব কালো। বোধহয় চোখের পাতায়, ভ্রূযুগলে, গালে ও ঠোঁটে প্রয়োজন না থাকলেও একটুখানি রিটাচ্ করা হয়েছে। কিন্তু রূপ তাতে হয়ে উঠেছে অপরূপ বসরাই গুলাবের মতো! নিশ্চয়ই এই সেই টুকু, বিলুর বড়দিদির মেয়ে। বড়লোকের কন্যা।

কিন্তু তারকবাবু কোথায়? জানা গেল তিনি বাড়ীতেই আছেন কিন্তু ছেলেদের গানের আসরে কমলবনে মত্তকরীর মতো প্রবেশ করে যুবকদের অসুবিধে সৃষ্টি করতে চান না তিনি। অত্যন্ত সচেতন তিনি এসব বিষয়ে। ছেলেদের কাজে উৎসাহ তাঁর প্রবল, কিন্তু সম্মানজনক ব্যবধান নিজেই রক্ষা করে চলেন। ছেলেদের বিব্রত করতে চান না কখনো।

তারপর অবশ্য একদিন তাঁর সঙ্গেও পরিচয় ও আলাপ হলো।

এর প্রত্যেকটি সংবাদ শুধু সবিস্তারে নয়, ডালপালা সহযোগে এসে পরিতোষের কানে উঠলো এবং কানের মধ্য দিয়ে তা মর্ম্মে গিয়ে আঘাত হানলো। দালাল পরিতোষিণী তাতে প্ররোচনা দিলেন। ফলে, প্রতি সপ্তাহেই আমাদের দু'জনের বিরুদ্ধে দিনাজপুর আই বি অফিসে যেতে লাগলো কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট।......

গ্রামে দারোগার অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকবার জন্য সাধারণভাবে নিরীহ গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। লাট্টু বিশ্বাস এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তারপরই তাঁকে সাহায্য করলেন মহেন্দ্র মিত্র, প্রভাত চৌধুরী, নলিনী ঘোষ, মাকু বিশ্বাস, ভবেন সান্যাল, রামলাল গুহ, অপূর্ব্ব সান্যাল ও ৬'চার জন মাড়োয়ারী। বিশেষ করে নারীঘটিত নিন্দাবাদ প্রচারে গণ্ডগ্রামের অধিবাসীরা স্বভাবতঃই উৎসাহ বোধ করে থাকে। কাজেই এই সব নেতার পশ্চাতে এসে যোগ দিল সুনীতি ও সুরুচির ধ্বজাধারী কিছু পানওয়ালা, মুদী ও হাড়ীপাড়ার হাড়ীরা এবং এই দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন লাট্টু বিশ্বাসের বিধবা মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা সীতা বিশ্বাস বিগত যুগের দেবী চৌধুরাণীব মতো!

বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি প্রাণভরে হাসলাম এদের কাণ্ড দেখে। অভিভাবকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে এরা গোপনে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো যে, রাজবন্দীরা সাধারণতঃ চোর হয়, আর হয় বদমাশ। আপনার এত বড় আইবুড়ো মেয়ে......ইত্যাদি।

অভিভাবকেরা এতে ঘাবড়ে না গেলেও আমরা একটু সতর্ক হলাম। আমাদের শয়নঘরের পেছনে প্রাঙ্গণের বেড়ার খানকয়েক বাঁশ পাতলা করে চেঁছে দিলাম। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না ও ক'খানার কোনো গাঁট নেই, পাত্লা, নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলা যায়। ওর বাইরে সামান্য ঝোপঝাপ, বেরিয়ে এলে কারুর টের পাবার আশঙ্কা নেই।

গভীর রাত্রে সিপাইদের ঘরের আলো যখন নিবে যায়, থানার বারান্দায় কমানো লণ্ঠন প্রদীপের মতো মিটমিট করতে থাকে, দরওয়াজা সিপাই বারান্দার টেবিলে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে পাহারা দেওয়া শুরু করে, সমগ্র গ্রাম সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলে পড়ে, তখন বেরিয়ে আসি আমি গুপ্তপথে। পোহাতুর বাড়ীর পাশে অন্ধকারে আমগাছটার নীচে বিলু অপেক্ষা করে। তাকে সঙ্গে

নিয়ে যাই মেয়েদের বাড়ী। ফিরে আসি আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠবার পূর্ব্বেই।

এমনিভাবে কাজ চলতে লাগলো। আর পরিতোষও নিয়মিতভাবে রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন দিনাজপুর আই বি-র কর্ত্তা বাণেশ্বর বর্ম্মণের শ্রীপাদপদ্মে। দোকানদার কালুবাবুর দিদিমার কী নাম মনে নেই, কিন্তু সবাই তাঁকে ডাকেন ভালো-মা বলে। সারা গাঁয়েরই ভালো-মা তিনি। বিলুর মার সঙ্গে এঁর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। হ্যাঁ, সত্যিকার বন্ধুত্ব যাকে বলে। দু'জন দু'জনকে 'ভালোবাসা' বলে ডাকেন। শুধু সুদিনেই নয়, শোচনীয়তম দুর্দ্দিনেও এই বর্ষিয়সী বিধবা মহিলাকে চাটার্জ্জী পরিবারের পাশে পাশে দেখেছি। শিক্ষা অত্যন্ত কম, কথায় বর্দ্ধমানসুলভ নমনীয়তার টান অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সারা গ্রামের নিন্দুকদের ধারালো মন্তব্যের কাছে তিনি দাঁড়াতে না পারলেও কোথাও, কারুর কাছে, কারুর মুখে তাঁর 'ভালোবাসা'র নিন্দামূলক একটি বর্ণও সইতে পারতেন না তিনি। যুক্তি থাক বা না থাক, প্রতিবাদ তিনি করবেনই এবং তাতেও কাজ না হলে অবশেষে কটূক্তি করে বেগে প্রস্থান করবেন।

দিনের মধ্যে হাজারো বার এসে 'ভালোবাসা'কে জানিয়ে যান বিরোধী দলের খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ—কিছু নিজের কানে শোনা, কিছু পরের কাছে শোনা, তারপর তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, যুক্তিহীনভাবে সে সম্বন্ধে মন্তব্য, কোথায় সাবধানতার অবকাশ আছে, কোথায় শত্রুপক্ষ দুর্ব্বলতার আভাস পেয়ে গেছে, কোথা দিয়ে কীভাবে আঘাত হানলে বিরোধী দল সায়েস্তা হতে পারে, অনর্গল বর্দ্ধমানী ভাষায় তা বিবৃত করে ক্লান্ত হয়ে আবার অকস্মাৎ ফিরে যান ভালো-মা তাঁর বাড়ীতে মাছের টক্ চড়িয়ে এসেছেন জানিয়ে।

ভালো-মাই একদিন জানিয়ে গেলেন যে, বিলুদের বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সীতা দেবীর বাড়ীর সান্ধ্য-বৈঠক বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। বিলুর মুখেও আমি সব শুনতে পেলাম। নিন্দাকে কোনোদিনই পরোয়া করিনি আমি। কিন্তু বিদেশে আমারই জন্য কোনো নিষ্কলঙ্ক পরিবার, বিশেষ করে, এখানকার চাটার্জ্জী ব্রাদার্স মিথ্যে নিন্দের পশরা মাথায় করুক, এ কথাটাও নিজেরই কানে কেমন বেসুরো ঠেকতে লাগলো। কিন্তু বিলুর উৎসাহ দেখলাম অফুরন্ত। কাজের নেশায় সে তখন পাগল হয়ে উঠেছে। একটা কিছু সে করবেই মেয়েদের দিয়ে, এই তার অন্তরের কামনা। বিশ্বেশ্বরবাবুও দেখলাম এই সব

কুকুরের ঘেউ ঘেউ থোড়াই কেয়ার করেন। কাজেকাজেই একদিকে যেমন নিন্দের বিষ ছড়াতে লাগলো পচা ঘায়ের মতো, তেমনি অপর দিকে আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেলাম।......

অকস্মাৎ একদিন সকালবেলায় ভৃত্যের অভাবে যথাসময়ে চা ও খাবার না পেয়ে বিশ্বেশ্বরবাবু হাই তুলে মন্তব্য করলেন: দূর মশাই, চাকর ছাড়া আর পারা যায় না। কাঁহাতক এমনি রঘুর দোকানে চা ও খাবার খেতে যাওয়া যায় বলুন তো! কোথায় খাবো নিদ্রালু চোখে বেড টি, তা নয়। এ একেবারে ব্যাড টি, ভেরী ব্যাড!

সায় দিলাম: যা বলেছেন।

টিপ্পনী কাটলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: আপনার আর কি, রান্না করতে হয় না—রান্না জানেনও না। স্বদেশী করে বেড়ান আর তৈরী ভাত খান। বাবুর্চি তো আমিই।

বাধা দিলাম: বাঃ, বেশ তো নিন্দে করছেন। আপনি রাঁধেন বটে, কিন্তু জোগানদারের কাজ করে কে? আপনি রাঁধুনী হলে আমি তো চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করি। সে কি কম হলো?

না, না, অনেকখানি। আপনার সাহায্যের তুলনা হয় না।

কিন্তু কথাটা মিথ্যে বলেননি বিশ্বেশ্বরবাবু। এখানে এসে ভৃত্য ও রাঁধুনী কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড হিসেবে আমরা বাচ্চা বর্ম্মণ নামে একজনকে পেয়েছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই একটু বাড়ীতে ঘুরে আসার নাম করে যদি সে একবার ছুটি পায়, ব্যস, তাহলে একদিনের স্থানে পাঁচ দিন সে করবেই। এমনিভাবে মাসের অর্দ্ধেক দিনই বাচ্চা অনুপস্থিত থাকে, ফলে বিশ্বেশ্বরবাবু কোমর বেঁধে নেমে পড়েন বাবুর্চির ভূমিকায় আর আমি জোগানদারের। তবে মাঝে মাঝে আর উৎসাহ থাকে না, রঘুর মিষ্টির দোকানেই গিয়ে চা খেয়ে আসি এবং দু'বেলাই ওখানে লুচি আর আলুর দম খাই। পরিতোষকে বলে লাভ নেই। চাকর বিহনে আমাদের কষ্ট হচ্ছে জানতে পারলে ও ব্যাটা মনে মনে হাসবে। রবি মুখার্জ্জীকে বলেছি, বিলুকে বলেছি, গ্রামের আরও ক'জনকে অনুরোধ জানিয়েছি, কিন্তু চাকর পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

খানিকক্ষণ নীরবেই ছিলাম দু'জন, অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বরবাবু গম্ভীর হয়ে যেন

মহাদুঃখে মন্তব্য করলেন : একটা বিয়ে যদি করতেন মশাই, তাহলে মিসেসকে আনা যেত ও রোজ মনের সাধে বাছা বাছা খাদ্য খাওয়া যেত। ছোটাহাজরী, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার—

বাধা দিলাম : বিয়ে ?

হ্যাঁ, বিয়ে, বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু : দুনিয়ার লোক বিয়ে করছে, আপনি করবেন না কেন ? আজ যদি বৌদি—না, না, বৌমা এখানে থাকতেন, তাহলে কি আর এমনি ঐ বাচ্চার পায়ে তেল মেখে মরি ? ঘাড় ধরে কবে দিতাম ওকে বিদায় করে। তারপর কয়লা ভাঙতেন আপনি আর মসলা বাটতাম আমি।

খুব হাসাহাসি করলাম দু'জনে। একটু পর বললাম : তা বিয়েটা করবার দায়িত্ব আপনিই নিন না। কেউ তো আর মাথার দিব্যি দিয়ে রাখেনি। একবার মুখ ফুটলেই তো হয়।

বিশ্বেশ্বরবাবু তথাপি এড়াতে চেষ্টা করলেন : তাহলেও আপনার বয়েস আছে। আমার তো ত্রিশ কবে পার হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছি বলা যায়। এর পর আর বিয়ে করা সাজে ?

জবাব দিলাম : না সাজে না। তবে আমারও একদিন ত্রিশ পেরোবে, তখন আমিও বলবো, কী হবে আর বিয়ে করে ! পাকা চুলে টোপর মানাবে না, কি বলেন ?

কি আর বলবেন তিনি ! বিয়ে কোনোদিন করবো, একথা বাবা-মা-আত্মীয়স্বজন অনেক ভেবে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। আমার বেলাতেও যা, বিশ্বেশ্বরবাবুর বেলাতেও তাই। বোধহয় সে যুগের প্রায় সমস্ত বিপ্লবী কর্ম্মির বেলাতেও ঐ একই কথা। বিয়ে যদি আমরা নিজেরা করতে রাজী না হই, তাহলে দুনিয়ায় কারুর ক্ষমতা নেই যে রাজী করান। কিন্তু বিয়ের কথা ভাববার অবসর পেলাম কোথায় ? তারপর গুপ্ত সমিতির ভূগর্ভস্থ আখড়ায় আমাদের যতই কদর থাক্, বরের প্রকাশ্য বাজারে আমাদের মূল্য কতখানি, তাও তো কোনোদিন যাচাই করবার কথা ভাবিনি ! যে সব গুণ থাকলে মূল্যবান বর হতে পারা যায়, তা আমাদের আছে কি ?

বললাম : আপনার শৃগালীয় প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য। বিয়ে করে বৌকে এই রাজবন্দীর কোয়ার্টার্সে আনা যেন খানসামা বাজার থেকে এক পো মুগুর ডাল

কিনে আনা ! অন্ততঃ আপনি তাই বোধহয় মনে করছেন। কনে যেন সেজে বসে আছে, আপনি একবার পিঁড়িতে গিয়ে বসলেই হয়। আর সদাশয় সরকার বৌকে এখানে নিয়ে আসার হুকুম দেবার জন্য যেন কলম উঁচিয়েই রয়েছেন, একবার বিয়েটা হলেই হয়।

তা বটে, বলে খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন বিশ্বেশ্বরবাবু, তারপর একটুক্ষণ কি ভেবে সহসা প্রশ্ন করে বসলেন : ওসব কথা ছেড়ে দিলেও বিয়েটা এখন করলে কেমন হয় ?

অকস্মাৎ কেন এই মতিভ্রম ?—রীতিমতো চার্জ্জ করলাম।

মতিভ্রম কোথায়, সুমতি ! তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন বিশ্বেশ্বরবাবু : বহুকাল বহুলোকের অনুরোধ ও আদেশ অমান্য করেছি, এবার না-হয় নিজেই সম্মতি জানিয়ে ভালমানুষী দেখাই। আপনিও তো এতকাল এড়িয়ে এসেছেন, এবার না-হয় জড়িয়ে পড়বার জন্য গলাটা বাড়িয়েই দিলেন।

তথাস্তু। দিলাম সায় দিয়ে বিশ্বেশ্বরবাবুর মূল্যহীন পলকা প্রস্তাবে। কে আর জানতে যাচ্ছে বা শুনতে পাচ্ছে আমাদের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব ? জিজ্ঞেস করলাম : আপনি রাজী তো ?

যেন দাঁতে চিবিয়ে কুইনাইন খেতে রাজী হলেন বিশ্বেশ্বরবাবু : বেশ, রাজী।

ব্যস, আর যায় কোথা। তখনই প্যাডের দু'খানা কাগজ খচ্ করে ছিঁড়ে নিয়ে বসে পড়লেন তিনি দুটো কলম নিয়ে। বয়ান বলে গেলেন মোটামুটি, লিখলাম। তিনিও লিখলেন। নিয়মানুসারে আমাদের লেখা চিঠি দিতে হয় দারোগার হাতে। দারোগা তা পড়ে পাঠাবেন আবার আই বি অফিসে। সেখানে আর এক দফা পাঠ হয়, মর্ম্মোদ্ধার করা হয়, এবং হিজ মেজেস্টিজ গভর্নমেন্টের আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে পারে, এমনি কিছুর সন্ধান না পেলে তারপর তা বাক্সে ফেলা হয়।

পরিতোষ দু'খানা পত্রই বোধহয় গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেন এবং তার ফলে পরদিন সকালবেলাতেই সীমাহীন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমরা খানসামা গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি লোকের মুখে ঐ কথা শুনে—রাজবন্দীরা বিয়ে করবেন !

অনেক কাল ধরেই বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে আসছি। গ্রামের প্রত্যেকটি মেয়ের অভিভাবক হয় নিজে বা দূত মারফত প্রস্তাব পাঠিয়ে ব্যর্থমনোরথ

হয়েছেন। তখন তো কোনো নিন্দের কথা শুনিনি। আজ আমি নিজেই যখন নেহাত পরিহাস করে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে পত্র দিলাম মাকে ও ফুলদা'কে, তখন কেন এত আলোচনা? কেন এত কথা?......

কিন্তু তার ক'দিন পরেই যে ঘটনাটি ঘটে গেল, বেশ বুঝতে পারলাম আমার মতো কাঠখোট্টার জীবনেও উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে।

সেদিন কি বার মনে নেই, তারিখ আজ আর ঠিক মনে পড়ে না। মনে আছে, সকালবেলা। বিলুদের বাড়ীতে তার বড় জামাইবাবু এসেছেন এবং আশ্চর্য্য, তাঁর নামও দ্বিজেন গাঙ্গুলী। কৌতুহলী হয়ে গেলাম পরিচিত হতে, গল্প করতে। সেই বড়লোকের কন্যা টুকুর পিতা ইনি, সস্ত্রীক এসেছেন। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা, বড়লোকের মতোই মাঝারী সাইজের ভুঁড়ি। কিছুক্ষণ আলাপেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক ভারী সরল মানুষ আর রসিকও বটেন। দু'জনের একই নাম নিয়ে অনেকক্ষণ হাসাহাসি হলো।

এমন সময় বড়দা' যাচ্ছিলেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে। দ্বিজেনবাবু তাঁকে ডাকলেন। বড় শ্যালকের সঙ্গে বেশ হাসিঠাট্টা চলতে লাগলো। আমিও যোগদান করতে কসুর করলাম না। খানিকপর দু'জনে দু'জনকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, তাঁরই ভুঁড়ির পরিধি বড়।

দ্বিজেনবাবু বলে উঠলেন: কি, এত বড় কথা! আমি বড় জামাই, আমার ভুঁড়ি শালার ভুঁড়ির চাইতে ছোট? এত বড় অপমান?—আয় দেখি, তবে মেপে দেখা যাক্।—দ্বিজেন, নাও তো ভাই একগাছা দড়ি।

কিন্তু দড়ি পাবো কোথায় হাতের কাছে? দেরী হলে যদি রাগ কমে যায় ও বড়দা' রণে ভঙ্গ দেন তাই দ্বিজেনবাবু বললেন: তবে নে, তোর পৈতে দিয়েই মাপ দেখি পেট।—না, না, নিজে নয়। দ্বিজেন, নাও তো মাপটা। দেখো, বড়দা' বলে আবার পার্শিয়ালটি করো না যেন।

দ্বিজেনবাবুর ভুঁড়ির পরিধি মাপ হলো তাঁর পৈতে দিয়ে। বললাম: ধরে রাখুন এইখানটা। এবার বড়দা'র ভুঁড়িটা দেখি।—

মাপতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ ফ্রক পরা একটি ফুটফুটে মেয়ে ছুটে এসে আমায় বললো: আপনাকে মা ভেতরে ডাকছেন।

আমাকে!—অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। বিলুদের বাড়ীর ভেতর তো কোনোদিন যাইনি। আর এই মেয়েটিই বা কে? একে তো দেখিনি কোনোদিন।

বললাম : না, না, আমায় ডাকছেন না। তুমি ভুল করছো খুকি !

দ্বিজেনবাবু সংশোধন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন : খুকি নয়, খুকুমণি। আমার ছোট মেয়ে। আর ওর মা আমার সহধর্ম্মিনী আর তোমার এই বড়দা' হচ্ছেন তাঁরই ভ্রাতা, অতএব ইনি আমার কী হলেন ?

সবাই হেসে উঠলাম। আমি হেসে বললাম : আমায় কেউ ডাকছেন না। বোধহয় আপনাকে দ্বিজেনবাবু। একই নাম, গণ্ডগোল হয়ে গেছে বোধহয়।

অ্যাঁ, তাই নাকি ? দেখি তাহলে।—বলে দ্বিজেনবাবু অন্দরে প্রবেশ করলেন এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে বললেন : না হে না, ওঁরা এক নম্বর নয়, দু'নম্বর দ্বিজেনকেই স্মরণ করেছেন। একটু চা খাওয়াবেন।

চা খেতে দেবেন, তা এখানে পাঠালেই তো আরাম করে খাওয়া যেতে পারে ও দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে চলতে পারে সরস কথোপকথন। বললাম : তা এখানে পাঠালেই ভালো হয় নাকি ? যাও তো খুকুমণি, চা এখানেই নিয়ে এসো।—পাঠিয়ে দিলাম খুকুমণিকে।

কিন্তু সেও ফিরে এল। বললো : মা বললেন আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে।

ভারী মুশকিলে পড়া গেল। বিলুকেও তো দেখতে পাচ্ছি না কোনোদিকে। শুনেছিলাম সে বাড়ীতেই আছে, কিন্তু এসময় কোথায়, এখনও দেখা পাচ্ছিনে কেন তার ?···ধীরে সসঙ্কোচে খুকুমণির পশ্চাতে এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে হলো। বড় দু'খানা ঘরের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে একখানা ছোট একচালা ঘরে সে আমায় পৌঁছে দিল। মাটির মেঝে। তার ওপর সুন্দর একখানা কার্পেটের আসন পাতা, সম্মুখে খাবারের প্লেট। আমি আসনে বসতেই খুকুমণি চলে গেল।

ঘরে আর কেউ নেই। মাথা নীচু করে খেতে শুরু করলাম। অচেনা বাড়ী না হলেও বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে আমি তখনো পরিচিত নই। কিন্তু নিঃশব্দে আহারে প্রবৃত্ত হলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, পাতলা চাটাইয়ের বেড়ার ছিদ্রপথে অনেক জোড়া চোখ আমার আহার নিরীক্ষণ করছেন ! তাঁদের ফিসফিসে আলাপের অস্পষ্ট দু'এক টুকরোও যে একেবারে কানে ভেসে আসছিল না তা নয়······

এমন সময় আধঘোমটায় মুখ ঢেকে ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করলেন একটি মহিলা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখেই বুঝে নিলাম ইনিই টুকুর মা, বড়লোকের

গৃহিণী। একটু ইতস্তত: করে উপক্রমণিকা করলেন : যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলি।

তৎক্ষণাৎ বললাম : বলুন না, মনে করবার কি আছে!

আমার ভাই বিলুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা বেশী। সেও বার বার নিষেধ করেছে আমায়। তারপর না পেরে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বাড়ীশুদ্ধ সবাই নিষেধ করছে আমায়।

কেন?

সে কথা শুনে যদি আপনি রাগ করেন?

তৎক্ষণাৎ বললাম : রাগ করবো? এমন কী কথা যে একেবারে রাগ হয়ে যাবে শুনলে?—বলুন না আপনি।

ঘোমটার বহর একটু খাটো করে দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন বিলুর বড়দি : দেখুন, আপনি বিয়ে করবেন শুনলাম। বাড়ীতে নাকি সেই মর্ম্মে চিঠি দিয়েছেন। তা—আমার একটি বোন আছে।—দেখেননি বোধহয় তাকে। তেমন সুন্দরী কিছু নয়। তবে গুণ আছে। আপনি যদি তাকে উদ্ধার করেন। তবে সাহস পাই না, কারণ আমার বোন কালো আর আপনি—

ফর্সা, এই তো?

মৃদু হাস্য করলেন বড়দি, বললেন : কথাটা মিথ্যে বলেননি। তবে আমার বোন এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। আপনাদের বিক্রমপুরের সঙ্গে অবশ্য আমাদের কাজ হয়। আমার মেজো ভাই বিয়ে করেছে আপনাদের কনকসার গ্রামে।—তারপর নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন : এই নিরু, এসো না এখানে। লজ্জা কি, তোমাদের দ্যাশের লোক!—বলে হাসলেন।

মেজোবৌ প্রবেশ করলেন। ইনিও ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী। নিঃশব্দে দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই বড়দি বললেন : এই হচ্ছে প্রমোদের বৌ, আপনাদের কনকসারে বাপের বাড়ী। নাম নিরুপমা।

বললাম : কনকসার আমি চিনি। দু'একবার গেছিও ওখানকার শীল্ড-এ খেলতে। বেশ বড় গ্রাম ও বর্দ্ধিষ্ণু। ওখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রমথ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে।

নিরুপমা বললেন : তিনি সম্পর্কে আমার জ্যেঠামশায় হন।

বড়দি আবার হাসলেন : ব্যস্, এবার পরিচয় বেরিয়ে গেছে। দ্যাশের

মানুষের সংগে স্থানের মানুষের দেখা হয়ে গেল। এবার এক কাজ কর নিরু, একদিন তোমার রান্না খাবার জন্য এঁকে নেমন্তন্ন করে দাও।—উঃ, যা ঝাল খায় বিক্রমপুরের লোকেরা!

কিন্তু কেরোসিন খায় না—জবাব দিলেন নিরুপমা।

বিস্মিত হলাম: কেরোসিন?

বড়দির শত বাধা সত্ত্বেও নিরুপমা বলে দিলেন: জানেন না, রোজ সকাল-বেলা একটুখানি কেরোসিন না খেলে বড়দির মাথা ধরে যায়, কিছুই যেন আর ভালো লাগে না।

বড়দি রীতিমতো ধাওয়া করলেন নিরুপমাকে। কিন্তু হলো না। সাইকেলে একেবারে ঘরের দরজায় এসে হাজির নীরদবাবু। একেবারে কলরব করে উঠলেন: আরে দ্বিজেনবাবু যে! পড়েছেন Big sister-এর পাল্লায়? সঙ্গে দেখছি আবার এসে যোগ দিয়েছেন golden ox. তা gold necklace থেকে মেজদার পুষ্পক রথ এখনো এসে পৌছোয়নি?—বৌদি, আমাকেও দাও তো এমনি একটা ডিস্। আমি এখানেই sit করছি। আমাকেও কিন্তু দ্বিজেনবাবুর মতো দুটো king-enjoy দিতে হবে, আর দুটো bettle water! বলেই নীরদবাবু হাঁক দিলেন: খুকু, ও খুকু, একখানা wood-seat দিয়ে যা তো!

বেড়ার বাইরে ফিসফিসে হাসি শোনা গেল। মনে মনে ট্র্যানস্লেশন করে নিলাম Big sister মানে বড়দি, golden ox মানে কনকসার, gold necklace মানে সোনাহার। কিন্তু king-enjoy কী? Bettle-water-ই বা কাকে বলে?

নীরদবাবু বললেন: রাজভোগ আর পানতোয়া……

তারপর দু'জনে পাশাপাশি বসে চা-জলখাবার খাওয়া ও হাসিঠাট্টা চলতে লাগলো। বড়দি আর কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না।

দুপুরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বড়দির প্রস্তাবের কথাই ভাবছিলাম। প্রথমতঃ, অত্যন্ত রাগ হলো পরিতোষের ওপর। আমাদের ব্যক্তিগত পত্রগুলি তাঁর সেন্সর করবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত সংবাদগুলি গ্রামে প্রচার করবার অধিকার তাঁকে কে দিল? পরিতোষের অপ-প্রচারের ফলেই এঁরা জানতে পেরেছেন। বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি বাড়ীতে বিয়ের সম্মতি জানাবার ব্যাপারে যে খুব সিরিয়াস নই, তা এঁরা কি করে বুঝবেন? হাতের কাছে এঁরা পেয়ে গেছেন মানানসই একটি ছেলে, ব্যস্, প্রস্তাব করে বসেছেন।

কিন্তু প্রস্তাব যার সঙ্গে করেছেন, সে যে বিলুর সেই মাস্টারণী বোন শিশিরকণা। এখানকার মেয়েদের নতুন গড়ে-ওঠা সংগঠনের একজন কর্ম্মি। তাকে বিয়ে করাটা কেমন শোভন মনে হলো না! যদিও তার সঙ্গে আজও সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয়নি, তবুও নিজের হাতে-গড়া সংগঠনের কর্ম্মিকে বিয়ে করাটা যুক্তিযুক্ত কিনা, তা ভালো করে বিবেচনা করা দরকার। কণামাত্র অশালীনতা এতে না থাকলেও আশঙ্কা হলো, এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বিদেশে সেটা আত্মমর্য্যাদা হানিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বেশ্বরবাবুকে সেদিন আর কিছু বললাম না। বিলুকেও কিছু বলবো না স্থির করলাম। বড়দির অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে যাতে পুনরালোচনা না হতে পারে, সেজন্য বিলুদের বাড়ীতে যাওয়া স্থগিত রাখলাম। ভাবলাম, আলোচনা হতে না দিলেই কথাটি কালক্রমে সমাধিস্থ হয়ে যাবে, সবাই ভুলে যাবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এল সি রবি মুখার্জ্জীর ও-বাড়ীতে যাতায়াত ছিল জানতাম। চাটার্জ্জী ভ্রাতাদের সঙ্গে তার সখ্যও ছিল বেশ। শ্রীমান্ নিশ্চয়ই সব শুনেছে।

একদিন রাত্রে আমায় ধরে বসলো: ভাই, বিশ্বাস কর, মেয়েটি ভালো। ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় তো এখানে এসে। কিন্তু ঐ পরিবারের তুলনা হয় না। আমি ওদের মাকে মা বলে ডাকি। আর খুকু মেয়েটি আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সুগৃহিণী হবে। অবশ্য, রূপ যদি চাও তুমি, সে আলাদা কথা—

হেসে বললাম: পুলিশগিরির সঙ্গে সঙ্গে ঘটকগিরিও কর দেখছি। কত দেবে পারিশ্রমিক?

যাঃ, বলে উঠলো সে: ওসব কিছু নয়। ওদের বড়দি আমায় সব বলেছেন। তাঁর আশঙ্কা, তুমি হয়তো ওঁর প্রস্তাব শুনে রাগ করেছ, তাই আর যাও না ওদের ওখানে। ওঁর ভাইরা পর্য্যন্ত ওঁকে খুব বকেছে তোমায় ঐ কথা বলবার জন্য। তাই বড়দি আমায় অনুরোধ জানিয়েছেন, তুমি যেন ওঁর কথা শুনে রাগ না কর।

বললাম: কেন, রাগ করবার কি আছে? যে প্রস্তাব তিনি করেছেন, সেটা তো অসঙ্গত কিছু নয়। অস্বাভাবিকও নয়—

তাহলে রাজী হয়ে যাও, বলে উঠলো রবি। আমি সুসংবাদটা গিয়ে

দিয়ে আসি। ভারী খুশী হবেন ওঁরা। অবশ্য আগেই বলে রাখি ভাই, মেয়েটি কিন্তু সুন্দরী নয়—

বাধা দিলাম : চামড়ার চক্‌চকানি আর ক'দিন রে। আমাদের বিয়ে হবে যাদের সঙ্গে, তারা শুধু বধূ হয়েই আসবে না, তারা হবে আমাদের কাজে সাথিনী—কিন্তু আমার সঙ্গে কেন ওঁরা বিয়ে দিতে চান ? কী আমার ভবিষ্যৎ ? হয় দ্বীপান্তর, নয় ফাঁসি। মেয়েটার জীবনটা নষ্ট হবে না কি ?

সে-ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না—ঠাট্টা করলো রবি।

বললাম : না, না, ঠাট্টা নয়। মেয়েটির বয়সও শুনেছি প্রায় আঠারো, ভালোমন্দ বোঝবার যথেষ্ট ক্ষমতা হয়েছে। তোমাদের মতো শুভানুধ্যায়ীরা একটা ছেলে হাতে পেলেই ধরে-বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে তো চলবে না। তার কি মত তাও জানা চাই এবং সেটাই সবার আগে।

অবশেষে রবি বললো : আচ্ছা বেশ, আমিই জিজ্ঞেস করে আসবো খুকুকে। তুমি কথা দিচ্ছ তো ?

বললাম : কথা দিলে তা আর নড়চড় করি না বলেই সহজে কথা দিইনে আমরা। তুমি সংবাদটি আগে নিয়ে এসো তো। তারপর ভাবা যাবে।

দিন কয়েক পর একদিন বিশ্বেশ্বরবাবুকে সব বললাম। তিনি তো একেবারে হল্লা করে উঠলেন : বলেন কি ! তাহলে দেখুন, পত্রলেখার সুফল হাতে হাতেই ফলতে চলেছে। দেখা যাচ্ছে, আপনার আশঙ্কা সত্য নয়। কনেও সেজে বসে আছে, এমনি মেয়েও পাওয়া যায়। শুধু আপনার পিঁড়িতে গিয়ে বসবার অপেক্ষা।—আর দেরী নয়, দিনক্ষণ স্থির করে ফেলা যাক্।

বললাম : দাঁড়ান মশাই। এ আপনার ব্যাডমিণ্টনের চাপ মারা নয় যে, মেরে দিলাম গায়ের জোরে, তা শটল্ কক জালেই আটকে যাক্ বা ওভার বাউণ্ডারী আউটই হোক। বিয়ে—মানে, দায়ীত্ব—মানে, জীবনভর একটি মেয়ের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ—মানে, দেশের কাজ ছেড়ে দিয়ে পেটের কাজে নামতে হবে—মানে, রান্নাঘর, শাড়ি সায়া সেমিজ, হলুদ নুন লঙ্কা—বাপ্‌স্, ওসব পারা যাবে না।

বিশ্বেশ্বরবাবু হেসে বললেন : প্রথম প্রথম না পারলেও পরে সয়ে যাবে। আর মেয়েটি এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। পাস করে স্কুলে মাস্টারী করবে। এখন করছে এখানে বাড়ীতে, তখন করবে আপনি যেখানে থাকবেন, সেখানে

দু'জনের রোজগারে যেমন হেসে খেলে চলে যাবে, তেমনি কাউকেই আর রান্নাঘর হলুদ লঙ্কা নিয়ে থাকতে হবে না। ওসব করবে চাকর বা বাবুর্চি। বুঝলেন ?

জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তু আপনি তো বেশ ভালো করেই বোঝেন বিশ্বেশ্বর-বাবু যে, আমাদের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার মানেই হচ্ছে একটি মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। বিয়ের পর সোনার সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন যে মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই দেখবে, তার সেই সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে হয়তো আমরা চলে যাবো আন্দামানে বিশ বছরের জন্য কিংবা হয়তো চিরবিদায় নোব ফাঁসির দড়িতে। কী হবে তখন তার ? মাথা নীচু করে ধুঁকতে ধুঁকতে সেই মেয়েকে কি তখন আবার ফিরে আসতে হবে না তার বাপের বাড়ীতে।

তা হবে। স্বীকার করলেন বিশ্বেশ্বরবাবু : কিন্তু চাটার্জ্জী পরিবার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং রাজবন্দীদের জীবন যে কতখানি অনিশ্চিত, তা তাঁরা জানেন। জেনে শুনেই যদি তাঁরা চরম ঝুঁকি নেন, তাতে আপনার আর দ্বিধা কেন ?

এর ক'দিন পরই কি একটা কাজে গ্রামে এলেন ঠাকুরগাঁ মহকুমার হাকিম আমীনুল্লা। পরিতোষ নিশ্চয়ই একান্ত ভৃত্যের মতো রাজবন্দীদের কেচ্ছা তাঁর কানেও তুলেছে। তাই পরদিন সকালেই আমায় ডেকে পাঠালেন তিনি ডাক বাংলোয়। খুব বিরক্ত মন নিয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন হলে কড়া কড়া কথা শোনাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম।

কিন্তু আমীনুল্লা আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলেন : শুনলাম তারকবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা চলছে ? Really a good proposal ! যেমন তারকবাবু, তেমনি তাঁর ছেলে-মেয়েরা। চমৎকার ! এ সংবাদে আমি খুব আনন্দ লাভ করেছি দ্বিজেনবাবু !

বলতে চেষ্টা করলাম : না, এঁরা এখনও প্রস্তাব নিয়ে আমার মা ও দাদাদের কাছে যাননি। আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করছেন।—

তবে সম্মতি দিয়ে ফেলুন।—বলতে লাগলেন আমীনুল্লা : আরে মশাই, একবার ওর স্কুলে গেলাম পরিদর্শন করতে। এতটুকু সব মেয়ে। প্রশ্ন করলাম : বল তো বাংলার প্রধান মন্ত্রী কে ? তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ছোট্ট একটি মেয়ে : জনাব ফজলুল হক। ওদের বইতে তো আর এসব নেই। একেই বলে

শিক্ষকতা। শুধু ফজলুল হক নয়, জনাব ফজলুল হক। অর্থাৎ কিভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখানো হয়েছে। না, না, আপনি মত দিয়ে দিন! She is a prize girl without any doubt···আপনি দেখেছেন মেয়েটিকে? আলাপ হয়েছে?

বললাম: দেখিনি যে একেবারেই, তা বলতে পারিনে। তবে আলাপ হয়নি। কী করে হবে?

হেসে বললেন আমীমুল্লা: ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। আপনাদের মধ্যে মেয়ে দেখাটা বেশ ঘটা করে হয়ে থাকে। তা—আপনি একদিন দেখে নিন, তারপর সম্মতি দিয়ে দিন। ওঁরা প্রস্তাব ও আপনার সম্মতি নিয়ে আপনার অভিভাবকদের কাছে যান। আপনার মা কোথায় আছেন, ঢাকাতে?

না, তিনি এখন আছেন কলকাতায় আমার মেজদা'র ওখানে।

বেলা অনেক হয়েছিল, তাই উঠে পড়লাম। বেরিয়ে আসবার সময় দেখি বারান্দায় অপেক্ষা করছেন স্বয়ং পরিতোষ দারোগা, সাহেবের খাস কামরার বাইরে তক্‌মা-আঁটা বেয়ারার মতো কলিং বেলের অপেক্ষায়। নিশ্চয়ই ব্যাটা সব শুনতে পেয়েছে। সাহেবের কাছে এসেছিল সাপের মতো ফণা তুলে অভিযোগের হলাহল ছড়াতে। আলাপ শুনে এবার একেবারে শামুক বনে গেল। এবার নিজেরই হাত কামড়াবে নিষ্ফল আক্রোশে। বুলডগ চাবুক খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর হয়ে গেছে। এবার চর্ব্বণ করুক্ নিজেরই মড়া হাড়!······

বাইশ

পরিতোষের নিয়মিত কনফিডেন্শিয়াল্ রিপোর্ট যে আদৌ কার্য্যকরী হলো না তা নয়। অকস্মাৎ একদিন শুধু আমার ওপরই এল দিনাজপুরের পুলিশ সুপার এস এন চাটার্জ্জীর আদেশ—চাটার্জ্জী পরিবারের ভাইদের সঙ্গে আমার কথা কওয়া নিষেধ। স্বাক্ষর করে আদেশ-পত্র গ্রহণ করবার সময় পরিতোষের পানের রসে কালো পুরু অধরেও স্পষ্ট বিদ্রূপের হাসির ঝিলিক দেখতে পেলাম! গ্রহণ করলাম বটে, কিন্তু মানা না-মানা তো পুরোপুরি আমারই খুশীর ওপর নির্ভর করে। তাই প্রকাশ্যে ওঁদের সঙ্গে ভাসুর ও ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক স্থাপিত হলেও শুরু হয়ে গেল আমার গোপনতর অভিসার। সিংহদ্বার আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেল বলে খুলে গেল খিড়কির দরজা। রঘুপদর মিঠাইয়ের দোকানে বসে চা পান করতে করতে যখন দেখতে পাই দীননাথ পণ্ডিত তাঁর ঘরের বারান্দা ত্যাগ করে ঘরে ঢুকেছেন কোনো কাজে এবং চাটার্জ্জী বাড়ীর উল্টো দিকের হিন্দুস্থানী দোকানের সম্মুখের বাঁশের মাচা আলোকিত করে ভবেন সান্ন্যাল আর বসে নেই, সুড়ুৎ করে তখন রঘুপদর দোকানের পেছন দিকে চলে যাই। সেদিক দিয়ে বিলুদের বাড়ীতে প্রবেশের একটি ক্ষুদ্র দরজা আছে। নিঃশব্দে প্রবেশ করি এবং অন্দরমহলে বসেই বিলুর সঙ্গে নতুন সংগঠনের আলাপ চালাই। কতখানি হয়েছে, আরও কতটা হতে পারে, এই সব। তারপর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় নিরু আমায় ফোঁটা দিয়ে আমার সঙ্গে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। নতুন ভ্রাতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া বাড়ীর অন্যান্য সব'র সঙ্গেও বেশ সহজ হয়ে গেছি।

পরিতোষ দারোগার দ্বিতীয় আণবিক বোমা এল একেবারে অভিনবরূপে। দিনাজপুর আই বি থেকে দু'জন এল সি অকস্মাৎ একদিন খানসামা থানায় সাময়িকভাবে বদলি হয়ে এল। থানায় আই বি-র লোক? প্রথমটা ভেবেছিলাম হয়তো এই থানার এলাকার মধ্যেই কোনো গ্রামে বোধহয় বিপ্লবী দলের গন্ধ পেয়েছে দিনাজপুরের আই বি, তাই ওয়াচ করবার এই ব্যবস্থা। কিন্তু ক'দিন যেতেই বোঝা গেল, না, তা নয়। তাদের একমাত্র কাজ হলো বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমার পশ্চাতে ফেউয়ের মতো লেগে থাকা। সে যুগে গ্রামে অন্তরীণ কোনো

রাজবন্দীকে এমনিভাবে একেবারে প্রকাশ্যে অনুসরণ করা হতো বলে আমার জানা নেই। আই বি-র লোক, অথচ কোনো লুকোচুরি নেই, কোনো চালাকি নেই, প্রকাশ্য দিবালোকে একেবারে সবার চোখের সম্মুখে, যেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আমাদের পশ্চাতে এরা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

এর ফলে সতর্কতা আমাদের আরও বাড়িয়ে দিতে হলো সত্যি, কিন্তু কাজের উদ্যমে আদৌ ভাটা না পড়ে বরং তা উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠলো বাধা-পাওয়া পার্ব্বত্য ঝরনার মতো।

খানসামা গ্রামের সবাই জেনে গেছে যে, আমাদের পশ্চাতে ফেউ লেগেছে। আমরাও মাঝে মাঝে বন্দরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বেশ মজা করতে লাগলাম। কালুবাবুর দোকানে গিয়ে যখন বসি, ওরা তখন মতিবাবুর কাছারি বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি খায়। কুঞ্জলাল আগরওয়ালার দোকানে যখন যাই ধুতি বা সুজনী বা শার্টের কাপড় কিনতে, ওরা তখন রূপেন বিশ্বাসের সাইকেল সারাই দোকানে সাইকেল সারাই দেখে। আমরা যখন নন-অফিসিয়েল ভিজিটর কিশোরী ঘোষের কাছে যাই, ওরা তখন বন্দরের বারোয়ারী দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে উদ্দেশ্যহীনের মতো পায়চারি করে। সবাই জানে ও ওদের চেনে, তাই ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে মুচকি হাসে, নিভৃতে ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা করে। আমরাও উপভোগ করি।

বিরোধী দল পরিতোষিণী ও সীতা বিশ্বাসের নেতৃত্বে যে নিন্দা ছড়াচ্ছিল, তা এতদিন চলছিল শুধু আমাদের দু'জন রাজবন্দীকে জড়িয়েই। কিন্তু যেদিন বড়দি তাঁর ছোট বোন শিশিরকণার বিয়ের প্রস্তাব করেন এবং ভালো-মা সীমাহীন গর্ব্ব নিয়ে এই সুসংবাদ গৃহে গৃহে পরিবেশন করে আসেন পুজোর শেষে প্রসাদ বিতরণের মতো, সেইদিন থেকেই এই নিন্দুকের দল বিশ্বেশ্বরবাবুকে রেহাই দিয়ে একেবারে আমায় নিয়েই উঠে-পড়ে লেগে গেল। আমি গোপনে বিলুদের বাড়ী যাই, গেলেই ওরা শিশিরকণাকে পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে, শিশিরের সঙ্গে চলে আমার হাসি-তামাশা ঘন্টার পর ঘন্টা—হাহা হিহি, তারপর গান চলে, ক্যারম্ খেলা চলে, আমার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলে···এমনি সব পাণ্ডপাত ছাড়তে লাগলো তারা। এই বিশেষ কাজে গা ঢেলে দিলেন বিশেষ করে বিশ্বাস ও সান্ন্যাল পরিবার। সঙ্গে যোগ দিলেন দীননাথ পণ্ডিত, নলিনী ঘোষ, ক'জন মাড়োয়ারী আর হাড়ী ও পাসুয়া পাড়ার একদল।

এদিকে কলকাতায় আমার মার কাছে বিলুর বাবা সরকারীভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন লাট্টু বিশ্বাসের অন্যতম ভ্রাতা ও স্বয়ং দেবীচৌধুরাণীর অন্যতম পুত্র পটল বিশ্বাস মারফত ! বিশ্বাস বাড়ীর কর্দ্দমে কেমন করে জানি না, ফুটেছিল দু'টি মৃণাল—গোপাল ও পটল। পুরো ব্যবসায়ী হলেও গোপাল বিশ্বাস যেমন ভদ্র, তেমনি বিনয়ী। পিপীলিকার পা থেকে গুড় সংগ্রহ করতে দ্বিধা করতেন না সত্য, কিন্তু বারোয়ারী পুজো বা অন্য কোনো সমবেত কাজে গোপাল বিশ্বাসের দানের অঙ্কটাই সর্ব্বাধিক মোটা হয়ে চাঁদার খাতার শোভা বর্দ্ধন করতো !…আর পটল তো বিলুবই বন্ধু, রাজনৈতিক কাজেও বিলুর সঙ্গেই তার হাতেখড়ি হয়েছে। গুপ্ত সমিতির কাজে যারা আত্মনিয়োগ করে, তারা সবাই যে পুরোপুরি সফল হয়, তা দাবী করছি না। কিন্তু চরিত্র তাদের গড়ে ওঠে বলেই সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাকে তারা পরিহার করে চলে বিষের মতো ! ঐ দৈত্যবংশে প্রহ্লাদের মতোই এরা দু'জন অনেকটা অপাংক্তেয় হয়ে থাকতো।

চিঠিপত্র, শিশিরকণার ছবি ও আমার বক্তব্য নিয়ে পটল যখন কলকাতা রওনা হয়ে গেছে, তখন একদিন এই প্রথম বিলুকে সব খুলে বললাম। বললাম যে, তাব বোন যখন শিক্ষয়িত্রী, বয়স প্রায় আঠারো, তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় আমিই তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিতে চাই। এবং তাই উচিত। নইলে ছেলে পেলেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে হ্যাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার জন্য সব মেয়ের বাপই যে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল, সে সহজ সত্য আমার জানা আছে।

প্রস্তাব পেয়ে তারকবাবু তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন এবং বাড়ীর সবাই তাঁকে সমর্থন জানাতেও দ্বিধা করলেন না।

খুশী মনে বিলু এসে সব জানালো এবং বললো যে, গভীর রাত্রে নদীর চড়ে শীগগিরই আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে। বোনকেও সে বলেছে কিন্তু সে একা আসতে সাহস পাচ্ছে না, তাই শান্তিও আসবে ওর সঙ্গে।

বিস্ময় প্রকাশ করলাম : শান্তি ! তাহলে তো দাসুবাবুর বাড়ীতেও সব জানাজানি হয়ে যাবে।

বিলু বাধা দিল : না, তা হবে না। শান্তি খুকুর বন্ধু আর দাসুদা'দের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা সবাই জানে। তাই শান্তি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতেই রাত্রে থেকে যায়। তেমনি সেদিনও থাকবে।

কিন্তু সে যদি আবার গল্প করে বেড়ায় ?

বেড়াবে না, তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সে : আপনার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে, শান্তি অত্যন্ত রিজার্ভ মেয়ে। পেটে কথা রাখতে খুব ভালো করেই জানে।

তবু সতর্ক করে দিলাম : বিশ্বাস পরিবার যেভাবে বদনাম ছড়াচ্ছে, এর পর যদি আবার এই সাক্ষাতের সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তোমাদের খুব ক্ষতি হতে পারে।

কেউ জানতে পারবে না, বিলুর কণ্ঠে দৃঢ়তার স্পর্শ পেলাম।

তারপর একদিন এল সেই স্মরণীয় রাত্রি। জীবনের সুদুর্গম চলার পথে যাকে সাথিনী করে নেবার প্রস্তাব এসেছে, যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। চকোর-চকোরীর মতো নিভৃতে প্রেম-গুঞ্জন নয়, বিপ্লবী-জীবনের ভয়াবহতা স্পষ্ট করে বলতে হবে। বলতে হবে, বিবাহের মধ্যে যারা রঙীন স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্ন সার্থক করে তোলবার প্রয়াসে যারা সোনার সংসার গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করে, পারিবারিক চারখানা দেয়ালের মধ্যেই জীবনের চরম আনন্দ খুঁজে বেড়ায়, সন্তান-সন্ততির মধ্যেই যারা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে, আমি সে দলের ছেলে নই। সমাজের এই অনুশাসন মেনে নেবার দায়িত্ব আমি স্বীকার করি না। বলতে হবে, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলার ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই আমার নমস্য বটে, কিন্তু আমার কাজ গঠন নয়। আমার একমাত্র কাজ শুধু ভাঙ্গা, শুধু চূর্ণ করে দেয়া। চূর্ণ করে দেওয়া ভিন্ দেশী দস্যুর দম্ভ, চূর্ণ করে দেয়া শতাব্দীর পরাধীনতা, চূর্ণ করে দেয়া বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খল !......

সুতরাং আমার সঙ্গে যার বিবাহ হবে, সে বহন করবে আমার হাতিয়ার, সে হবে আমার সাথিনী, সর্ব্বনাশা পথে এগিয়ে চলবে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। বলতে হবে, এই নির্ম্মমতম সত্য স্বীকার করে নিয়ে এগিয়ে আসার সাহস যে মেয়ের আছে, শুধু তার জন্যই খোলা আছে আমার জীবনের সিংহদ্বার, তারই জন্য মঙ্গল কলস, তাকেই অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ ! নহবতের সুরে অণুরণিত হচ্ছে সেই না-দেখা কনের আগমনী !......

মনে পড়ে, সেদিন আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ আর আত্রাই নদীর বালুচরে ছিল জ্যোৎস্নার প্লাবন। শীর্ণকায় নদী এক ফালি সরু জলের স্রোত জিইয়ে রেখে বিরহিনীর মতো প্রিয়-বর্ষার অপেক্ষায় দিন গুনছে। বালুচরে ইতস্ততঃ কাশবনের গুচ্ছ। তার মাথায় সাদা সাদা ফুল ! ঝিরঝিরে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে

সেই ফুলগুলি। এমনি একটি কাশবনের ঝোপের পাশে বিলু নিয়ে এল শান্তি আর তার বোনকে। বসলাম ও বসতে বললাম ওদের সেই বালির আসনেই।

বিলু বললো: আপনারা কথা কন। আমি ঘুরে আসি।

আমি আপত্তি জানাতেই সে বলে উঠলো: না, না, সেজন্য ভাববেন না আপনি। বরং আমি থাকলে হয়তো আপনার কথার জবাব দিতে ওরা লজ্জা করবে। আমি কাছেই থাকবো, আধঘণ্টা পরই ঘুরে আসছি।

বিলু চলে গেল। রইলাম শান্তি, শিশিরকণা ও আমি আর আকাশে জেগে রইলো অতন্দ্রনয়নে পূর্ণিমার রূপালী চাঁদ!

যা স্থির করেছিলাম, তাই করলাম। ব্যবসায়ীরা যেমন ঐক্যতান বা মুখবন্ধের ধার ধারে না, একবারেই এসে পড়ে আসল কথায়, ঠিক তেমনি আমিও মূল কথাটাই পাড়লাম: নিশ্চয়ই জান, শিশিরকণা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে। তোমাদের দিকের সবাই উৎসুক হয়ে উঠলেও তোমার সঙ্গে কথা না বলে আমার দিক থেকে পাকাপাকি কিছু করা ঠিক হবে না। তাই আমাদের এই সাক্ষাৎ।

শিশিরকণা জবাব দিল মৃদুকণ্ঠে: ছোড়দা'র কাছে শুনেছি কিছু কিছু।

জিজ্ঞেস করলাম: কিছু কিছু কি রকম?

বাড়ীতে কেউ কেউ আলোচনা তোলেন, আবার আমায় আসতে দেখেই চুপ করে যান। বড়দির তো আবার অত ঢাকাঢাকির অভ্যেস নেই, শিশিরকণা লঘু স্বরে বললো: সুযোগ পেলেই তিনি ঢাক পেটাতে চান। তাই কিছু কিছু কানে এসেছে।

বললাম: তোমার বড়দি ভারী সরল মানুষ আর মনে হয় ভারী আমুদে।

শান্তি বাধা দিল: সরল বলেই তো যত ফ্যাসাদ বেধে গেছে। বিয়ের একটা প্রস্তাব করে যখন আপনার দিক থেকে তেমন আপত্তি দেখেননি, ব্যস, আর যায় কোথা, যে বাড়ীতে আসে বেড়াতে, তাকেই বলে দেন বিয়ে প্রায় স্থির। মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে গিয়ে পৌঁছে গেছে পরিতোষিণীর কানে। তিনি তো প্রত্যেক দিন বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলে আসছেন যে, আপনার সঙ্গে খুকুর বেশ দেখাশোনা ও হাসিঠাট্টা হচ্ছে।

বললাম: তা জানি। তবে কি জান শান্তি, ওসব নিন্দা-টিন্দা আমায়

স্পর্শ করে না। অবশ্য এই নিন্দার ফলে ওদের পরিবারের মর্য্যাদাহানি যদি ঘটে, তাহলে আর চুপ করে থাকা যাবে না।

শান্তি জিজ্ঞেস করলো: কি করবেন?

কি যে করবো, তা এখনই বলা কঠিন, জবাব দিলাম: তবে যা করবার তা অবশ্যই করতে হবে। যাকগে, সে কথা।—তারপর শিশিরকণাকে বললাম: রবি মুখার্জ্জীও আমায় ধরেছিল। বোধহয় সেসব কথা সে তোমায়ও বলেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ের যে একটা মারাত্মক ঝুঁকি আছে, জানি না কতখানি তোমায় তা বোঝানো হয়েছে।

শিশিরকণার মৃদু স্বর শুনতে পেলাম: ঝুঁকি আছে জানি।

বললাম: দেখ, বিয়ে কোনোদিন করবো, একথা ভাবতেও পারি না। বহুকাল ধরে বহু প্রস্তাব এসেছে, তবে বাবা, মা বা দাদাদের পর্য্যন্ত। আমার কাছে কেউ আসতে সাহস পায়নি। বিয়ে করবার সময় কোথায় আমাদের? অকস্মাৎ বিশ্বেশ্বরবাবুর পাল্লায় পড়ে দুম করে লিখে বসলাম বাড়ীতে আর ব্যাটা পরিতোষ তৎক্ষণাৎ ঢাকে কাঠি দিয়ে বসলো।

শান্তি হেসে উঠলো: পরিতোষের ঢাক এবার বিয়ের সানাই হয়ে বেজে উঠবে।

হাসলাম: দাঁড়াও, এর মধ্যে অনেকগুলো 'কিন্তু' আছে। পটল যে ফটো নিয়ে গেছে, সে ফটো দেখে মার পছন্দ হবে কিনা কে বলবে!

ফোঁস্ করে উঠলো শান্তি: কেন, আমরা তো বলছি না আমাদের মেয়ে সুন্দরী রূপসী।

নিশ্চয়ই বলছো না! তৎক্ষণাৎ সায় দিলাম: তা কেউ বলছেন না। কিন্তু মা যদি কালো মেয়ে পছন্দ না করেন, তাহলে?

শান্তির কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য: সে সব আপনি জানেন।

গাম্ভীর্য্যের আঁচ পেয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলাম: না, সে কথা নয়। মা পাকা কথা দেবার আগে নিশ্চয়ই আমার মতামত জানতে চাইবেন এবং কালো মেয়ের প্রতি যে আমার বিশেষ কোনো বিরূপতা নেই, তাও তোমার অজানা নয়।—বলে একটু থেমে ওদের মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সম্ভব হলো না। ঠিক পেছন ফিরে না বসলেও চাঁদের দিকে ওরা মুখ দিয়ে বসেনি। বরং বোকার মতো আমিই বসে পড়েছি একেবারে চাঁদের মুখোমুখি।

ওরা হালকা হয়েছে কিনা বুঝতে পারলাম না। তাই আমার কথাই আমি বলতে শুরু করলাম : কিন্তু মত দেয়ার কথাই শুধু নয় শান্তি। এটা সাধারণ একটা প্রস্তাব নয়। তাই চূড়ান্ত রূপ দেবার আগে স্থিরচিত্তে ভেবে দেখা দরকার। আমার দিক থেকে শিশিরকণাকে পরিষ্কারভাবে জানানো দরকার যে, বিয়ে করলেও রাজনীতি আমি ত্যাগ করতে পারবো না কোনোদিন। আর বিপ্লবীদের রাজনীতি মানেই হচ্ছে আমৃত্যু সংগ্রাম। হয়তো ফাঁসিতেই তার পরিসমাপ্তি।

শিশিরকণা বললো : তা জানি।

জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তু জানো কি যে, বিপ্লবীরা কখনো ideal husband হতে পারে না? তুমি হয়তো তোমার বিবাহিত জীবনে একটি রঙীন স্বপ্ন সার্থক করে তোলবার স্বপ্ন দেখছো, কিন্তু জানো কি, বিপ্লবী স্বামীর হাতে পড়ে সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যেতে পারে?

শিশিরকণা জবাব দিল : জানি।

জানো কি, আমার যদি জেল হয়ে যায় কখনো, তাহলে তোমায় আবার বাপের বাড়ীতেই ফিরে আসতে হবে? অন্য কোথাও ঠাঁই মিলবে না?

স্পষ্ট জবাব দিল : তাও জানি।

জিজ্ঞেস করলাম অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে : জানো যদি তাহলে কেন এই দারুণ ঝুঁকি নিতে রাজী হচ্ছো, বল তো!

মৃদুস্বরে জবাব দিল : ঝুঁকি নিয়ে যারা চলছে, তাদের সঙ্গে চলবার ঝুঁকি নিতে রাজী আছে, এমনি মেয়েও তো থাকতে পারে।

শান্তি সমর্থন করলো : নিশ্চয়ই। আপনিই তো বলেছেন, পুরুষ যা করতে পারে, মেয়েরাও পারে তা। আপনি যদি বিপ্লবী পুরুষ, খুকু হবে বিপ্লবিণী নারী। সুতরাং আপনাদের বিবাহে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

শান্তি যা-ই বলুক, তবুও শিশিরকণার স্পষ্ট মত জানা দরকার। শান্তি যতই প্রিয় বন্ধু হোক, তার সম্মুখে সব কথা বলতে সঙ্কোচ হতে পারে। আর এমন কিছু তাড়া নেই যে, এখনই মতামত জানাতে হবে। আমার দিকের সব কথাই বলেছি আমি, এবার নিজের মনের সঙ্গে ভালো করে বোঝাপড়া করে নিক শিশিরকণা। তাই শান্তির গালভরা কথার প্রতিধ্বনি না তুলে বললাম : শোন শিশিরকণা, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার দাদারাও অল্পবিস্তর রাজনীতি করে থাকেন।

রবি তোমার সম্মতি আছে সংবাদ নিয়ে এসে আমার কাছে যতই নৃত্য করুক না কেন, আজকের কথাগুলো সেটা খুব সিরিয়াসলি ভেবে দেখো তুমি নিজে। বরং তোমার মতামত দু'চার দিন পরে জানিয়ো বিলুর মারফত।

শিশিরকণা বললো: আচ্ছা।

তারপর হালকা প্রসঙ্গে এসে পড়লাম: Siva-leg ও Diamond-red যে গাধাবোটের মতো সর্ব্বদাই আমাদের পেছনে লেগে আছে, তা জানো তো?

কে?—শিশিরকণা প্রশ্ন করলো।

হেসে বললাম: তোমার সেজদা'র কাছে শিখেছি। মানে, শিবপদ আর হীরালাল। জানতো, ওরা ফেউয়ের মতো লেগে আছে আমাদের পেছনে?

সব জানি।

হেসে বললাম: কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, সন্ধ্যার পর সুবোধ বালকের মতো আমরা বাড়ীতে অবস্থান করেছি মনে করে ওরা যখন সিপাইদের চৌকায় রান্না চড়ায়, তখন আবার শুরু হয় আমাদের কাজ। পেছনের গুপ্তপথে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের বেড়ার বাইরে দাঁড়াই আর ওদের সারাদিনের কাজ সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়, সব শুনে নিই।

প্রশ্ন করলো শান্তি: আপনারা স্পাইয়ের ওপর স্পাইং করছেন?

তা করছি।—

ঘন্টাখানেক পর বিলু, শান্তি ও শিশিরকণা বিদায় নিয়ে চলে গেল। একা দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ফেরবার পথে নদীর নির্জ্জন উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে আর একবার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। আকাশে তেমনি চাঁদ, তেমনি জ্যোৎস্নার বন্যা, শুভ্র কাশফুলের তেমনি দোলন আর সারা শরীরে তেমনি মিঠে হাওয়ার পেলব পরশ!······

অকস্মাৎ একদিন কলকাতা থেকে মেজদা'র পত্র পেলাম, মা দুরারোগ্য সেপটিসিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আমায় দেখতে চান। বাড়ীতে অন্তরীণ থাকতে বাবাকে হারিয়েছি। শুধু এটাই একমাত্র সান্ত্বনা যে, তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটি বেরিয়ে যাবার সময় আমিও তাঁর শিয়রে ছিলাম। গ্রামে অন্তরীণ থাকতে এখন কি আবার মাকে হারাতে হবে? অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলাম এবং তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করে দিলাম এবং আশ্চর্য্য, দিন দশেকের মধ্যেই

সাত দিনের ছুটিই শুধু মঞ্জুর হয়ে এল না, দিনাজপুর থেকে দু'জন সশস্ত্র সিপাই এসে হাজির হলো আমায় নিয়ে যাবার জন্য। তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম।

কলকাতা ভবানন্দ রোডে মেজদা'র বাড়ীতে এসে দেখি, মা শয্যায় একেবারে লীন হয়ে গেছেন! একেবারে ক'খানা হাড়মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনলাম, বাঁ হাতের কনুইতে সেপটিসিমিয়ার পচনশীল ফোঁড়া যখন দেখা দেয়, ডাঃ প্রিয়তোষ ঘোষাল তখন অনন্যোপায় হয়ে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত করেন। সামান্য একটু ছাড়িয়ে দিলেই চলবে মনে করে প্রিয়তোষ যখন ছুরি চালিয়েছেন, অকস্মাৎ তখন দেখা গেল মাংসের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে খাল অনেকদূর চলে গেছে। কিন্তু তখন আর স্থগিত রাখবার উপায় ছিল না। তাই ক্লোরফরম্ না করেই, কোন কম্পাউণ্ডারের সাহায্য না নিয়েই প্রিয়তোষ কাঁচি চালিয়ে কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলেন কাঁচা মাংস। তারপর অবশ্য জোরালো ওষুধ দেবার ফলে ঘা শুকিয়ে আসছে।

পটল বিশ্বাস এসে মার কাছে শিশিরকণার ফটো ও তারকবাবুর পত্র দিয়ে গেছে দেখলাম এবং শুনলাম চাটার্জ্জী বাড়ীর বক্তব্যও জানিয়ে গেছে। কিন্তু আমি বললাম: মুক্তি পাবার আগে বিয়ে করা ভুল হবে মা। কবে মুক্তি পাবো আর কবে চাকরি পাবো, তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ বিয়ে করে বসবো, এ যুক্তি মেনে নিতে পারি না। বিয়ে করে খাওয়াবো কি? থাকবো কোথায়?

মা বললেন: সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। ছাড়া পেলে চাকরি পেতে দেরী হবে না। তুমি বিয়ে কর।

বাধা দিলাম: কি করে বলছো দেরী হবে না? চাকরি করবার যোগ্যতা আমার আছে কি? আর থাকলেও চাকরির বাজার সস্তা নয়। ছাড়া পাওয়ার পর এই বেকার ভাইকেই দাদারা কতকাল পুষতে পারবেন বা রাজী হবেন কে জানে। বৌ তো তার বাপের বাড়ীতে থাকবেই, আমায়ও আবার না শ্বশুর বাড়ীতেই গিয়ে উঠতে হয়।

বোন হেনা মার মাথায় হাওয়া করছিল, বলে উঠলো: আমার ওখানে গিয়ে উঠো বৌ নিয়ে। তবু বিয়ে কর। আমার যদি জোটে, তাহলে বৌদি ও তোমারও ডাল-ভাত জুটবে।

বললাম: উৎসাহ তো খুবই দেখাচ্ছিস, কিন্তু জানিস্, মেয়েটি কালো। ফটো দেখে ভুলে যাসনি সে কথা।

হেনা কল্‌কল্‌ করে উঠলো : আচ্ছা, আচ্ছা, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না তোমায়। হোক কালো, হোক দেখতে নাই-বা ভালো, সে আমরা বুঝবো।

হেসে বললাম : বাঃ, তুই বুঝবি কিরে! বিয়ে করবো আমি আর বুঝবি তুই? না, না, কালো মেয়ে ফর্সা ছেলের পক্ষে বিয়ে করা ঠিক নয়।

মা বললেন : তোর বৌ দেখে যাবো এই ছিল আমার ইচ্ছা। হেনা তার সংসার ছেলেমেয়ে ফেলে এসেছে। কদ্দিন আর পারবে থাকতে! তোর বৌ এসে আমার শুশ্রূষা করবে, এই তো আশা করেছিলাম! কিন্তু দেখছি তা আর এ জীবনে হলো না।—বলে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এবার আর পারলাম না নিজের জেদ অটুট রাখতে। মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ আকাঙ্ক্ষা যেন আর্ত্তনাদের মতো আমার কানে ধ্বনিত হলো। মনের ইস্পাত-কাঠামো যেন বিহারী ভূমিকম্পের সংঘাতে একেবারে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়লো!······

সেদিনই আই বি-র কর্ত্তা নলিনী মজুমদারের কাছে দরখাস্ত করলাম। একদিন আই বি দারোগা প্রফুল্ল মণ্ডল এসে আমায় নিয়ে গেলেন লর্ড সিংহ রোডে। দোতলায় নলিনী মজুমদারের কক্ষ। টেবিলের ওপর একখানা মোটা লাল রংয়ের মলাটওয়ালা ফাইল দেখিয়ে বললেন : আপনার ফাইলটা বার করেছি। দেখছেন তো লাল রং, মানে dangerous, তারপর মোটাও কম নয়। সময় লাগবে।

বললাম : পুরোনো কাসুন্দি না ঘেঁটে এই প্রস্তাবটাই বিবেচনা করুন না যে আমি বিয়ে করে সংসারী হবো।

নলিনী বললেন : সেটা অবশ্যই ভালো প্রস্তাব। তারকবাবুদের পরিবার বেশ নামকরা।

কিন্তু তার আগে ছেড়ে দিন, চাকরি-বাকরি খুঁজতে হবে যে! চাকরি না পেয়ে বিয়ে করা কি সঙ্গত হবে? আপনিই বলুন—

আচ্ছা, আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবো।—আশা দিলেন নলিনী মজুমদার।

ফিরে এলাম। মাকে সব বললাম। মা আশান্বিত হয়ে উঠলেন। আমাদের পরিবারে আমার বিবাহ যেন একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, অচিন্তনীয়ও বটে!···

পূর্ব্বেই বলেছি, অজস্র চেষ্টা হয়েছে সর্ব্বদিক থেকে। কিন্তু এতকাল আমার ছিল ধনুক-ভাঙা পণ !

খানসামা ফিরে এসেই সেখানকার সমস্ত ঘটনা জানতে পারলাম বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছে। আমার অনুপস্থিতিতে সাধারণ নিন্দা এবার অকথ্য বদনাম হয়ে প্রচারিত হচ্ছিলো লোকের মুখে মুখে। সীতা বিশ্বাস সরমের লেশমাত্র আর না রেখে একেবারে আসরে নেমে পড়েছিলেন রণরঙ্গিনী তাড়কার বেশে। পশ্চাতে তাঁর ছিল পুরো এক অক্ষৌহিণী মোসাহেব ও গ্রাম্যদেবতা। হাড়ীপাড়ার হাড়ীরা এই শুদ্ধি অভিযানে মদৎ যোগাচ্ছিল। ফলে, সাময়িকভাবে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় চাটার্জ্জী পরিবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন বলা যায়।

আমার অনুপস্থিতিকালেই খানসামা গ্রামে ধূমকেতুর মতো এক ভস্মমাখা হিন্দুস্থানী সাধুর আগমন হয়েছে। সাধু এলেই তার আশেপাশে বেশ সহজ-ভাবেই ভক্ত জুটে যায় জল উঁচু ও জল নীচু বলবার জন্য। সীতা বিশ্বাস এই ভক্তবৃন্দের নেতৃত্ব যেচে গ্রহণ করেছেন। সাধুর আশ্রম তৈরী হয়ে গেছে এবং আশ্চর্য্য যে তা ভালো-মারই কাজির বাগানের বিরাটাকার আম, জাম ও কাঁঠাল গাছের নীচে। সহজ মানুষ ভালো-মা সাধু দেখেই ভড়কে গিয়েছিলেন এবং ভক্তবৃন্দের সমবেত আবেদন আর সাহস করে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনার মূঢ়তা ভালো-মা উপলব্ধি করেছিলেন অনেক পরে। তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

সাধুর ওখানে প্রতি সন্ধ্যায় ভিড় জমছে এবং করকোষ্ঠী বিচার করে ও ধ্যানে বসে সাধুপ্রবর লোমহর্ষণকারী সব তথ্য ব্যক্ত করছেন। সীতা বিশ্বাসের লাউডস্পীকারের মতো তিনি বলতে শুরু করেছেন যে, এই খানসামা গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিবার হচ্ছে চাটার্জ্জী বাড়ী। ওরা সবাই চরিত্রহীন। ওদের পাপের জন্যই এই গ্রামের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কলেরা দেখা দেবে, বসন্ত দেখা দেবে, মড়কে গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে। অতএব···ইউরেকা ইউরেকা বলে চীৎকার করে না উঠলেও কুৎসা প্রচারের সহজ পন্থা আবিষ্কার করে দিয়ে সাধু ভক্তবৃন্দের চাওয়া মেটাতে শুরু করেছেন।······

পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। গ্রামে স্পষ্ট দুটি দল হয়ে গেছে। সীতা বিশ্বাসের দলের জনসংখ্যা অনেক—অনেক বেশী। আর চাণক্যের মতো সেই দলের কূটবুদ্ধি জোগাচ্ছে সেই ভস্মমাখা সাধু। নিত্য নতুন

নিন্দা প্রচারিত হচ্ছে কাজির বাগান থেকে। বারুদখানার মতো মারাত্মক হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। এখন কোনোরকমে একটি দেশলাইয়ের কাঠি পড়লেই বিস্ফোরণ অনিবার্য্য!......

জানা গেল, পরিতোষ এবার আর সাপ্তাহিক নয়, প্রায় দৈনিক কন্‌ফিডেন্‌-শিয়াল রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। কেউ ছুটি ফিরে গেছে দিনাজপুরে এবং নিশ্চয়ই হারুণ-অল-রশীদের কৌতুকপূর্ণ গল্পগুলো বাণেশ্বরের কানে ঢেলে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান মধু!

সময় হাতে নেই আর। তখনই বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের কর্ম্মসূচী স্থির করে ফেললাম। আমাদের জন্য এই গ্রামের কারুর বা কোনো পরিবারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি আমরা হতে দোব না। বিশেষ করে চাটার্জ্জী পরিবার আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ। তাঁদের পারিবারিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া অন্যায় হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে বা কতখানি অগ্রসব হয়েছে, তার সঠিক বিবরণের খানিকটা পাওয়া যাবে পরিতোষের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে। কারণ সে-ই আমাদের প্রধান শত্রু। শত্রুর গোপন দলিলে তার মনোভাব বোঝা যাবে। সুতরাং স্থির করা হলো যে, থানা থেকে পরিতোষের Deed Box-টা চুরি করে আনতে হবে। কন্‌ফিডেন্‌-শিয়াল রিপোর্টের ডায়েরীখানা ওর মধ্যেই থাকে। সেখানা সরিয়ে ফেলতে পারলে ব্যাটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানো যাবে বেশ। আমরাও বুঝতে পারবো পরিস্থিতির গুরুত্ব।

সময় হাতে নেই আর। তাই বেরিয়ে পড়লাম নিঃশব্দে সেদিনই গভীর রাত্রে। বিশ্বেশ্বরবাবু ক্ষুদ্র একটা টর্চ্চ নিয়ে থানার বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি প্রবেশ করলাম সন্তর্পণে বিড়ালের মতো সিপাইদের ঘরের খোলা জানালাপথে। ছয়জনের মধ্যে চারজন ছিল সে রাত্রে। এল সি রবি নেই, পরিতোষ সাধারণ সিপাইয়ের মতো তাকেও পাঠিয়েছেন টঙ্গুয়া গ্রামে ডিউটিতে।··· পরিতোষও অবশ্য ছিলেন না সেদিন। তাই যে নৈশ সান্ত্রী বারান্দায় স্তিমিত লণ্ঠন রেখে টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে নাসিকা গর্জ্জন করে পাহারা দিয়ে থাকে, সে-ও আজ রেহাই পেয়ে একেবারে খাটে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হলো। ওদের পাশাপাশি বিছানো লোহার খাটে মশারির নীচে ঘুমোচ্ছে সিপাইরা, তার মাঝখান দিয়ে প্রায়

গা ঘেঁসে এগুতে হবে আমাকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে বেড়ালের মতো এগিয়ে এসে থানার প্রধান কক্ষে প্রবেশ করলাম। বারান্দার দরজা আস্তে আস্তে খুলে দিতেই বিশ্বেশ্বরবাবু প্রবেশ করলেন। কিন্তু টর্চ্চ মাঝে মাঝে জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা গেল, ব্যাটা Deed Box-টা সে রাত্রে আর থানায় রেখে যায়নি।···সুতরাং ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসতে হলো বাসায়। সেই রাত্রেই সিদ্ধান্ত করে ফেললাম দু'জনে পরদিনই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চরমপত্র দেবো আমাদের খানসামা থেকে বদলি করবার দাবী জানিয়ে। অপেক্ষা করবো মাত্র সাতদিন। তারপরই আমরা আইনভঙ্গ করবো, থানায় হাজিরা দেবো না। কয়েক মাস কারাদণ্ড হয়ে গেলে আর ফিরে আসতে হবে না খানসামায়। হয়তো তাতে এখানকার উত্তাপ প্রশমিত হয়ে যাবে, চাটার্জ্জী পরিবারের মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার হবে। আমাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে এমনি নিষ্কলঙ্ক পরিবারের অবমাননা আমাদেরই কর্ত্তব্য রোধ করা। আমরা চলে গেলে তা সম্ভব হবে।

কিন্তু কোনো জবাবই এল না আমাদের চরম পত্রের। সুতরাং চরম পন্থা গ্রহণ করতে হলো। এক হাটের দিনে আমরা আর গেলাম না থানায়, কালুবাবুর দোকানে নতুন স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করেই কাটিয়ে দিলাম নির্দ্ধারিত সময়। তাঁরই মুখে সংবাদ পাঠালাম বিলুর কাছে যে, আমরা খানসামা ত্যাগ না করলে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারবো না। ভবানীবাবু অবশ্য সহসা আইনভঙ্গ না করবারই অনুরোধ জানালেন। বললেন যে, তিনি সবে এসেছেন, পরিস্থিতিটা এখনও ভালো করে বুঝে উঠতে পারেননি। বললেন: কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন না। এর পর দারোগাকে কি করে সায়েস্তা করতে হয়, তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমরা অবশ্য সেদিনই আইনভঙ্গ করেছিলাম। কিন্তু আমি স্থানান্তরিত হয়ে চলে যাবার পর এই ভবানীবাবুই পরিতোষ দারোগাকে যে কিভাবে সরকারী প্যাঁচ কষে নাকানি-চোবানি খাইয়ে শেষ পর্য্যন্ত অন্যত্র সরে পড়তে বাধ্য করেছিলেন, সে এক লোমহর্ষণকারী কৌতুককর ইতিবৃত্ত!······

সাড়ে ছটায় বাসায় ফিরে চা খাচ্ছি। এমন সময় দারোগার সরকারী পোশাক এঁটে অকস্মাৎ পরিতোষের আবির্ভাব!

বিশ্বেশ্বরবাবু বলে উঠলেন : আরে দারোগাবাবু যে! আসুন, আসুন—ওরে বাচ্চা, আর এক কাপ চা দিয়ে যা।

পরিতোষ বসলেন না, দরজার কাছে দাঁড়িয়েই দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন : বি সি এল এ আইনের নির্দ্দিষ্ট ধারায় আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

বিশ্বেশ্বরবাবু টিপ্পনি কাটলেন : গ্রেপ্তার! গ্রেপ্তার তো আমরা হয়েই আছি। কিন্তু এস পি-র হুকুম কি এরই মধ্যে এসে গেল? পাঁচটায় থানায় যাইনি আর এখন—

এস পি-র হুকুম লাগবে কিসে?—ললাট কুঞ্চন করে প্রশ্ন করলেন পরিতোষ।

আমি জবাব দিলাম : তাই-ই তো হচ্ছে নিয়ম। রাজবন্দী আইন ভঙ্গ করলে স্পেশাল বার্ত্তাবহ মারফত সংবাদ পাঠাতে হয় এস পি-র কাছে। এস পি বললে তবে গ্রেপ্তার করে চালান দিতে হয়। দারোগা আগেই গ্রেপ্তার কবেন না—

পৌরুষে লাগলো ঘা। পরিতোষ বললেন : আইনের ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে না শুনলেও চলবে। আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি বেশ সচেতন।

অবশ্যই, অবশ্যই।—বিশ্বেশ্বর আবার ঠাট্টা করলেন। তারপর হাত দু'খানা এগিয়ে দিয়ে বললেন : নিন, হাতকড়া লাগান, তারপর কোমরে দড়ি বাঁধুন, তারপর টেনে নিয়ে চলুন থানার বারান্দায়। তবেই তো বোঝা যাবে যে, খানসামা থানার দারোগা আমাদের গ্রেপ্তার করেছেন। খানসামা বন্দরের মূঢ় জনসাধারণ বুঝতে পারবে আপনার কত খ্যামতা!

এমন সময় চা হস্তে বাচ্চার প্রবেশ। সে অতশত তখনো বুঝতে পারেনি, পরিতোষ কাপটা না নেয়াতে সে ভদ্রতা করলো : খান্ ক্যানে, চা-টা ভালোই হছে।

আমি বললাম : দেখবেন আবার, বন্দী আসামীর বাড়ীর চা, বলা যায় না, কিছু মেশানোও থাকতে পারে।

বিশ্বেশ্বরবাবু হেসে উঠলেন, বললেন : বাচ্চা, ওটা তুই-ই খেয়ে ফ্যালগে। আমরা এখন গ্রেপ্তার হয়েছি। তাই থানায় যাচ্ছি। চলুন, দারোগাবাবু।

দারোগা'র সঙ্গে সঙ্গে থানার বারান্দায় এসে বসলাম। খুব স্টাইল করে পরিতোষ কয়েক পৃষ্ঠা রিপোর্ট লিখলেন বোধহয় সেদিন যথাসময়ে থানায় হাজিরা না দিয়ে, আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গভর্নমেন্টের কোন্ পাকা ধানে

মই চালিয়ে দিয়েছি, তারই সালঙ্কার বিবরণী। ইংরেজী ভাষায় তিনি বরাবরই অক্সফোর্ডের এম এ; তাই তোবড়ানো গালে আরও কয়েকটা রেখা ফুটিয়ে ও তাম্বুল রসে কৃষ্ণবর্ণ গোটাকয়েক মুলো-দাঁত বার করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন: এ্যাবজর্ড্ বানানটা কি দ্বিজেনবাবু, 'be' না 've'?

বলে দিলাম।

লেখা শেষ করে দারোগাসুলভ গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে বললেন: আপনারা খেয়ে নিন। তারপর কোথায় থাকবেন, ঠিক বুঝতে পারছি না—

আমরা কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি এবং আপনাকেও তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।— বলতে লাগলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: যেই মুহূর্ত্তে আমাদের গ্রেপ্তার করেছেন, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের খাবার ও থাকবার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। আমরা যে রাজঅতিথি এখন থেকে। আর আপনি সেই রাজার প্রতিনিধি।

কত করে পান আপনারা খাবার জন্য?

বাধা দিলাম: আপনার ঐ মোটা মোটা কেতাবে কিন্তু তা খুঁজে পাবেন না, দারোগাবাবু। ওতে আছে সাধারণ আসামীদের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ তালিকা। আমরা যে ডেটিনিউ। আমাদের বরাদ্দ অনেক বেশী।

তাচ্ছিল্যভরে বলতে চেষ্টা করলেন পরিতোষ: 'এ' ক্লাস আসামীর বরাদ্দ যা, তাই পাবেন। আজ ওতেই চালিয়ে নিন, তারপর ঠাকুরগাঁ গিয়ে না-হয়—

মাপ করবেন স্যার—বাধা দিলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: আইনকানুন আপনি যেমন জানেন, তেমনি আমরাও জানি। ঐ চালিয়ে নেবার ব্যাপারটা আর চলে না। এ্যাদ্দিন চলতো এবং চলছিল ও। কারণ এ্যাদ্দিন আমরা ছিলাম গভর্নরের বন্দী। দেখেননি, আমাদের ওপর সমস্ত হুকুমনামায় বয়ান থাকে—His Highness the Governor has been pleased…ইত্যাদি ইত্যাদি? আর এখন আমরা আপনার হাতের আসামী—His Exalted Highness the Officer-in-charge of Khansama Police Station! এখন আর চালাচালি নেই। যা পাওনা, কড়ায়গণ্ডায় হিসেব করে নোব। এক কাজ করুন, দু' দিস্তে ফুলকো লুচি আর আধসেরটাক মাংস আনাবার ব্যবস্থা করুন। সঙ্গে কিছু মিষ্টি। নইলে আমরা খাবো না আর আমাদের যা বলবার, তা বলবো কাল এস ডি ও-র কাছে।

রান্না তো আপনাদের হয়ে গেছে, বিশ্বেশ্বরবাবু—

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হয়ে গেছে এবং আমরা ঐ রান্নাকরা খাবার রাস্তায় ফেলে

দেবো। বিচারাধীন আসামীর খাবার ব্যবস্থা করতে আপনি বাধ্য।—স্পষ্ট জানালেন বিশ্বেশ্বরবাবু।

মহা হাঙ্গামায় পড়ে গেলেন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দারোগা পরিতোষ। কোথায় পাওয়া যাবে লুচি আর মাংস? রঘুর দোকানে তৈরী নানারকম মিষ্টি, লুচিও হয়তো হতে পারে। কিন্তু মাংস?…পরিতোষের বাংলা পাঁচ-মার্কা মুখখানা একেবারে পেঁচার মতো দেখাতে লাগলো।

অবশেষে হেসে বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু: আচ্ছা থাক্, আমরা আমাদের চাকরের রান্নাই খাবো'খন। কিন্তু আজ রাত্রে কোথায় থাকবো আমরা?

আমিই জবাব দিলাম: কেন, থানার হাজতে? আসামী হয়ে কি আবার বাসায় গিয়ে আরাম করে শুতে চান নাকি বিশ্বেশ্বরবাবু?

ইতিমধ্যে সংবাদ রটে গেছে বোঝা গেল। দু'চারজন ভদ্রলোক এসে পড়েছেন,—ভবানীবাবু, কিশোরীবাবু, কুঞ্জলাল, ডাক্তার অমর গুপ্ত প্রভৃতি। এল সি রবির মনে কি হচ্ছে জানিনে। কারণ আমাদের চোখের দিকে চাইছে না সে। নীরবে দারোগার হুকুম তামিল করে একবার এনে দিচ্ছে P. R. B. (Police Regulations, Bengal) বইখানা, আবার এগিয়ে দিচ্ছে Deed Box-টা। ঘরের মধ্যে টেবিলে বসে কলম চালাচ্ছেন জমাদার কামাখ্যা মুখুজ্জে আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসির আভায় তাঁর অধর দু'খানি প্রসারিত হয়েই আবার সঙ্কুচিত হচ্ছে। রসিক ব্যক্তি, কিন্তু বদরসিক পরিতোষ যে তাঁর বস্!……

কোথায় আমরা রাত্রিযাপন করবো, তা নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন পরিতোষ। খাবার হাঙ্গামা চুকলো, কিন্তু শোবার?

আমি বললাম: আমাদের বিছানাপত্র সব আনিয়ে হাজতের মধ্যে মশারি টাঙিয়ে ভালো করে বিছানা করে দেবার ব্যবস্থা করুন দারোগাবাবু!

রবি!—হাঁক দিলেন পরিতোষ।

আজ্ঞে!—রবি এসে হাজির।

এঁদের দু'জনের বিছানা এনে হাজতের মধ্যে ভালো করে পেতে দাও। একটা সিপাইকে নাও।

রবি নিবেদন করলো: কিন্তু স্যার, হাজতে যে স্তূপীকৃত ডায়েরী ও অন্যান্য পুরোনো খাতা রয়েছে—

কেন রয়েছে ওখানে ?—পরিতোষ এতগুলো ভদ্রলোকের সামনে যেন দ্বিতীয় চাণক্যের মতো ভয়ে কম্পমান বাচালকে রক্তবর্ণ চক্ষু দেখাতে লাগলেন : হাজত কি গুদাম ? কে ওসব রেখেছে ওখানে ?

মনে হলো এর পরই বজ্রকণ্ঠে হুকুম হবে : উস্‌কো গৰ্দ্দান লাও।

কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত বাচাল মিনমিন করলো : আপনিই বলেছিলেন স্যার পুরোনো খাতাপত্র ওখানে সাজিয়ে রাখতে—

বলেছিলাম ? বেশ করেছিলাম—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন পরিতোষ : কিন্তু এখন এঁদের শোবার ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে ?

কথা বললেন ভবানীবাবু : ওরা না হয় ওঁদের বাসাতেই—

বলেন কি ?—ফিরে দাঁড়ালেন পরিতোষ : গ্রেপ্তারের পর নিজেদের বাসায় ?

তারপর বলা যায় না, যদি পালিয়ে যাই ?—যোগ করে দিলাম আমি।

কিন্তু পরিতোষের আস্ফালন বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। প্রথমতঃ হাজতে স্তূপীকৃত খাতাপত্র, তারপর সমবেত ভদ্রলোকের অনুরোধ, তাই শেষ পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের বিছানাতেই সে রাতটি কাটাবার হুকুম পেলাম। তবে বিশ্বেশ্বরবাবু যে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তাই পরিতোষ তাঁর এলাকার দিকে দিকে জরুরী হুকুম পাঠিয়ে দিলেন। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই এসে হাজির হলো দশ-বারোজন চৌকিদার আর চারজন দফাদার। সেই সঙ্গে রবিসহ জনচারেক কনেস্টবল সারা রাত আমাদের পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন হলো। মাঝে দু'বার এসে পরিতোষ আবার দেখে গেলেন প্রহরীগুলো কুম্ভকর্ণ বনে গেছে কিনা এবং শিকার দুটি খোলাদ্বার খাঁচায় দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে কিনা !······

ছটফট করিনি বটে, তবে অনেক রাত অবধি জেগে ছিলাম আমি। পাশের ঘরে বিশ্বেশ্বরবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন যখন বুঝতে পারলাম, বাচ্চাকে তখন বললাম এক কাপ চা করে আনতে।

এই যে আমাদের চাকর ও রাঁধুনী, এই দেশীয় বাহে, বাচ্চা বর্ম্মণ, খানসামা গ্রামেই যার সঙ্গে প্রথম দেখা এবং পরবর্ত্তী জীবনে যার সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের আদৌ সম্ভাবনা নেই, আমাদের গোপন ক্রিয়াকাণ্ডে এই নিরক্ষর লোকটাই কি কম সাহায্য করেছে ! যখন যেখানে পাঠিয়েছি খবর দিয়ে বা পত্র দিয়ে, শুধু বিনা দ্বিধায় নয়, হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেছে। কোনো প্রশ্ন করেনি, কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। আমার বার্ত্তাবহ হয়ে কাজ

করা যে কতখানি বিপজ্জনক, তা সে প্রথম প্রথম না বুঝলেও পরে অনেকখানিই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাতে ভয় না পেয়ে বরং কাজ করবার আগ্রহ ও উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে আমরাই পরিহাস করতাম : ধরা পড়লে তোর কিন্তু দশ বচ্ছর জেল হয়ে যাবে, বুঝলি ?

এই বাচ্চাকে দেখে আমার বছিরদ্দির কথা মনে পড়তো। খানসামার বাচ্চার মধ্যে কেয়টখালীর বছিরদ্দির প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলাম।......

যদিও নিশ্চিতভাবে সে জানে যে, কাল সকালে আমরা দু'জন যাবো ঠাকুরগাঁয়ে, হয়তো আর এখানে ফিরে আসবো না, জীবনে হয়তো আর ওর সঙ্গে দেখা হবে না, তবুও সে আমাদের ত্যাগ করেনি। বলেছিলাম, চাল ডাল তেল নুন মশলা যা অবশিষ্ট আছে, তা নিয়ে বাড়ী চলে যেতে, যায়নি। কাল সকালবেলায় আমাদের বিদায় দিয়ে তবে যাবে, যদিও বার বারই বলছে বাচ্চা যে, আমরা আবার এই খানসামাতেই ঘুরে আসবো।

চা নিয়ে আসতেই বাচ্চার হাতে একখানা ভাঁজ-করা চিঠি দিয়ে দিলাম এবং যে করে হোক, ওখানা বিলুর হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে বললাম। ঐ পাহারাওয়ালারা জানে যে আসামী দু'জন, ঐ চাকর ব্যাটা কিছু নয়। সুতরাং কিছু নয় যে ব্যাটা, তাকে কেন পাহারা দেবে, তাকে কেন বাইরে যেতে দেবে না, তেমনি কোনো হুকুম নেই দারোগা সাহেবের। সুতরাং—

ভোরবেলা জাগাতে এসে বাচ্চা পত্রের জবাব লেখা চিরকুটখানা হাতে গুঁজে দিয়ে গেল।

সকালবেলায় রঘুপদর দোকানের ফুলকো লুচি, আলুর দম এবং সত্যসত্যই মাংসের কোর্ম্মা দিয়ে ভুঁড়িভোজন করবার পর শোভাযাত্রা করে রওনা হলাম আমরা গরুর গাড়ীতে চব্বিশ মাইল দূরে ঠাকুরগাঁ মহকুমা শহরের উদ্দেশ্যে। প্রথম গাড়ীতে আমাদের মালপত্র আর একজন সিপাই, দ্বিতীয় গাড়ীতে বিশ্বেশ্বর-বাবু ও আমি, তৃতীয়টিতে আর একজন সিপাই ও জমাদার কামাখ্যাবাবু। দু'চারজন ভদ্রলোক এলেন যেন সি-অফ্ করতে। যেন আমরা চলেছি সদলবলে ওয়ালটেয়ারে বা মুসৌরীতে কিংবা হনলুলুতে মধুচন্দ্র যাপন করবার জন্য !......

আমাদের মধুচন্দ্র আইনদুরন্ত পরিতোষকে কী ভাবে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়েছিল, সেই কাহিনীই বলছি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে।

তেইশ

সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছোলাম ঠাকুরগাঁয়ে। কোতোয়ালীতে গিয়ে উঠলাম শোভাযাত্রা করে। অফিসার ইন চার্জ্জ বাসায় ছিলেন, সংবাদ পাঠানো হলো।

কিন্তু কাগজপত্র উলটে-পালটে দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রতীশবাবু: এস পি-র অর্ডারটা কোথায় ?

আমতা আমতা করলেন কামাখ্যাবাবু : দারোগাবাবু বলেছেন যে, এতে আর এস পি-র হুকুম দরকার হয় না—

কি বললেন, রতাশবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো : এস পি-র হুকুম দরকার হয় না, হুকুম দেবার মালিক খানসামা থানার দারোগা ? কি অপরাধ করেছিলেন এঁরা ?

কামাখ্যাবাবু জবাব দিলেন : এঁরা কাল বিকেলে থানায় হাজিরা দিতে যাননি—

কোথায় গিয়েছিলেন ?

কোথাও না, নিজেদের কোয়ার্টার্সেই বসেছিলেন—

ব্যস ! ধমকে উঠলেন রতীশবাবু : তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ? আইনভঙ্গ হয়ে গেল ?

কামাখ্যাবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রতীশবাবু তখন রীতিমতো ক্ষেপে গেছেন : এস পি-র হুকুম ছাড়া ওর বাবাও যে ডেটিনিউদের এ্যারেস্ট করতে পারে না, সে সংবাদ কি তিনি রাখেন ? আপনিও তো এতকালের চাকুরে, আপনি বলে দিতে পারেননি দারোগাকে ?

কামাখ্যাবাবু বললেন : জমাদারের কথা শুনবেন কেন দারোগাবাবু ? আমরা সব সেকেলে লোক—

বেশ, ভালোই করেছেন। এবার ঠ্যালা সামলাবেন।—বললেন রতীশবাবু : এস পি-র হুকুম ছাড়া ডেটিনিউদের আমি ভার নিতে পারবো না। থানার হাজতে আমি ওঁদের রাখতে পারবো না। ওঁরা থাকবেন সম্পূর্ণ আপনার দায়িত্বে কাল কোর্টে যাওয়া পর্য্যন্ত। তারপর এস ডি ও যা বলেন, তাই হবে।

কামাখ্যার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বললেন : বলেন কি স্যার ? ওঁদের ভার আমি নেবো কি করে ? ওঁরা খাবেন কি আজ রাত্রে ?

আমার ওপর দারোগাবাবুর হুকুম ছিল শুধু আপনার হেপাজতে পৌঁছে দেওয়া—

তা তো এনেছেন—জবাব দিলেন রতীশবাবু: কিন্তু আপনার দারোগার হুকুম আমার ওপব চলে না। তাই আমি ওঁদের হেপাজতে নিলাম না, বুঝলেন? আর ওঁদের কাল কোর্টে যাবার আগে পর্য্যন্ত খাবার দাবার সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে, বুঝলেন?

বুঝতে সবই পারছিলেন জমাদার এবং আমরাও অবস্থাটা বুঝে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলাম। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।······

রতীশবাবু ঠাকুরগাঁ মহকুমা শহরের কোতোয়ালীর কনফারম্‌ড্‌ দারোগা আর পরিতোষ খানসামা গ্রামের অফিসিয়েটিং অফিসার-ইন চার্জ্জ। সুতরাং পরিতোষের মতো ফড়িংকে থোড়াই কেয়ার করেন রতীশবাবু। ফস্ করে ডায়েরী বইখানা টেনে নিয়ে কার্ব্বন ঢুকিয়ে দিয়ে খস্ খস্ করে পেন্সিল চালালেন কিছুক্ষণ, তারপর কামাখ্যাবাবুকে বললেন: আমি লিখে দিলাম যে, আপনি এসেছিলেন দু'জন ডেটিনিউকে নিয়ে, কিন্তু এস পি-র কোনো অর্ডার না থাকাতে আমি রিসিভ করলাম না। বুঝলেন?

বলে আর অপেক্ষা করলেন না রতীশবাবু। গট গট করে আমাদের পাশ দিয়ে বাসার দিকে প্রস্থান করলেন। বারান্দায় স্তূপীকৃত মালপত্রের পাশে বসে বসে আমরা ঝড়ের গতি নিরীক্ষণ করছিলাম।

প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কামাখ্যা এসে আমাদের হাতে ধরে পড়লেন ও পরামর্শ ভিক্ষা করলেন। পরিতোষের উপর আমাদের শত ক্রোধ থাকলেও কামাখ্যা মুখুজ্জের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি। পরিতোষিণী মারফত আমার নামে যেসব কুৎসা খানসামা গ্রামে রটেছে, তাতে জমাদার-গৃহিণীর কোনো উৎসাহ ছিল না। তাই সুপরামর্শই দিলাম আমরা এবং দোকানের পরোটা আর তরকারি খেয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মতোই কোতোয়ালীর বারান্দায় বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন কোর্টের পুলিশ অফিসে আমাদের নিয়ে যেতেই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন কোর্ট ইন্‌সপেক্টার: অ্যাঁ! এস পি-র অর্ডার নেই। মামলা করবো কি আমি পরিতোষের হুকুমে?

আবার মিনমিন করতে চেষ্টা করলেন কামাখ্যা জমাদার : কি করবো স্যার, দারোগাবাবু বলে দিলেন, রাজবন্দীরা আইন ভঙ্গ করলে তিনিই নাকি গ্রেপ্তার করতে পারেন—

আইন!—কড়া প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ ইন্‌সপেক্টার : আইন তো বি সি এল এ্যাক্ট। সেই আইনের কয়েকটি ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্নমেন্ট রাজবন্দীর ওপর যেসব হুকুমজারী করেছেন, দারোগার কাজ হচ্ছে শুধু দেখা যে, রাজবন্দী সেগুলো যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা। যদি না করেন, তাহলে সে শুধু এস পি-কে জানাবে সেই ঘটনা এবং এস পি যদি বলেন এ্যারেস্ট করে মামলা করতে, তাহলে দারোগা সেই হুকুমমতো কাজ করে যাবে। কেন, আপনি জানেন না এসব ?

জানি স্যার, কিন্তু আমি জমাদার, আমার কথা দারোগাবাবু—

দারোগাবাবু!—গর্জ্জন করে উঠলেন ইন্‌সপেক্টার : এবার যেন সামলায় ঠ্যালা আপনার দারোগাবাবু।

তারপর আমাদের জিজ্ঞেস করলেন : আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ? রাত্রে কোনো কষ্ট হয়নি তো ?

দেখলাম কামাখ্যা জমাদার অত্যন্ত সকরুণভাবে আমাদের দিকে যেভাবে তাকিয়ে রয়েছেন, তার অর্থ হচ্ছে : আমার গর্দ্দানটা দয়া করে এইবারটি বাঁচিয়ে দিন। তাই দয়া করে আমরা তার গর্দ্দানটা বাঁচিয়েই দিলাম তখনকার মতো। বললাম : না, আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে হয়নি।

তারপর আমাদের যেতে হলো আদালতে। আমীনুল্লা বসে আছেন গম্ভীর মুখে।

ইন্‌সপেক্টারের বক্তব্য শুনে এস পি-র অর্ডার পত্রখানা চাইলেন আমীনুল্লা। প্রত্যুত্তরে ইন্‌সপেক্টার আর একবার পরিতোষ দারোগার শ্রাদ্ধ করলেন। এদিকে আমরা যে এসে গেছি আমাদের লট-বহর নিয়ে! তাই উপায় না দেখে এস ডি ও বললেন : ডি এম-কে (ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে) সংবাদ জানাতে একজন স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার পাঠিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন : কিন্তু থাকবেন কোথায় ? জেলে ডেটিনিউদের থাকবার পৃথক ব্যবস্থা কোথায় ? আর এঁদের খাবার ব্যবস্থাই বা কি করে হবে ?

ইন্‌সপেক্টার নিবেদন করলেন : আমার ঠাকুরটাকে না হয় ক'দিন দিয়ে

দেবো ওঁদের রান্না করে দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু ওঁরা থাকবেন কোথায়? ফিমেল ওয়ার্ডে যে দুটো মেয়ে-আসামী আছে। ও দুটো না থাকলে বরং—

আমীনুল্লা জিজ্ঞেস করলেন: কি কেস্ ওদের?

দুটোই হোটেল থেকে খাবার চুরির মামলা—

ওদের জামিন দিয়ে দিচ্ছি। ঐ ফিমেল ওয়ার্ডে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন।

হুকুম মতো কাজ হলো। সাব জেলের ফিমেল ওয়ার্ডে এসে আমরা দু'জন প্রাণভরে হাসতে লাগলাম। বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: দাঁড়ান না, ক্লাইমেক্সটা এখনো বাকি আছে। পরিতোষের দুর্দ্দশাটা একবার দেখুন না কি হয়!

বিকেলের দিকে রোজকার মতো জেল পরিদর্শনে এসে আমীনুল্লা সোজা আমাদের ওয়ার্ডে চলে এলেন, আমাদের খাবার ও থাকবার ব্যবস্থার তদারক করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন: ব্যাপার কি, আপনারা থানায় হাজিরা দিলেন না কেন?

সুযোগ পাওয়া গেল। বিশ্বেশ্বরবাবু অগ্রণী হয়ে পরিতোষের কীর্ত্তিকলাপ সব বললেন বিস্তৃতভাবে। শেষ দিকে মন্তব্য করলেন: এই ভদ্রলোকের প্রস্তাবিত বিয়ে নিয়ে ওখানকার আবহাওয়া এমনি করে তুলেছেন দারোগাবাবু যে, চাটার্জ্জী পরিবারের মানমর্য্যাদা যাবার জোগাড় হয়ে উঠেছে। নিরপরাধের এমনি অবমাননা আমাদের উপস্থিতিতে বাড়তে পারে বলেই আমরা সরকারী আদেশ অমান্য করেছি জেল খেটে অন্যত্র বদলি হবার উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন করলেন আমীনুল্লা: কিন্তু বিয়ের কথা নিয়ে গোলমাল কেন হবে?

পরিতোষ দারোগাই এর জবাব দিতে পারে।—বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু।

All right, the Officer-in-charge will have to suffer the consequence!—বলে চলে গেলেন এস ডি ও।

দিন সাতেক পর একদিন এসে জানালেন আমীনুল্লা: ডি এম-এর চিঠি এসে গেছে। গভর্নমেন্ট মামলা করবেন না and you will have to go back to Khansama again, আর আপনাদের অন্যত্র বদলি করার প্রস্তাবও তিনি গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললাম: কিন্তু আমরা যে আর খানসামায় ফিরে যেতে চাইনে।

আমীনুল্লা বললেন: গভর্নমেন্টের পরবর্ত্তী আদেশ না আসা পর্য্যন্ত দেখছি

আপনাদের ওখানেই থাকতে হবে। কিন্তু বিয়েটা আপনি করে ফেলুন না, তাহলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়।

জবাব দিলাম: বিয়ে করবো ঠিকই, তবে ছাড়া পাবার পরে। নিন্দার ভয়ে বিয়েটা এখুনি করবো কেন?

That's upto you, gentleman—বলে চলে গেলেন আমীনুল্লা।

সেদিনই রাত্রে আহারের পর আবার রওনা হলো আমাদের কনভয়—এবার তিনখানা গরুর গাড়ীতে আমাদের যাবতীয় মালপত্র আর দু'জন সিপাই এবং চতুর্থ খানায় আমরা দু'জন। পরদিন খানসামা থানার কম্পাউণ্ডে এসে প্রবেশ করলাম যখন, তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে।

পরিতোষ বাড়ী থেকে একেবারে ছুটে এসে কলরব করে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন: আসুন, আসুন। দরওয়াজা, দু'খানা চেয়ার দাও।—ইস, দ্বিজেনবাবুর চেহারাটা তো বড্ড খারাপ দেখছি। অসুখ হয়েছিল বুঝি?

আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: কেমন স্যার, এস পি-র হুকুম ছাড়াই বলে আপনি আমাদের চালান দিতে পারেন? আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনি নাকি খুব সচেতন? এবার কী হলো?

মহাদুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন পরিতোষ: আর কি হলো। আপনারা চলে যাবার পরদিনই বাণেশ্বর এসে হাজির আপনাদের জন্য কতকগুলো বাসন-কোসন, হারিকেন ইত্যাদি নিয়ে। আপনাদের না দেখেই তো তেলেবেগুনে চটে গেলেন। বললেন, কার কথায় তুমি ওঁদের চালান দিলে? এতগুলো টাকা যে বৃথা হলো, তার জন্য দায়ী হবে কে? স্পষ্ট বলে গেলেন, সমস্ত ব্যয় আমার মাইনে থেকে instalment-এ কেটে নেওয়া হবে। কীই-বা পাই—

বিশ্বেশ্বরবাবু হেসে উঠলেন। পরিতোষ বলতে লাগলেন: আরে, মশাই, আমার ঘোড়াটা আবার কাল মরে গেছে। কী কুক্ষণেই যে আপনাদের পাঠিয়েছিলাম! কতগুলো টাকা দণ্ড গেল।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রঘুর দোকানে খেতে যাবার কথা বলতেই পরিতোষ বাধা দিয়ে বললেন: না, না, তা কি হয়?—সে হবে না। আমি রান্না করিয়ে রেখেছি আমার বাড়ীতে। শালী নয়, গিন্নি আজ স্বয়ং রান্না করেছেন। দুটো ডাল-ভাত এ বেলাটা আমার ওখানেই—তারপর আমি আপনাদের পুরানো চাকর বাচ্চাকে খবর পাঠাচ্ছি।—

*　　*　　*

বিজয়ীর উল্লাস নিয়ে ফিরে এসেছি আবার খানসামায়। নিন্দুকদের গালে ফিরিয়ে দিয়েছি চপেটাঘাত দ্বিগুণ জোরে। আঙুলগুলো গালে ফুটে উঠলো বুঝি!···ফিরেই যখন এলাম, তখন আর কালহরণের প্রয়োজন কি? গোপন যোগাযোগগুলো আবার স্থাপিত হলো, বাড়ীর পেছন দিককার বেড়া আবার সাবধানে খুলে সন্তর্পণে শুরু হলো আমার নৈশ অভিযান এবং বিলুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো, একদিন রাত্রে চলে যাবো ছ' মাইল দূরে বীরগঞ্জে, বীরগঞ্জ থানায় অন্তরীণ রাজবন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আসবো।

এই দুঃসাহসিক কার্য্যে যাঁর সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলাম, একেবারে দলীয় সহকর্ম্মির মতো, সরকারী চাকুরে হয়েও সে যুগে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে যিনি সেই নৈশকালীন অভিযানে আমার মতো মারাত্মক রাজবন্দীকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়েছিলেন নিবিড় সহানুভূতি, তিনি হচ্ছেন বীরগঞ্জের স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যবাবুর নাম বলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধায় উল্লেখ করতে হয় তাঁর স্ত্রী রাণীবৌদির কথা। আরো দশটা পরিবারের মতোই ছেলেমেয়ে পরিবৃত মধ্যবিত্ত সংসার। এর আগে মাত্র দু'একবার খানসামায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে সত্যবাবুর ও রাণীবৌদির। কোনো আত্মীয়তা নেই আমার সঙ্গে। খানসামার চাটার্জ্জী পরিবারের সঙ্গে কোন্ লতাপাতায় সম্পর্ক আছে বলে শুনেছি। মাঝে মাঝেই খানসামায় আসতেন তাঁরা। কিছু আলাপ হয়েছে তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই। কিন্তু ঐ সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলাটির অন্তরে যে মমতার ঐশ্বর্য্যের সম্ভার দেখেছি, বিপ্লবীর প্রতি স্নেহ ও দরদের যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে দেখেছি, তার তুলনা নেই।···

অচেনাকে কি করে পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয়, পরিচিতকে কি করে তুলতে হয় অন্তরঙ্গ বন্ধু, অমলিন প্রীতি ও নীরবকুণ্ঠ সৌহার্দ্দ্যে কি করে বন্ধুকে করে তুলতে হয় আত্মীয়াধিক আপন, এর আর্ট কোনো শ্রম স্বীকার করে শিখতে হয়নি রাণীবৌদিকে। স্বতঃস্ফূর্ত নায়েগ্রার মতোই রাণীবৌদির মায়াপ্রবণ অন্তর থেকে অফুরন্তভাবে উৎসারিত হয়ে পড়তো বিপ্লবীর প্রতি নিরবচ্ছিন্ন দরদ!······

রাণীবৌদির মতো আত্মত্যাগিনী মহিয়সী নারী ও লক্ষ্মীস্বরূপিনী গৃহিণী আজো কোথাও দেখিনি আমি, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা স্বীকার করি। তাঁর সেই

ঘর-ফাটানো উচ্চ হাসির রেশ আজো যেন আমার কানে লেগে রয়েছে স্রোতস্বিনীর কলধ্বনির মতো।······

আত্রাই নদী তখন শীর্ণকায়া। হেঁটেই পার হয়ে বিলু ও আমি যখন বীরগঞ্জের রাস্তায় পড়লাম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই জানালার কাছে গিয়ে সাঙ্কেতিক শব্দ করতেই সত্যবাবু দরজা খুলে দিলেন। রাণীবৌদি এগিয়ে এলেন। যেমনি রাজরাণীর মতো চেহারা, তেমনি মিষ্টভাষিণী। সত্যবাবু সতর্ক করে দিলেন, তিনি যেন না হাসেন।

কারণ জেনেও জিজ্ঞেস করলাম : কারণ ?

সত্যবাবু জবাব দিলেন : কারণ ওঁর হাসি ইন্‌সপেক্টার আজিজুর রহমান পর্য্যন্ত শুনতে পান।

হাসতে গিয়ে নিজেই মুখে হাত চাপা দিলেন রাণীবৌদি।

কিন্তু সংবাদ যা পাওয়া গেল সত্যবাবুর কাছে, তা খুব আশাপ্রদ নয়। ঐদিনই সন্ধ্যার পর এসেছে এক ডাকাতি ও নরহত্যার সংবাদ। ইন্‌সপেক্টার আজিজুর রহমান বড় দারোগাসহ গেছেন সেখানে। একজন ডাকাতকে নাকি ধরে রেখেছে গ্রামবাসীরা, আর-একজনকে নাকি চিনতে পারা গেছে। সুতরাং থানায় খুব সোরগোল। সিপাইরা সবাই আসামীদের প্রতীক্ষা করছে। দরওয়াজা আর টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে নাক ডাকাবার অবসর পায়নি। টেবিলে বসে এল সি খাতাপত্তর লিখছেন। ডেটিনিউবাবুদের বাড়ীর পেছনেই প্রধান রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়েই আসবেন সদলবলে ইন্‌সপেক্টার আর আসামী। তবুও একবার গিয়েছিলেন সত্যবাবু বেড়াবার অছিলায়। কিন্তু আবহাওয়া খুব অনুকূল মনে হয়নি তাঁর।

কাজেকাজেই নিঃশব্দে ও নিশ্চিন্তে ডেটিনিউবাবুদের কোয়ার্টারে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ফিরেই যেতে হবে খানসামায় ব্যর্থকাম হয়ে।

কথায় কথায় প্রায় আড়াইটে হয়ে গেল। তাই আর কালবিলম্ব না করে উঠে পড়লাম।

রাণীবৌদি ছাড়লেন না, চা ও দু'খানা বিস্কুট খেতে হলো। বিদায় নেবার সময় খোলা দরজায় অন্ধকারে এসে দাঁড়ালেন।

বললাম : চলি রাণীবৌদি।

অকস্মাৎ তাঁর কণ্ঠে ভয়ের আভাস পেলাম : আপনি চলে এসেছেন এতদূর,

এর মধ্যে দারোগা যদি আপনার খোঁজে আপনাদের কোয়ার্টারে গিয়ে থাকেন ?

হেসে বললাম : ধরা পড়ে যাবো এবং এবার পরিতোষ গতবারের অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।

বিলুর পশ্চাতে এগিয়ে চললাম। আবার শোনা গেল রাণীবৌদির কণ্ঠ : আর একদিন তো আর আসতেও বলতে পারিনে। তার চাইতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলুন, গভর্নমেন্ট ছেড়ে দেবে আর এখানে আসতে পারবেন দিনের বেলাতেই খুকুকে নিয়ে জামাইয়ের মতো।

দেখা যাক্।—বলে দ্রুত রওনা হলাম।

তবু আব একবার বাধা পেলাম। রাণীবৌদি বললেন : আকাশে খুব মেঘ দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি যদি হয় ?

তাহলে ভিজতে হবে। কিন্তু তবুও আপনার এখানে ঘুমোবার উপায় নেই রাণীবৌদি।

তারপর এগিয়ে চললাম আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে। আমি জানি, যদি পেছনে ফিরে চাইতাম আর সেই নিবিড় অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যেত, তাহলে মুগ্ধ হয়ে দেখতে পারতাম বাংলার বিপ্লবীদের রোরুদ্যমানা মায়েদের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি, অপরিসীম ব্যথা ও বেদনার একটি সজল প্রতিচ্ছবি !……

মিথ্যে বলেননি রাণীবৌদি। একটু পরই মুষলধারে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। হাতে আমার বড় টর্চ্চ ছিল, নিবিড় অন্ধকারে প্রবল বর্ষণের মধ্যে তার আলো মনে হতে লাগলো জোনাকির চকমকি। একটু পরে বৃষ্টির জল ঢুকে তাও গেল নিবে। অথচ দেরী করবার উপায় নেই। রাস্তায়ই ভোর হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবো। তাই সেই আকাশ-ভাঙ্গা বর্ষণের মধ্যেই যত দ্রুত সম্ভব পা চালাতে লাগলাম।

একেবারে মেঠো সড়ক। কোথাও খোয়া বা ইটের নামগন্ধ নেই। শুধু যেখানে সড়কের নীচে দিয়ে জল নিষ্কাশনের ইটের তৈরী নালী, সেখানটাতেই পায়ের তলায় দু'চারটে খোয়ার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। তাছাড়া, একটানা মাটি। শুধু রক্ষা যে, মাটিতে বালির অংশই বেশী। বেলে মাটি না হয়ে যদি আঁঠালো মাটি হতো, তাহলে খানসামা পৌঁছুতে রীতিমতো রোদ উঠে যাবার ভয় ছিল। কিন্তু বেলে মাটি হলে কি হবে, গরুর গাড়ীর চাকার চাপে একেবারে

এবড়ো-থেবড়ো হয়ে আছে আর দু'ধারে গরুর গাড়ীর চাকায় তৈরী খাল। কতবার যে সেই খালের মধ্যে পা পড়তে লাগলো ঠিক নেই।

জুতো খুলে পকেটে ভরে নিয়েছি, হাঁটুর অনেক ওপরে কাপড় তুলে কষে বেঁধে নিয়েছি, তবুও কর্দ্দমাক্ত জল যেন মাথা পর্য্যন্ত উঠে এসেছে। পথ কোথাও এগিয়ে গেছে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে, কোথাও পথের ধারে ছোট ছোট ঝোপঝাপ, কোথাও-বা বিস্তৃত বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার নীচে দিয়ে তার গতি। এখানে এলেই মনে হয় যেন পাতালের অন্ধকারে প্রবেশ করেছি। দু'হাত সম্মুখে বিলুকে দেখা দূরের কথা, নিজের হাত পর্য্যন্ত ঠাওর করা যায় না। আমার অসহায় অবস্থা দেখে মাঝে মাঝেই সে হাত ধরে নিয়ে চলতে লাগলো।

বাতাস নেই এক ফোঁটাও, শুধু আকাশ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, মোটা ও ভারী বৃষ্টির ফোঁটাগুলি শরীরে রীতিমতো বিদ্ধ হতে লাগলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লাগলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম এত বর্ষণেও মেঘের স্তূপ আদৌ হালকা হচ্ছে না।

অর্থাৎ বর্ষণ চলবেই, চলবেই। আমরাও চলছি, শুধু চলছি। একটিমাত্র সড়ক, সুতরাং নিশানা হারিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত যে, এই প্রলয় রাত্রে পথে কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় নেই। আর শ্রীমান্ পরিতোষও শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় চাদর ভালো করে মুড়ি দিয়েই নাক ডাকাচ্ছেন, ডেটিনিউ বাবুদের বাসার প্রতি নজর হানবার উৎসাহ নেই।

বিশ্বচরাচরে তখন জাগ্রত বোধহয় শুধু আমরা দুটি দুঃসাহসিক পথিক!......

তথাপি সদর পথে আত্রাই নদী পার হবার ঝুঁকি নেওয়া সঙ্গত নয় বলে বিলু অন্য জায়গায় নিয়ে এল। সেখানে নদীতে গলা জল!...এপারে খানসামায় এসে যখন উঠলাম, পূবের আকাশ তখন ধূসর হয়ে উঠেছে!

ওদিকে আমরা আবার বিজয়গর্ব্বে খানসামায় ফিরে আসবার পর থেকেই পদাহত ফণীর মতো নিন্দুকের দল ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠলো। সাধুর কারখানা থেকে খানসামা বন্দরে বেরিয়ে আসতে লাগলো নিত্য নতুন রকমের নিন্দাবাদ ফোর্ড মোটরের মতো। অবস্থা এমনি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো যে, মনে হলো যে কোনো মুহূর্ত্তে একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। পান্নুয়া পাড়ার গাজী একদিন রাস্তায় ধরে শাসিয়েই দিল চিত্তবাবুকে। কিসের জন্য তার এই ক্রোধ, চিত্তবাবুর

এই সঙ্গত প্রশ্নের জবাবে পরিষ্কার বললো সে : স্বদেশী না চোর। ক্যামন করি হোই চোরের সাথ বহিনের বিয়া দেও, দেখি নিম্ হামরা !

যেন কত বড় একটা দুর্নীতির কাজ হতে চলেছে ওদের সমাজে, তাই সমাজ-হিতৈষীরা রুখে দাঁড়িয়েছেন শান্তি ও সুনীতির ধ্বজা উঁচু করে। অথচ ঐ ধুরন্ধর সমাজসেবীদের ক'জন করে সেবাদাসী আছে, সে সত্য আমাদের অজানা ছিল না। কিন্তু কুকুরের চীৎকারকে আমরা গ্রাহ্যই করা প্রয়োজন মনে করলাম না। তাও আবার ঘিয়ে-ভাজা কুকুর !……

কিন্তু ঠিক এমনি সময় কলকাতা থেকে এল মারাত্মক একটি সংবাদ ! মেজদা'র জরুরী তার পেলাম, Mother's Cholera. Start immediately !……কিন্তু বন্দীর তো স্বাধীনতা নেই। কেমন করে immediately রওনা হবো ? আমার টেলীগ্রাম প্রথমতঃ দেখবে পরিতোষ, তারপর দিনাজপুরে বাণেশ্বর, সেখান থেকে যাবে কলকাতায় আই বি অফিসে, তারপর হবে তদন্ত এবং সেই তদন্তের ওপর ভিত্তি করে যে হুকুম উচ্চারিত হবে, সেই হুকুম এমনি ঘুর-পথেই ফিরে যখন আমার হাতে এসে পৌছোবে, হয়তো তখন শ্রাদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমায় !……তথাপি জরুরী তার পাঠালাম দিনাজপুরে ও কলকাতায়।

স্বগৃহে অন্তরীণ থাকবার সময় হারিয়েছি বাবাকে, এবার গ্রামে অন্তরীণ থাকতে-থাকতেই কে জানে হয়তো মাকেও হারাতে হবে। একদিন মুক্তি আমি পাবোই। কিন্তু তার আগেই যদি মা বিদায় নিয়ে চলে যান, তাহলে আর আমার জন্য দুনিয়ায় রইলো কি ? যখনই মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি, তখনই দেখেছি তাঁর অশ্রুসজল মুখখানি, শুনেছি তাঁর ক্রন্দন-ভাঙা আশীর্ব্বাণী। কিন্তু মনে হচ্ছে, ওটুকু না দেখে না শুনেও বোধহয় থাকতে পারবো না আমি !…

দিন চারেক পর আবার এল মেজদা'র চরম টেলীগ্রাম : Mother expired yesterday. Need not come if not already started……না, যাত্রা তো করিনি আমি। আজো যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সরকারী হুকুমনামার। নির্দ্দয় নৃশংস বৃটিশ শাসনের কলঙ্কময় ইতিহাসে মানবীয় দুর্ব্বলতার দুর্ঘটনা কোথাও নেই। ইস্পাতে তৈরী তার কাঠামো, টাটা স্বরের বাঁধুনি ! অশ্রুজলের উত্তাল তরঙ্গ তাতে ঘা খেয়ে কিছু জলকণা শূন্যে বিকিরণ করে মাত্র, ইস্পাত তাতে ক্ষয়ে যায় না কখনো !……মানুষের অপেক্ষা আইনই তাদের চক্ষে বড়।

আইনের দাড়ি, কমা, সেমিকোলনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে তারা মানুষকে বলি দেয় হুকুমের যূপকাষ্ঠে নিরুপায় ছাগ-শিশুর মতো !

শান্ত চিত্তেই শ্রাদ্ধ করলাম এবং স্বয়ং তারকবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পুরোহিতের কাজ করে দিলেন। অনেকেই এসে জানিয়ে গেলেন সহানুভূতি এবং এই প্রথম মেয়েরা তাঁদের মা ও মাসী প্রভৃতি অভিভাবিকাদের সঙ্গে করে একেবারে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় রাজবন্দীদের বাসায় এসে আমায় সান্ত্বনা জানিয়ে গেলেন। পরিতোষকে গ্রাহ্য করলেন না তাঁরা।

কী যে হারালাম, তা শুধু আমিই জানি এবং মর্ম্ম দিয়ে জানি যে, পরোক্ষভাবে হলেও বাবা ও মায়ের মৃত্যুর অন্যতম কারণ আমিও বটে ! অবাধ্য হয়েছি চিরকাল, কোনোদিন কোনো ব্যক্তিগত অনুরোধ রেখেছি বলে মনে পড়ে না, বিপ্লবের রক্তরাঙ্গা পথে পা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে তুলেছি তাঁদের চিন্তা ও দুর্ভাবনা, কেড়ে নিয়েছি তাঁদের বিশ্রাম, তাঁদের চোখের নিদ্রা ! আমারই দৌরাত্ম্যে ঘুমুতে না পেরেই বুঝি তাঁরা অবশেষে ঘুমের দেশে চলে গেলেন আমায় চিরদিনের জন্য জাগিয়ে রেখে।......

আজও, এতকাল পরেও, মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে অকস্মাৎ মনে হয় কে যেন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অতন্দ্রনয়নে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে, কে যেন বসে আছেন শিয়রে চিরকালের সতর্ক প্রহরিণীর মতো, কার স্নেহসিঞ্চিত কোমল কর-পরশ আমার দুর্ভাবনায় উত্তপ্ত ললাটে বুলিয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনার তুহিন-শীতল পেলবতা। মনে হয় আমার দীর্ঘ জীবনের বন্ধুর চলার পথের পাশে পাশে আজো দেখতে পাই তাঁদেরই অদৃশ্য নিশানা, সম্মুখে নেমে-আসা জমাট অন্ধকারময় নিরাশার আকাশে আজো ধ্রুবতারার মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে তাঁদেরই অমর্ত্ত্যলোকের আশার প্রদীপ, মনে হয় আজো জীবন-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত সৈনিকের মতো রক্তাক্ত কলেবরে যদি কখনো ভূমি-শয্যা গ্রহণ করি, দূরাগত সাগরগর্জ্জনের মতো কানে ভেসে আসে তাঁদেরই বজ্রকণ্ঠ : ক্লৈব্যং মাস্মঃ গম পার্থঃ !

ঘুমের দেশে চলে গেলেও আজও বুঝি তাঁদের চোখে নেই মুহূর্ত্তের নিদ্রা, তিলেকের বিশ্রাম ! ঘরছাড়া দুরন্ত ছেলের জন্য বুঝি তাঁদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা নেই !......

চব্বিশ

মাস দুই পর একদিন সকালবেলা কুঞ্জলাল আগরওয়ালার ওখানে এসেছি ধুতি কিনতে, দেখি প্রমোদবাবু সেখানে বসে আছেন। কুঞ্জলাল বয়সে বেশ বড় হলেও চাটার্জ্জী ব্রাদার্সের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও পরম হিতৈষী। আর মারোয়াড়ী হলেও কুঞ্জলাল চালচলনে একেবারে বাঙ্গালী বন্‌ গিয়া বলা যায়।

হাসিপরিহাস অনেক হলো এবং পরে শ্রান্ত হয়ে কুঞ্জলাল হুকুম করলো: প্রমোদ, রসগোল্লা খাওয়াও। আমি দেখে এসেছি রঘু সবে এই একটু আগে গোল্লাগুলো রসে ছেড়েছে। গরম গরম রসগোল্লা ভারী উপাদেয়!

তৎক্ষণাৎ সায় দিলাম: আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

প্রমোদবাবু বললেন: তুমি মারোয়াড়ী, টাকার কুমীর। কথায় কথায় রসগোল্লা খাও, ছানা দিয়ে দাঁত মাজো। তোমার সঙ্গে কার তুলনা? আর আমরা হচ্ছি চুয়ান্ন টাকার হেডমাস্টার। তাও লিখি চুয়ান্ন, পাই বত্রিশ টাকা আট আনা। রসগোল্লা খাওয়ানো কি আমাদের সাজে?

বেশ, তাহলে দ্বিজেনবাবু খাওয়ান। —বলে কুঞ্জলাল আমার পানে চাইলো।

বিপদে পড়ে বললাম: উনি পান সাড়ে বত্রিশ ভাঙ্গা আর আমি পাই তারও কম, ত্রিশ টাকা। রস আমাদের থাকবে কোত্থেকে?

বেশ, তাহলে আমিই আনছি।—বলে হাঁক দিল কুঞ্জলাল পুত্রের উদ্দেশ্যে: ভানিয়া, ভানিয়া, যা তো রঘুর দোকানে, গরম গরম রসগোল্লা নিয়ে আয় তো সেরখানেক। কিন্তু প্রমোদ ঐ হাতেই খেতে হবে তোমায়।

প্রশ্ন করলাম: কেন, কোন্‌ হাতে আবার খাবেন?

প্রমোদবাবু বলে উঠলেন: হ্যাঁ, এই হাতে খাই আর যক্ষ্মা হয়ে মরি আর কি!

বিস্মিত হলাম: মানে?

মানে অতি সহজ। এই মাত্র এলাম সোনাহার থেকে। যে নেপালী দরওয়ানটা আমার সাইকেলখানা বার করে দিল, অনেকদিন থেকেই ব্যাটা খাঁশী রোগে ভুগছে। ওদের খাঁশী মানে আমাদের যক্ষ্মা। ব্যাটা হ্যাণ্ডেলের যেখানটায় ধরে বার করলো, আমিও সেখানটাতে ধরেই চালিয়ে এলাম। বলা তো যায় না ব্যাটার খাঁশীর germ—

বিস্ময় বেড়ে গেল : অ্যাঁ, বলেন কি ?

এবারে বললো কুঞ্জলাল : ও—জানেন না বুঝি ? প্রমোদ কোনো রেস্টুরেন্টে খায় না, রসগোল্লা ভালো করে ধুয়ে খায়, কারুর সিগারেট থেকে নিজের সিগারেট ধরায় না, ট্রেনে পাশে বসে কেউ একবার কাসলেই প্রমোদ বাড়ী এসে জামাকাপড় ধুয়ে চান করে ফেলে, আর—বলে হেসে উঠলো কুঞ্জলাল।

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে : আরও আছে নাকি ?

কুঞ্জলাল বললো : হ্যাঁ, আরও আছে। বৌ-এর পাশে শুয়ে ও মশারির বাইরে মুখ রেখে দেয় সারাটি রাত আর মশারা মজাসে ফলার চালায়।

বিশ্বাস হলো না। বললাম : যান, চাল মারবেন না।

চাল ?—বেশ, প্রমোদকেই জিজ্ঞেস করুন না।

তা রাখিই তো।—গর্ব্বভরে বললেন প্রমোদবাবু : নিঃশ্বাসগুলো হচ্ছে স্রেফ নাইট্রোজেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে যা অনুকূল নয়। দু'জনের নাকের নাইট্রোজেন মশারির মধ্যে জমতে থাকে সারাটি রাত। সারা রাত তাই টেনে টেনে স্বাস্থ্যটা নষ্ট করি আর কি ! তার চাইতে দু'চারটে মশার কামড়—

অনেক মিঠে।—বললো কুঞ্জলাল : ঐ যে কথায় বলে না, সাত বছর মাস্টারী করবার পর মাস্টারদের প্রয়োজন হয় ধোপাদের কাজে—

হাসাহাসি পড়ে গেল। এমন সময় ভানিয়ার হাতে এল গরম গরম রসগোল্লা। প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হলো। প্রমোদবাবু ভালো করে ডান হাতের কনুই পর্য্যন্ত বার বার ধুয়ে এবং মুখে জল দিয়ে বারকয়েক গার্গল করবার পর একখানা প্লেট তুলে নিলেন সাবধানে। পরমানন্দে রসগোল্লা দিয়ে ছোটাহাজরী শেষ করে বেরিয়ে যাবো, এমন সময় এল হাড়ীপাড়ার অন্যতম সর্দ্দার মংলা হাড়ী। জেল-সিপাইদের মতো একখানা কাঠের রোলার হাতে। সে এসে হেসে হেসে কুঞ্জলালের সঙ্গে লুঙ্গির দর নিয়ে আলোচনা শুরু করলো, আমি বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম একবার ডাক্তার অমর গুপ্তের ওখানে যাই কারমিনেটিভ মিকশ্চার আনতে।

পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ীর গলি পার হয়ে রঘুপদর দোকান ডাইনে রেখে যেই ভবেন সান্ন্যালের বাড়ীর দিকে মাত্র দু'পা বাড়িয়েছি, অমনি বন্দরে অকস্মাৎ ভারী হল্লা শোনা গেল। সন্দেহমনে ফিরে দাঁড়ালাম। মংলার হাতে কাঠের রোলারটা তখন ভালো লাগেনি।......

অকস্মাৎ দেখলাম গলির মুখে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন প্রমোদবাবু। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম তাঁর কপালে রক্ত আর সেই রক্তের ধারা নেমেছে সাদা পাঞ্জাবি বেয়ে। নিশ্চয়ই মংলা তার রোলার চালিয়েছে। কি করবো, কি করা উচিত, ভাবছিলাম এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে, এরই মধ্যে দেখি পানুয়া পাড়ার দিক থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছেন চিত্তবাবু, তাঁরও কপালে আঘাতের চিহ্ন! প্রমোদবাবুর পশ্চাতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে করতে চীৎকার করে বলে গেলেন: শীগগির থানায় চলে যান দ্বিজেনবাবু, পানুয়ারা নইলে আপনাকে রেহাই দেবে না।

দেখলাম, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একদিক থেকে মংলা হাড়ীর নেতৃত্বে একদল হাড়ী আর অপর দিক থেকে একদল যুবক পানুয়া লাঠিসোটা নিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে এসে চাটার্জ্জী বাড়ীর বন্ধ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চাটার্জ্জী পরিবারের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করতে লাগলো অশ্রাব্য গালিগালাজ আর শূন্যে আস্ফালন করতে লাগলো হাতের বিভিন্ন আকারের লাঠি ও মুগুর!

একটি মিনিট! তারপরই আমার শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটে উঠলো বেপরোয়া তাজা রক্ত, মাংসপেশীর মধ্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো মত্ত শক্তি, বিনয়ী ও নম্র দ্বিজেন গাঙ্গুলীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এক হিংস্র তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা জানোয়ার!··· তাহলে বারুদখানায় এবার কাঠি পড়েছে, বিস্ফোরণ তাহলে শুরু হয়ে গেছে, রক্তহোলীর মাহেন্দ্রক্ষণ তাহলে সমাগত! কী হবে তাহলে আর লোকদেখানো ভদ্রতার আবরণে? কেন তাহলে আর সঙ্কোচ? বে-আব্রুর মতো এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয় পলাশীর আম্রকুঞ্জে!

অনেক সয়েছি কিন্তু আর নয়। এবার এসেছে আঘাত ফিরিয়ে দেবার পালা। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! They must be paid in their own coins!

রঘুপদর দোকানের মধ্য দিয়ে সোজা এসে প্রবেশ করলাম বিলুদের বাড়ীর মধ্যে। বিরোধী দলের অপূর্ব্ব সান্ন্যাল তখন চা খাচ্ছিলেন দোকানে, ভ্রূক্ষেপ করলাম না তাঁকে। পড়ে রইলো পুলিশ সুপারের আদেশ, ছিঁড়ে ফেলে দিলাম সর্ব্ব গোপনতার আবরণ! প্রমোদবাবুর মা ছেলের ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছিলেন আর কাঁদছিলেন করুণ সুরে আর চিত্তবাবুর কপালে জলপটি লাগাচ্ছিল নিরুপমা। চিরগম্ভীর তারকবাবু উঠোনে একখানা জলচৌকিতে নীরবে বসে আছেন একেবারে পাথর হয়ে। ছুটোছুটি করছে ছোট ছেলেমেয়েরা। সারা বাড়ীতে

প্রত্যাসন্ন মহাবিপদের কালো ছায়া পড়েছে ! ভালো-মার মন্তব্য কানে এল : তুমি কেন বাবা এই বিপদের মধ্যে এলে ?

জবাব দিলাম না এই প্রশ্নের। কেন এলাম, তাই এবার ভালো করে টের পাইয়ে দিচ্ছি ঐ হাড়ীদের আর পান্নুয়াদের। বিলুকে ইসারা করতেই সে ঘর থেকে একখানা প্রকাণ্ড রামদা' এনে আমার হাতে তুলে দিল আর নিজেও তুলে নিল একখানা লোহার রড্। তারপর সোজা এগিয়ে এলাম দু'জন বৈঠকখানার দিকে।

চেগারের বড় গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে জনতা হল্লা করছে আর মাঝে মাঝে ঐ দরজার ওপর লাঠির আঘাত করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে।

বললাম বিলুকে : আমি এই গেটের সামনে অপেক্ষা করছি। দরজা ভেঙ্গে ওরা ঢুকে পড়লে আমার মনে হয় না একটি প্রাণীও বাড়ীর অন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারবে। তবুও তুমি বৈঠকখানার কোণে দাঁড়িয়ে থাক। যদি রামদা'য়ের ফলা থেকে কেউ ছিটকে যায়, তাহলে তোমার হাতে রড্ রইলো।

বিলু নীরবে এসে দাঁড়িয়ে গেল যথাস্থানে আর আমি সেই বিরাট রামদা'খানা নিয়ে গেটের সম্মুখে পায়চারি করতে লাগলাম।

ছুটে এলেন চিত্তবাবু, ছুটে এলেন প্রমোদবাবু, তাঁদের পশ্চাতে এলেন মা, ভালো-মা, নিরুপমা, বড় বৌ এবং স্পষ্ট দেখতে পেলাম বৈঠকখানায় শিশিরকণাও এসে পড়েছে নীরব আবেদন নিয়ে। সবারই মুখে এক কথা : আমাদের জন্য কেন আপনি এমনি বিপদ ঘাড়ে করছেন ? আপনাকে দেখতে পেলে ওরা আরো ক্ষেপে যাবে, হয়তো আপনার ওপরেও হাত তুলে বসবে। তার চাইতে থানায় খবর পাঠাচ্ছি—

বাধা দিয়ে বললাম : আপনারা সবাই বাড়ীর ভেতরে যান। আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে। তবে আমার মাথায় লাঠি চালাবার আগে ওদের ওপর রামদা' চালাতে কসুর হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বিশেষ কিছুই আর করতে হলো না। চেগারের ফাঁক দিয়ে নিশ্চয়ই ওরা দেখতে পেয়েছে আমায়। আমার হাতের অস্ত্রখানার তীক্ষ্ণতা মনে মনে কল্পনা করে বোধহয় ভালো লাগেনি। কুকুরের দল তাই কেঁউ কেঁউ করতে করতে একে একে সরে পড়লো।

কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই। ওরা কিছুদূর চলে যেতেই সটান সদর গেট খুলে দিলাম। প্রমোদবাবু ছুটে এসে আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরলেন : বাইরে যাবেন না দ্বিজেনবাবু, আমার কথা শুনুন—

আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। সাধুর ভক্তবৃন্দ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেছে, তার জবাব দিতে হবে in their own coins ! রামদা'খানা প্রমোদবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম : আপনার কপাল কেটে গেছে, জলপটি লাগান। আমি শুধু একবার দেখে আসি শালারা সত্যিই চলে যাচ্ছে কিনা।

বেরিয়ে পড়লাম একেবারে খালি হাতে। অকস্মাৎ দেখতে পেলাম ছুটতে ছুটতে আসছেন বিশ্বেশ্বরবাবু : এই মাত্র খবর পেলাম দ্বিজেনবাবু স্যানিটারী ভবানীবাবুর মারফত। কোন্‌দিকে গেল শালারা ?

ব্যস, পেয়ে গেছি এবার সহযোগীকে। দুনিয়াকে আর থোড়াই কেয়ার করি ! বললাম : চলুন এই দিকে।

তারপর একেবারে খালি হাতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আমরা দু'জন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম পানুয়া পাড়ার মধ্য দিয়ে, হাড়ীপাড়ার অপরিসর গলিতে গলিতে। গাজী ও গাঠিয়ার বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলাম, মংলা ও সীতা হাড়ীর বাড়ী ডাইনে রেখে এগিয়ে এলাম মহেন্দ্র মিত্রের বাসার কাছে। তারপর সোজা চললাম ভবেন সান্ন্যালের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে এবং প্রভাত চৌধুরীর গেট পার হয়ে এসে উপস্থিত হলাম সাধুর ভক্তবৃন্দের নেত্রী স্বয়ং শ্রীযুক্তা সীতা বিশ্বাসের দরজায়। তারপর সেখান থেকে এখানে-ওখানে ঘুরে অবশেষে এসে হাজির হলাম চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেনসারিতে। ডাক্তার অমর গুপ্ত বললেন : আমি ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে এসেছি প্রমোদকে। খুব বেশী গভীর হয়নি। কিন্তু দ্বিজেনবাবু, ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে এই বদমাশদের আর এদের পরামর্শদাতা সেই সাধুকে। নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে আপনারা—

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।—বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু : ওরা লাঠি চালাবে লাঠি চালাবার জন্যই, but we are out to murder ! তাই চাই আমাদের গায়ে ওরা হাত তুলুক and they will feel the music ! কিন্তু কোথায় একজনেরও দেখা পেলাম না সারা বন্দরে !

সারাটি দিন অনেক ঘোরাঘুরি করলাম আমরা। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, আমাদেরও আসরে নামতে দেখে ভয় পেয়ে গেছে সীতা বিশ্বাসের দল। এতটা

ওরা আশা করেনি। ভেবেছিল বিদেশে গ্রাম্য রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের কোনো উৎসাহ থাকবে না। কিন্তু সত্যিই যে বেরিয়ে পড়েছি আমরা দুটি সাঁজোয়া গাড়ীর মতো, তাই ভয়ে ও আতঙ্কে লাঠিয়ালরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে!...

কিন্তু সাধু! That scoundrel! বদনাম নির্ম্মাণ কারখানার সেই ভস্মমাখা মালিক? সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেরী হলো না, তাই শীঘ্রই একদিন গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি।

প্ল্যান আমাদের অত্যন্ত সহজ। সাধুর আশ্রমের বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে নিঃশব্দে আমরা প্রাঙ্গণের এক কোণে নামবো। আশ্রমের সীমান্ত দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ভক্তজনের জন্য, এবং তাঁর শয়নকক্ষের দ্বারও সারারাতই খোলা থাকে। প্রাঙ্গণে নির্ব্বাপিতপ্রায় কাঠের আগুন দিয়ে মধ্যরাত্রিতেও হয়তো কোনো কোনো ভক্ত ছোট কলিকার আসর জমিয়ে রাখে। তবে সাধু মনে করেন খানাসামা গ্রামে তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপন সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। অন্ততঃ মধ্যরাত্রিতে তাঁর নিদ্রার বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এমনি মতিচ্ছন্ন হতভাগা খানসামা গ্রামে একটিও নেই।

আমরাও বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাবো না তাঁর বিশ্রামের। তাঁর সুখনিদ্রার। কক্ষের উন্মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করতে গিয়ে মিথ্যে আওয়াজ সৃষ্টি করবো না। পশ্চাতের জানালা পথে বুনো বেড়ালের মতো প্রবেশ করে রামদা'য়ের একটি আঘাতে ওঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো। সুখনিদ্রা চিরনিদ্রায় রূপান্তরিত হবে মাত্র। কোনো গোলমাল হবে না। তারপর আবার বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কাজির বাগানের জঙ্গলে আমরা অদৃশ্য হয়ে যাবো। মহেন্দ্র মিত্রের বাড়ীর কোণে বিলুর হাতে অস্ত্রখানা দিয়ে আমরা ঘরে ফিরে এসে সুবোধ বালকের মতো নিদ্রা দেবো।

কিন্তু সাধুর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্য, সে রাতে কোন্ গ্রাম থেকে হঠাৎ এসে গেছে একদল কীর্ত্তনীয়া। এখানে-ওখানে জ্বলছে হারিকেন লণ্ঠন, চলছে বিচিত্র সুরে কীর্ত্তন আর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মাসনে নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট ভস্মমাখা সাধু। অবিরত গঞ্জিকা প্রসাদ করে দিচ্ছে ভক্তদের হাতে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম ঝোপের অন্তরালে কীর্ত্তন সমাপ্তির আশায়।

কিন্তু ভক্তবৃন্দের ভাবাবেগের যেন আর শেষ নেই। তাই ফিরে আসতে হলো ব্যর্থমনোরথ হয়ে। বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: ছাড়া হবে না, আবার আসতে হবে।

বললাম: অবশ্য।

কিন্তু আর যাওয়া হয়নি। যতই দিন যেতে লাগলো, ততই অনুভব করতে লাগলাম যেন চাকা ঘুরে যাচ্ছে। হাড়ী আর পান্নুয়ারা যতখানি উদ্দীপনা নিয়ে তারকবাবুর কন্যার বিবাহরূপ কেলেঙ্কারী ও দুর্নীতি রোধের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সেই উদ্দীপনায় মনে হলো ভাটা দেখা দিয়েছে। হয়তো সেদিন আমাদের দু'জনকে অমনিভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে ওরা ভয় পেয়েছে কিংবা হতে পারে, নিজেরাই উপলব্ধি করেছে যে, এতে অন্যায় কিছু নেই, অভিভাবকদের সঙ্গে পত্রযোগে আলাপ-আলোচনা করেই বিবাহ স্থির হচ্ছে।

দেখা গেল, গ্রামের মধ্যে যাদের ছোটলোক বলা হতো, যাদের ক্ষেপিয়ে তুলে সীতা বিশ্বাস ও তাঁর সংগ্রাম পরিষদের সভ্যগণ চাটার্জ্জী পরিবারকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার কাজে নেমেছিলেন সাধুর সর্ব্বাধিনায়কতায়, সেই নিরক্ষর, গোঁয়ার ছোটলোকেরাই ধীরে ধীরে করছে এ্যাবাউট টার্ন! আর তারা কাজির বাগানে যেতে চায় না, সাধুর প্রসাদকরা ছিলিমে তাদের আকর্ষণ কমে গেছে।

সীতা বিশ্বাসের অনুচরেরা অবশ্য তাদের আবার গরম করে তোলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু ফল হলো না কিছুই। চাটার্জ্জী বাড়ীর বিরোধী দলের সভ্যসংখ্যা ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে কমে যেতে লাগলো। শুধু কমলো নয়, তারা সীতা বিশ্বাসেরই বিরোধিতা করতে দ্বিধা বোধ করলো না। মোটের উপর উত্তাপ বেশ কমে এল। কমে এল বলেই কাজির বাগানের স্থগিত নৈশ অভিযান পরিচালনা করে শান্ত আবহাওয়ায় আবার বিস্ফোরণ ঘটাবার প্রয়োজন আমরা আর অনুভব করলাম না।

কিন্তু এই সময় একটি আশ্চর্য্য জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি। সেটা বর্ণনা না করে পারছি না।

গান্ধীজীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঐ হৃদয় দিয়ে হৃদয় জয় করবার নীতি কোনোদিনই সমর্থন করিনি আমি। কারণ সর্ব্ব অন্তর দিয়ে বিশ্বাস

করতাম যে, ওটা একটা নিছক থিওরি, গালভরা আধ্যাত্মিক বুলি। কিংবা ওটা পঙ্গুর বা সংগ্রামবিমুখের নিজের গায়ের চামড়া বাঁচাবার জন্য একটা ওজরমাত্র। ওটা অক্ষমতার সাফাই। কলসীর কাণা খেয়ে প্রেম বিতরণের কাহিনী এই বস্তুতন্ত্রবাদী যুগে কৌতুককর রূপকথা মাত্র! জগাই-মাধাই উদ্ধারের স্ট্র্যাটেজি এ যুগে অচল।......

কিন্তু সেই সময়, দিনাজপুর জেলার অজ্ঞাত ও অখ্যাত সেই খানসামা গ্রামে গান্ধীজীর ঐ ব্যর্থ নীতিরই যে সার্থক রূপায়ণ দেখেছিলাম, আজও তা ভুলতে পারিনি। সেই রূপায়ণে যিনি পরিপূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করেছিলেন, তিনিই চাটার্জ্জী পরিবারের কর্তা শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ঐ নীতি কি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন? সত্যাগ্রহীর মতো প্রতিপক্ষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে তোলবার জন্য তাঁকেও কি কোনো ডাণ্ডি অভিযান বা নোয়াখালী পরিক্রমা করতে হয়েছিল? হৃদয় দিয়ে হৃদয় জয় করবার মধ্যেও আছে প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও অধ্যবসায়। কিন্তু তাও করতে দেখিনি তাঁকে।

প্রমোদবাবু ও চিত্তবাবু নিগৃহীত হবার পর বহু শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ দিয়েছিলেন দুষ্কৃতকারীদের নামে থানায় ডায়েরী করতে, আদালতে নালিশ জানাতে। কেউ বলেছিলেন গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে এই মিথ্যাচার ও অত্যাচারের বিচার করতে। সালিশীর প্রস্তাবও করেছিলেন কেউ কেউ। কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী এসে বলেছিলেন স্কুল থেকে দীর্ঘ দিনের জন্য ছুটি নিতে। কারণ স্কুলটি গ্রামের বাইরে পানুয়াপাড়াতে যাবার সড়কের ধারে। সাবধান হয়ে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু তারকবাবু কোনো পরামর্শই গ্রহণ করেননি। সকালবেলা দেখেছি তাঁকে নিয়মিত টিউশনি করতে যেতে, তারপর বেলা দশটায় সেই গলাবন্ধ কোট গায়ে, ক্যানভাসের জুতো পায়ে দেখেছি এই প্রধান শিক্ষককে খানসামার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেতে। ফিরে এসে বৈঠকখানায় বসতেন, যাঁরা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন। কিন্তু অত্যন্ত স্বল্পভাষী। হাড়ী ও পানুয়ারা প্রকাশ্যে যেভাবে অত্যাচার করেছে, সীতা বিশ্বাসের চ্যালাচামুণ্ডারা সাধুর আশ্রম থেকে নিত্য নতুন বদনাম যেভাবে ছড়িয়ে চলেছে, আশ্চর্য্য, সে সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজে তো কোনো কথাই বলতেন না, কেউ সে প্রসঙ্গ তুললেও তিনি একেবারে নীরব থাকতেন। অপরের বক্তব্য বা সমালোচনা

অথবা পরামর্শ শুনতেন অটল গাম্ভীর্য্য নিয়ে। বলতেন না কিছুই। থানাতেও গেলেন না তিনি, ঠাকুরগাঁতেও নয়। মনে হচ্ছিল দুনিয়ায় কারুর বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ নেই তাঁর।

এই যে বিশাল হৃদয়, এই হৃদয়ের অমোঘ শক্তি অদৃশ্যভাবে সঞ্চারিত হচ্ছিল প্রতিপক্ষের অন্তরে। কোনো প্রচার নয়, কোনো প্রতিবাদ নয়, কোনো চোখ রাঙ্গানি, ধমক বা কোনো অনুরোধ-প্রার্থনা নয়, এমন কি, কোনো আলোচনাও নয়, অথচ স্পষ্ট দেখছিলাম আমি যে, সীতা বিশ্বাসের দম্ভের প্রাসাদের তলা ক্ষয়ে যাচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছে, ভূমিসাৎ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে অচিরেই।······

স্পষ্ট দেখতে লাগলাম যে, চাকা ঘুরছে, ঘুরছে এবার বিপরীত দিকে। কলকব্জা ঘুরিয়ে দেয়নি কেউ, কেউ গীয়ার টানেনি, কেউ হাত লাগায়নি! তবু ঘুরছে এবং ঘুরছে বিপরীত দিকে। প্রথমটা ধীরে ধীরে, যেন সঙ্কোচের সঙ্গে, তারপর বাড়তে লাগলো গতিবেগ, আরও জোরে, যতখানি এগিয়ে গিয়েছিল একদিন, পেছিয়ে এল তার চাইতে বেশী···তবুও চলছে, তবুও ঘুরছে, আরও জোরে, আরও জোরে, একেবারে বন্ বন্ করে······অবশেষে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে একদিন দেখতে পেলাম তারকবাবুর নিরস্ত্র হৃদয়ের কাছে পরাভূত ও পর্য্যুদস্ত সশস্ত্র পানুয়া ও হাড়ীপাড়ার দেওনিয়ারা অস্ত্রত্যাগ করে দল বেঁধে বাড়ীতে এসে একেবারে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো। আমরা অপরাধী, ক্ষমা চাই।······

তারকবাবু তৎক্ষণাৎ তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমরাও সাধুকে ক্ষমাই করে দিলাম।

অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়ালো যে, চাটার্জ্জী পরিবারের সবাই আবার প্রকাশ্যেই আমাদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন আর আমরাও প্রকাশ্যেই গ্রামের সবার বাড়ীতেই যাতায়াত শুরু করে দিলাম। পরিতোষকে কেউ আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। রবির কাছে খবর পাওয়া গেল যে, লেখনী তাঁর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি হয়ে উঠেছে এবং শীলমোহর-করা সরকারী খামের বপুটিও বেশ স্ফীতকায় হয়েই নিয়মিতভাবে দিনাজপুরে যাচ্ছে। যাকগে, আর আমরা কেয়ার করি না, গ্রামের লোকও আর কেয়ার করে না। হেসে, খেলে, জটলা করে বেশ আনন্দেই দিনগুলো গড়িয়ে যেতে লাগলো।

এমন সময় অকস্মাৎ একদিন সরকারী হুকুম এসে হাজির—দিনাজপুর

জেলারই হরিপুর থানায় স্থানান্তর। বোঝা গেল, পরিতোষ এরই জন্য আদা-নুন খেয়ে লেগেছিলেন আর আমাদের দু'জনের মধ্যে গভর্নমেণ্ট আমাকেই বেশী ঝঞ্ঝাটে মনে করেন। যাক, ভালোই হলো। স্থানান্তর তো আমরা চেয়েই ছিলাম এবং সেজন্য আইন পর্য্যন্ত ভঙ্গ করেছিলাম। এখন বিনা হাঙ্গামাতেই স্থানান্তর সম্ভব হওয়ায় খুশীই হলাম।

আমার অনুপস্থিতিতে চাকা উলটো দিকে আরও, আরও ঘুরে এক সময় পূর্ব্বেকার চালককেই হয়তো টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং সীতা বিশ্বাসের পাপ-পঙ্কিল দেহের অংশ যেখানেই গিয়ে ছিটকে পড়বে, সেখানেই তৈরী হবে এক-একটি নরক কুণ্ড! ফলে, চাটার্জ্জী পরিবারের মর্য্যাদা হবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

খানসামা গ্রামের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবহুল ইতিহাসের ঘটলো পরিসমাপ্তি! কে জানে, হরিপুর আমার জন্য আবার কি সাজিয়ে রেখেছে!……

ফস্ করে তারকবাবুর কথা মনে পড়লো। চরম উত্তেজনার ক্ষেত্রেও যাঁর স্থৈর্য দেখেছি অপরিসীম, আমার প্রতি যাঁর স্নেহ সহস্রধারায় উৎসারিত! তাঁর প্রশস্ত ললাটে কোনোও দুশ্চিন্তার আকুঞ্চন ফুটে না উঠলেও আমারই কর্ত্তব্য তাঁকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দেয়া। তাই, যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরবাবুকে বললাম: তারকবাবুর কাছে সংবাদ পাঠাবেন বিশ্বেশ্বরবাবু, তাঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো। I give my word and I shall keep it inspite of everything ····

বিশ্বেশ্বরবাবু আমায় জড়িয়ে ধরলেন আনন্দাতিশয্যে।

সেদিন '৯৩' সালের ২৮শে জুন।

পঁচিশ

রায়গঞ্জ রেলস্টেশন থেকে হরিপুর আঠারো মাইল। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা সেই গরুর গাড়ী।

হরিপুরেও দেখলাম একই সঙ্গে দু'জন রাজবন্দীর থাকবার ব্যবস্থা। খানসামায় মাঝখানে ছিল ছিটে বেড়ার পার্টিশন, এখানে ওসবের বালাই নেই। মেসের মতো একটি বৃহৎ কক্ষে সীট আমার আর অনিল সেনগুপ্তের। অনিল-বাবুর বাড়ী বরিশালের গৈলা গ্রামে। নিরীহ, গোবেচারা ও নেহাত ভালো মানুষ। বছর দুই রাজবন্দী করে রেখে বৃটিশ সরকার রাজস্বের অপব্যয় করছে মনে হলো।

এখানকার দারোগা আলাউদ্দীন এবং পরিতোষের মতো ইনিও অফিসিয়েটিং। যেমনি দীর্ঘকায়, তেমনি মেদবহুল শরীর। মধ্যাঙ্গে আবার তার প্রাচুর্য্য বিশ্রী-ভাবে প্রকট। ভোজনবিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তবে পরিতোষের মতো এঁর পরিতোষিণী-দালাল নেই আর গ্রামের কোথাও ইনি হস্ত প্রসারিত করেন না। মাঝে মাঝে থানার কাজে দিনাজপুর শহরে গেলে ইনি হয়তো সেই ফাঁকে এক রাত্রে নতুন আমদানী লখনৌয়ের সুন্দরী বাঈজীর একখানা ঠুংরী শুনে আসেন ও প্রেম নিবেদন করে আসেন তার অলক্তকরঞ্জিত শ্রীচরণ-কমলে। বাদশাহী চালে মাঝে মাঝেই ওঁর বাসায় খানাপিনা হয়ে থাকে বিরিয়ানী ও মোরগমসল্লম দিয়ে। স্যানিটারী মোজাহার আলীসহ আরও ক'জন আলী ও উদ্দীন টেবিল আলো করে বসেন। রাজবন্দীদেরও নিমন্ত্রণ করতে ভুল হয় না তাঁর। কারণ তাঁর ধারণা নবাবী খানার জলুস দেখিয়েই তিনি রাজবন্দীদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারলে ওরা সমঝে চলবে তাঁকে।

এখানকার জমাদারের নাম অখিল চক্রবর্ত্তী। খুব ভালো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে জানেন। কেন যে এই ভদ্রলোক স্বাধীন ব্যবসা শুরু না করে পুলিশের মতো ঘৃণ্য বিভাগে প্রবেশ করেছেন, তা তিনিই জানেন। গ্রামের অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি, যা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মনোজ দত্ত সাধ্যাতীত বলে ছেড়ে চলে আসতেন, দেখতাম এবং দেখে বিস্মিত হতাম অখিলবাবু তা নিরাময় করে তুলতেন তাঁর ঐ হোমিওপ্যাথিক স্বাদহীন, বর্ণহীন জলজলে

ওষুধ দিয়ে। খুব অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি এবং তাঁর গৃহিণীও। খানসামার উত্তেজনাকর রণক্ষেত্র থেকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম একটি নিরালা শান্তিনীড় দূরবর্ত্তী শিবিরে এসে! অন্ততঃ প্রথমটা তাই মনে হলো।

হরিপুরের কমলালয় স্টোর্স হচ্ছে মন্মথ জোয়ারদারের দোকান। মনিহারী দ্রব্য প্রায় সবই কিছু কিছু পাওয়া যায়, যদিও যাচাই করে পছন্দ করে নেবার মতো স্টক্ নেই জোয়ারদারের। এই ভদ্রলোকটিও খুব নিরীহ ও সৎ। রাজবন্দীদের আড্ডা দেবার স্থান হচ্ছে জোয়ারদার এ্যাণ্ড কোম্পানীর এই দোকানটি। কোম্পানী নামেই। দোকানে তিনিই একমেবোদ্বিতীয়ম্ আর বাড়ীর মধ্যেও তিনি আর ইকমিক কুকার। কুকার গৃহিণীর কাজ করে থাকে।

এখানে দু'জন জমিদার—রবীন্দ্রলাল রায়চৌধুরী আর গিরিজাভূষণ রায়-চৌধুরী। দু'জন দু'তরফ কিনা, তা আজ আর মনে নেই। তবে দু'জনের জমিদারীই কি কারণে জানিনে, গেছে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর অধীনে। তাই হরিপুরে খোলা হয়েছে ওয়ার্ডস্-এর বিরাট অফিস, অফিসে অনেক কর্ম্মচারী, চারিদিকে তাঁদের বাসা ও মেস। জোয়ারদারের দোকানেই পরিচয় হয়ে গেল গিরিজাবাবুর সঙ্গে। বেশ আমুদে ও অমায়িক ব্যক্তি। জমিদারের বিরাট বপুর মধ্যে হৃদয়টিও বিশাল। রাজ্যের ইংরেজী ও বাংলা বই কেনেন আর পড়েন, তারপর লাইব্রেরী ঘরের কাঁচের আলমারিতে বন্দী করে রাখেন যাবজ্জীবন। হ্যাঁ, যাবজ্জীবনই বটে, কারণ সেই বই তিনি কাউকে পড়বার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেন না। বলেন, আমার ফ্রি রিডিং রুম, বসে বসে পড়, যত খুশী।

আমিও পড়তাম। সারাটা দিনই প্রায় সেখানেই কেটে যেত। গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আর তেমন করে মেশবার চেষ্টা করতাম না। খানসামার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলিনি।

গিরিজাবাবু একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর ওয়ার্ডস অফিসে। দেখলাম, বহু ভদ্রলোক কাজ করছেন। আমার বয়সী, আমার চাইতে বড় ও আমার চাইতে ছোটও আছেন। গিরিজাবাবু এক-এক করে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে অফিস কক্ষের একপ্রান্তে একটি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন: আর ইনি হচ্ছেন শ্রীসতীশ গুপ্ত, দিনাজপুর শহরের বালুবাড়ীর

আলেকজাণ্ডার ! ওঁকে চেনে না, এমনি লোক তো পরের কথা, এক কণা বালুও নেই বালুবাড়ীতে। দেখতে ক্ষুদ্র, কিন্তু সর্ব্ব বৃহৎ ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রগণ্য—

ভালো হচ্ছে না কিন্তু গিরিজা দা'। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সতীশ গুপ্ত এবং সস্মিতমুখে দুই করতল সংযুক্ত করলেন।

মিথ্যে বলেননি গিরিজাবাবু, সতীশ গুপ্তের উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। রং কালো, মানে বেশ কালো, রোগা শরীর। কিন্তু অত্যন্ত ঘন চুলে ঘন তরঙ্গ। বোঝা গেল, উনি কেশের পরিচর্য্যা করেন এবং সদ্য পাট-ভাঙ্গা চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি দেখে জানা গেল—পোশাকেরও। কিন্তু ওকি, কণ্ঠে মালার মতো পরেছেন কালো একটি ফিতে এবং তার একটি প্রান্ত বুকের ঘড়ির পকেটে প্রবিষ্ট। বিস্মিত হলাম। কিন্তু গিরিজাবাবু বোধহয় টের পেয়ে গেছেন। তাই কিছু বলবার আগেই রহস্য ভেদ করে দিলেন: ওটা ঘড়ি, মানে পকেট ওয়াচ। আর গলায় দেখছেন, ওটা চেইনের পরিবর্ত্তে কার্ নয়, একেবারে আধ ইঞ্চি চওড়া ফিতে। বলবেন, ওটা সেকেলে? বলুন গে, থোড়াই কেয়ার করে সতীশ গুপ্ত। পকেট ঘড়ি আর কালো ফিতে সে এতকাল পরেছে, পরবেও। সতীশ গুপ্ত মানেই চুল আর ঘড়ি এবং ঘড়ি আর চুল মানেই সতীশ গুপ্ত অব্ বালুবাড়ী।

বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন: খানসামার চাটার্জ্জী পরিবারের সবাইকে খুব ভালো করে চেনে। নীরদবাবু তো সতীশের বন্ধু বললেই হয়। আর, এবার কণ্ঠস্বরে ঘোষকের দৃঢ়তা দিয়ে বললেন: সতীশ গুপ্ত শুধু আলেকজাণ্ডার নয়, দিনাজপুরের শিশির ভাদুড়ী !

আবার সেই হাসি।

এর পর সতীশ গুপ্ত আর সতীশবাবুতে আটকে রইলেন না, স্বচ্ছন্দে সতীশে নেমে এলেন। আপনিও কবে উবে গিয়ে তুমি হয়ে দেখা দিল।

দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে আমার সতীশের ওখানে। অফিসে গল্প আর তার মেসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা। সতীশের সঙ্গে বন্ধুত্বটা অকস্মাৎ, যেন কতকটা অজ্ঞানতেই, একেবারে নিবিড় হয়ে উঠলো। ওর কি কি আমার ভাল লেগেছিল আর আমার মধ্যেই ভালো লাগার মতো কি কি পেয়েছিল

সতীশ, তা আজও মনে করতে পারিনে! কিন্তু মনে আছে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলতে যা বোঝায়, হরিপুরে একমাত্র সতীশই ছিল তাই।

গুটিকয়েক সহকর্ম্মি নিয়ে ওরা মেস করেছে। ক্রমে ক্রমে সবার সঙ্গেই হৃদ্যতা হয়ে গেল বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই বসতাম সতীশের ঘরে। সতীশের রং কালো ও রোগা শরীর হলে কি হবে, অত্যন্ত শৌখীন সে। বেশ গোছানো-গাছানো ছিমছাম তার ঘরখানা। যেখানকার যা, সেখানেই ঠিক তা আছে। দামী স্নো, পাউডার, ক্রিম, সুদৃশ্য বড় দেয়াল-আরশি, চিরুনি শুধু নয়, ব্রাশ ও তার পাশে, সুগন্ধি তেল শ্যাম্পু। ব্র্যাকেটে ঝুলছে আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো মিহি সুতোর ধুতি। দরজার ওপর বেশ বড় মুইর তোয়ালে।

অনেক কথা বলে না সে। বোধহয় একটু সিরিয়াস টাইপের ছেলে। হাসে বেশ, হাসির কথাও বলে, কিন্তু সে হাসির কোনো শব্দ নেই রাজবন্দীদের সঙ্গে স্বভাবতঃই তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার আপন করে নেবার গুণে এবং সে বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে ওঠে তার অমায়িক ব্যবহারে ও অকপট সৌজন্যে। আমারও সে বন্ধু হয়ে উঠলো এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠলো। অনেক পরে অবশ্য স্বীকার করেছে সে যে, আমার আগেকার রাজবন্দীরা বন্ধু হয়ে গেলেও স্থানান্তরিত হবার পর out of sight, out of mind হয়ে গেছেন, শুধু আমাকেই নাকি সে দোষ দেয়া যায় না। ভুলিনি এবং সতীশকে ভুলে যাবার সুযোগ দিইনি।...

তবে একটা কথা পরিষ্কার বলা দরকার যে, সতীশ গুপ্ত আমার কোনো রাজনৈতিক বন্ধু নয়, আমার একান্ত ব্যক্তিগত বন্ধু। একেবারে ইয়ার বলা যায়, অবশ্য সতীশ যদি আপত্তি না করে।

সতীশ একদিন নিয়ে গেল আর একজন সহকর্ম্মী সতীশ গুহের বাড়ীতে। তাঁর বারো বছরের কন্যা রুবিকে সতীশ ডাকতো মা বলে, তাই সে আমারও মা হয়ে গেল। রুবি মা। রুবি মায়ের চেহারাটা আজো মনে পড়ে। চমৎকার স্বাস্থ্য আর মিষ্টি তার মুখখানি। একটু বাড়ন্ত বলে শাড়ি পরতে হতো তাকে। কিন্তু স্বভাবটি শাড়ির আবরণে আদৌ ঢাকা পড়েনি। ঝাকড়া চুল দুলিয়ে প্রায়ই সে ছুটোছুটি করতো পোষা খরগোশটির সঙ্গে। আর মায়েরই মতো কথায় কথায় শাসন চালাতো সতীশ ও আমার ওপর।

ভেবেছিলাম হরিপুরের দিনগুলি ভালোই কাটবে। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা গেল আলাউদ্দীন পরিতোষের উলটো পিঠ। নবাবী থানার নমুনাতে যখন

রাজবন্দীদের ওপর মোড়লিটা কায়েম হলো না, তখন হাতে তুলে নিলেন আলাউদ্দীন তাঁর লেখনীর অস্ত্র! সাপ্তাহিক কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে উত্তাল হয়ে উঠলো রাজবন্দীদের নয়, শুধু আমারই অকথ্য নিন্দা। জোয়ারদার, সতীশ গুপ্ত, সতীশ গুহ এবং জমিদার গিরিজাবাবুরও নাম প্রেরিত হলো বাগেশ্বরের কাছে। এখানেও রিপোর্টের রিপোর্ট পেতে আমার বেগ পেতে হলো না অখিলবাবুর মারফত। আসতেন তিনি গভীর রাত্রে। বিরাট থানা কম্পাউণ্ডের এক প্রান্ত থেকে থানার পেছন দিয়ে অপর প্রান্তে আমাদের বাড়ীতে এসে প্রবেশ করতেন নিঃশব্দে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, খানসামার মতো এখানেও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করতে হবে। পরিতোষের মতো মূর্খ নন আলাউদ্দীন, তাই মুখে তাঁর সর্ব্বদাই লেগে থাকতো অমায়িক হাসি। বাইরের খোলসটা তাঁর ভদ্রতা ও সহৃদয়তার চুমকিতে চকচক করতো। কিন্তু রিপোর্ট পাঠাবার সময় ঐ মেদবহুল গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে ঝিকিমিকি করে উঠতো ক্রূর বীভৎসতার রক্তাক্ত দ্যুতি!……

অখিলবাবুর মুখে শুনে আমিও প্রকাশ্যেই শুরু করলাম লিখতে দিনাজপুরের পুলিশ সুপারের কাছে যে, থানার অফিসার ইন চার্জ্জের অভদ্র ব্যবহার সহ্যের সীমারেখা পেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হয় আমাকে স্থানান্তরিত করা হোক, নইলে আমার পথ আমিই বেছে নেবো। মজা হচ্ছে আমার দরখাস্তগুলো নিয়ম অনুযায়ী খোলা অবস্থাতেই দিতে হতো দারোগা সাহেবের হাতে এবং দারোগা সাহেবকে নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়ম অনুযায়ী আবার তা পাঠাতে হতো যথাস্থানে। তাই শুরু হয়ে গেল লেখার লড়াই। কিন্তু আলাউদ্দীন যেবার রুবি মার সঙ্গে আমার ও সতীশের একটা অবৈধ সম্পর্কের কথা লিখে পাঠালেন দিনাজপুরে, সেবারই ওখান থেকে এসে পড়লেন ইনসপেক্টার অন্নদা প্রসাদ ঘোষ সরজমিন তদন্তের জন্য।

আমায় এসে জিজ্ঞেস করলেন: দারোগার সঙ্গে আপনার ঝগড়ার কারণ কি বলে মনে হয় আপনার?

বললাম।

সতীশ গুপ্ত আপনার বন্ধু?

বললাম।

রুবি নামে মেয়েটিকে আপনারা মা বলে ডাকেন? ওর বয়স কত?

বললাম : হ্যাঁ ডাকি। বয়স ওর বছর বারো হতে পারে।

খানসামার তারকবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে?

বললাম : হ্যাঁ।

অন্নদাবাবু বললেন : খুব ভালো। বিয়ে করে ফেলুন। বীরগঞ্জে আমি ছিলাম। ঐ পরিবারের সবাইকে আমি চিনি। তারকবাবুর মতো সাধু ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। খুকুকেও জানি, চমৎকার মেয়ে। বিয়ে করে ফেলুন, তাহলেই স্ত্রী নিয়ে বাস করবার জন্য আপনাকে যেখানে ফ্যামিলি কোয়ার্টার আছে, সেখানে transfer করবে।

জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তু আলাউদ্দীন সাহেব কী সব অভিযোগ করেছেন, তা তো কিছুই বললেন না আমায়?

হেসে জবাব দিলেন অন্নদাবাবু : ওটা স্কাউণ্ড্রেল। রাজবন্দীদের চেনে না। কলমে যা এসেছে, তাই লিখে পাঠিয়েছে। আমি যাই, ওকে সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অন্নদাবাবু চলে গেলেন এবং হরিপুর থেকে যাবার পূর্ব্বে আলাউদ্দীনকে যা বলে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন, তা সেদিনই গভীর রাত্রে জানতে পারা গেল অখিলবাবুর মুখে। একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন অন্নদাবাবু : দারোগা সাহেব, মাসে মাসে এতগুলো টাকা খরচা করে গভর্নমেন্ট এই রাজবন্দীদের আটকে রেখেছেন বোকার মতো মনে করবেন না। মারাত্মক লোক ওঁরা। বেশী ঘাটালে একদিন আপনার ঐ ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে কবর দিয়ে দেবে আপনাকে, বুঝলেন?

কি বুঝলেন আলাউদ্দীন জানিনে, তবে জানতে পারলাম তিনি হলাহল সিঞ্চন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছেন!······

শীত পড়ে গেছে। কার্ত্তিকের শেষাশেষি। অনিলবাবু অনেকগুলো গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন বাড়ীর মধ্যে, তাতে অনেক ফুল ফুটেছে। অফিসের বালাই নেই, নেই কোনো কাজের তাড়া; তাই ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চাদরখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে ভারী ভালো লাগে। চাকর নেই। তাই জানিই তো, উঠে আবার দৌড়ুতে হবে সতীশ গুপ্তের ওখানে প্রাতরাশ সেরে নেবার জন্য।

অনিলবাবু পেটরোগা মানুষ, তাই আখের গুড় ও কাগজী লেবুর রসমিশ্রিত চিড়ের সরবৎ-ই হচ্ছে তাঁর পোচ, টোস্ট ও কফি !

চাটার্জ্জী পরিবারকে ঘিরে খানসামা গ্রামে যা হয়ে গেছে, তা মনে পড়ে দুঃখ হলেও ভেবেছিলাম হরিপুর গ্রামে শান্তিতেই কাটাতে পারবো। তাই, এখানে এসে বেশ সতর্কতার সঙ্গেই চলাফেরা করছিলাম। কিন্তু কি কুক্ষণে গিরিজাবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন আলেকজাণ্ডার এ্যাণ্ড শিশির ভাদুড়ী অব বালুবাড়ী সতীশ গুপ্তের সঙ্গে, ব্যস সব সতর্কতা আমার মুহূর্ত্তে উবে গেল কর্পূরের মতো। মাথায় লাইম জুসচর্চ্চিত তরঙ্গ তুলে ও গলায় কালো ফিতের মালা দুলিয়ে সতীশ নিয়ে হাজির করলো আমায় তার নেম-সেক-এর বাড়ীতে, তার রুবি মায়ের কাছে। ছোট্ট একটি মা পেলাম বটে, কিন্তু হারালাম আলাউদ্দীনের নবাবী ডিস, মোরগমসল্লম আর বিরিয়ানী। গাণ্ডীবের মতো ফাউণ্টেন পেন তুলে নিলেন তিনি।

ভালো লাগছিল না। আবার সেই অশান্তি। অন্নদাবাবু যতই ধমকে যান দারোগাকে, দারোগার সম্মান যে বৃটিশ সরকারের প্রেস্টিজ ! অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে at any cost !

অকস্মাৎ কানে ভেসে এল হালকা গানের একটি কলি, তাও আবার নারীকণ্ঠে। আধেক শোনা গেল, আধেক শোনা গেল না—শুধু গুনগুন। মৌমাছির মতো। স্বপ্ন দেখছি না তো?—না, রীতিমতো জেগে আছি। অনিলবাবুর নাসিকা অবশ্য সেই রাত এগারোটা থেকেই একটানা সুরে গর্জ্জন করে চলেছে। কিন্তু গুনগুনের সঙ্গে আবার টকটক শব্দও শুনতে পাচ্ছি ! নিশ্চয়ই কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে আমাদের বাড়ীতে এবং অনিলবাবুর সাধের গাঁদা ফুলগুলি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গানের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে ফুলের বোঁটা ছেঁড়ার শব্দ।

সুতরাং এক লাফে উঠে পড়লাম শয্যা ছেড়ে এবং দ্বিতীয় লাফে বারান্দায় এসে দেখি—কি দেখলাম আজও মনে আছে তা। বলছি।

হলুদ রংয়ের গাঁদা ফুলের বনে টকটকে লাল রংয়ের শাড়ি-পরা একটি মেয়ে। চিনি না, জানি না, কোথাও দেখেছি বলেও মনে করতে পারলাম না। কিন্তু এখন দেখলাম, ভালো করে দেখলাম। হ্যাংলাপানা গড়ন, মুখখানা লম্বাটে ধরনের, পিঠের ওপর দোদুল্যমান দীর্ঘ বেণী, তার মাথায় গোটাকয়েক গাঁদা ফুল

বাঁধা। বয়স পনেরোর বেশী হতেই পারে না। ফ্রক পরলেও চলতো।— না, চলতো না। কারণ শরীর পুষ্ট, অতিরিক্ত রকম বাড়ন্ত। রেখাগুলো লজ্জাহীনভাবে তীক্ষ্ণ, শাড়ির আবরণ সে তীক্ষ্ণতাকে চেপে রাখতে পারেনি। ঐ শরীরে ফ্রক বড্ড বেমানান হবে।

আমার দিকে একটি চকিত দৃষ্টি ও মুচকি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটি দিব্যি ফুল তুলতে লাগলো নির্ভয়ে। যেন তার নিজের বাগান আর আমিই ওখানে অবাঞ্ছিত। কিন্তু ওমনি বে-আইনী উদাসীনতায় আমি ভুলবো কেন? জিজ্ঞেস করলাম: ফুল তুলছো যে?

বললো: দরকার আছে। আজ বেস্পতিবার, তাই।

বললাম: লক্ষ্মীপুজা বলে আমাদের ফুলগুলো নিয়ে যাবে?

জবাব দিল: পুজো হয়ে গেলে পেসাদ দিয়ে যাবো'খন।

সত্যিই রাগ হলো: পেসাদ আমরা খেতে চাই না, সুতরাং ফুলও তুলো না। অনেক কষ্ট করে লাগিয়েছেন অনিলবাবু, তোমার নিয়ে যাবার জন্য নয়। কিন্তু তুমি বাড়ীর মধ্যে এলে কি করে? সদর দরজা বন্ধ ছিল, বন্ধই তো রয়েছে দেখছি।

এইবার মেয়েটি তাকালো, হেসে বললো: বেড়া ডিঙিয়ে লাফিয়ে এসেছি।

বিরক্ত হলাম। ভারী ডেঁপো মেয়ে তো! দেখলাম, সদর দিয়ে আসেনি, এসেছে খিড়কির দরজা দিয়ে। দরজাটা তখনো খোলা। তবু ভালো। সদর দিয়ে আসতে গেলে দূরের কোয়ার্টার্স থেকে আলাউদ্দীনের নজরকে ফাঁকি দেয়া যেত কিনা সন্দেহ। তাহলেই হতো আর এক কাণ্ড! রুবি মাকে নিয়েই হুলুস্থুল চলছে, তারপর আবার······বললাম: অন্যায় করেছ। তোমায় আমরা চিনিনে, জানিনে—

বাধা দিল মেয়েটি: আমি কিন্তু আপনাকে চিনি, জানি। মন্মথ কাকার দোকানে সর্ব্বদাই যান আপনি আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে। সতীশদা' আপনার বন্ধু। আর এ-ও জানি, আপনার বিয়ে হবে—

অ্যাঁ! বলে কি মেয়েটা! এত খবর ও কোথায় পেল? জিজ্ঞেস করলাম: কোন্‌টা তোমাদের বাড়ী? কোথায় পেলে আমার বিয়ের খবর? সতীশ তোমাদের বাড়ীতে যায় নাকি? তার মুখেই শুনেছ কি?

হাতের ফুলের সাজি দুলিয়ে ও মাথার বেণী দুলিয়ে এবার এগিয়ে এল মেয়েটি।

মুচকি হাসলো। এমনি দুষ্টু হাসি যেন ও ওর সমবয়সী কোনো ছেলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। আবার একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে মারলো, তারপর অনর্থক শাড়িটা একটু টেনে দিল, তারপর কিউটেক্সরঞ্জিত পায়ের আঙুলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললো: ঠিকই বলেছেন সতীশদা' জানিস চামেলী, দ্বিজেনকে বলিস ওর বিয়ের কথা, দেখিস ও ক্ষেপে যাবে।

বিস্ময় আমার উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। যেন এক অলিখিত উপন্যাসের নায়ক হয়ে পড়ছি আমি নিজের অজ্ঞাতে। চেগারের ওপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। না, নবাব আলাউদ্দীন তখনো খোয়াব দেখছেন। আর আমাদের ঘরের মধ্যেও চলছে একটানা নাসিকা গর্জ্জন। কার্ত্তিকের এই ঠাণ্ডা ভোরে শুধু চামেলী ও আমি। শাড়ি পরবার বিশেষ কৌশল ও কথা বলবার বিশেষ ধরন দেখে বেশ বুঝতে পারলাম, শহরের হাওয়া এই গণ্ডগ্রামেও এসে অনুপ্রবেশ করেছে!

বললাম: তুমি দেখছি আমার নামও জেনে নিয়েছ। কোন্ বাড়ী তোমাদের?

তারপর জানা গেল সব। হরিদাস সেনগুপ্তের কন্যা চামেলী সেনগুপ্তা। গিরিজাবাবুর বাড়ীর রাস্তায় মোড়ের ওপর প্রকাণ্ড বটগাছটার নীচে হরিদাস-বাবুর বাড়ী। হরিদাসবাবু মারা গেছেন অনেক কাল, বিধবা স্ত্রী যূথিকা ও চামেলীকে বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হন।

জোয়ারদার এই কথাটাই একদিন সাহস করে পাড়লেন আমার কাছে। অনিলবাবু নাকি ওঁদের পালটি ঘর, তাঁকে পছন্দও হয়েছে সবার। যূথিকারও এতে অমত নেই। আমারই মতো যদি অনিলবাবু—

ব্যস, আমি একটা নজীর সৃষ্টি করে ফেললাম দেখছি। খানসামায় আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, হরিপুরে অনিলবাবুর বিবাহও স্থির করে ফেলবো? ক্ষতি কিছুই দেখলাম না। আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যদি একটি বিধবার একটি কন্যা উদ্ধার হয়ে যায়, যাক না! অনিলবাবুর কাছে কথাটা পাড়তেই সহসা রাজী হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর দেশের বাড়ীতে জোয়ারদারকে দিয়ে প্রথমে ও পরে একেবারে হরিদাস সেনগুপ্তের স্ত্রীকে দিয়েই লেখানো হলো। রাজী হয়ে গেলেন অনিলবাবুর অভিভাবক। তবে স্থির হলো, অনিলবাবুর মুক্তির পর বিয়ে হবে। ব্যস, আমারই মতো অনিলবাবু অন্তরীণ হয়ে সুদূর এক গ্রামে

এসে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন! যূথিকার মনের কথাও জানা গেল চামেলী মারফত। চামেলীকে এবার আর পায় কে? আমাদের বাড়ীতে তার ফুলতোলার কাজটা আর বৃহস্পতিবারের জন্য আটকে থাকলো না। প্রথম দিনেই সে আমায় কেয়ার করেনি, এবার সে রীতিমতো ঠাট্টা করা শুরু করলো জামাইবাবুর বন্ধু হিসেবে। পনেরো বছরের শরীরে যেমন বিশ বছরের বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল বেমানানভাবে, তেমনি তার হাসিঠাট্টার ভাষা ও ভঙ্গী একেবারে পঁচিশ বছরের মহিলাকেও মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে যেতে লাগলো। অথচ আশ্চর্য্য, অনিলবাবু তখনো তার জামাইবাবুতে রূপান্তরিত হননি। কবে হতে পারবেন, তাও নির্ভর করছে সরকার বাহাদুরের মর্জ্জির ওপর। সে মর্জ্জির পরও আছে স্বয়ং অনিলবাবুর মতিগতি। আমি খানসামায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি এবং মর্ম্মে মর্ম্মে জানি, সে প্রতিশ্রুতি রাখবোই অবশ্য যদি না তারকবাবু মত বদলান। কিন্তু মুক্তি পেয়ে উত্তরবঙ্গ ছেড়ে সেই সুদূর দক্ষিণ-বঙ্গে বরিশালের গ্রামে ফিরে যাবার পর অনিলবাবু প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য আবার উজান ঠেলে এতদুর ফিরে আসবেন কিনা, বলা কঠিন। ভদ্রলোক নিরীহ ভালোমানুষ, গোবেচারা গোছের। আমার অনুরোধে ও বিধবা মহিলাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধারের সাধু প্রস্তাবে তিনি রাজী হয়েছেন বটে এবং তাঁর আত্মীয়েরাও অনুমোদন করেছেন। তথাপি বরিশালে নেমে যাবার পর আবার এতখানি চড়াই পথে কষ্ট করে আসবেন কি?

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত সব অনিশ্চয়তার বাষ্প এক ফুৎকারে যেন উড়িয়ে দিল চামেলীরাণী। কথা হয়েছে মানেই যেন বিয়ে হয়ে গেছে আর আমি তার জামাইবাবুর বন্ধু বনে গেছি! তাই থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে অবস্থিত রাজবন্দীদের সংরক্ষিত কোয়ার্টার্স যখন-তখন এই অনূঢ়া কিশোরীর আনন্দ-কলরবে ও হাসি-ঠাট্টায় মুখরিত হয়ে উঠতে লাগলো।......

সম্রাট আলাউদ্দীন গুপ্তচরমুখে অবশ্যই সংবাদ পাচ্ছিলেন। কিন্তু অখিলবাবুর মারফত সংবাদ পেলাম যে, ছাহেব চিড়িয়াখানার শের-এর মতো শুধু দাঁতমুখই খিঁচোচ্ছেন থানায় বসে বসে। রুবি-মা ঘটিত ব্যাপারে ইনসপেক্টার অন্নদাবাবুর ব্যবহৃত বিশেষণগুলো স্মরণ করে আর সাহস পাচ্ছেন না কলম ধরতে!......

হরিপুরে মাছ খুব কমই পাওয়া যেত। স্থানীয় মাছের আমদানী এত কম

ছিল যে, বাজারেই তা নামতে পারতো না। পথে পথেই শেষ হয়ে যেত। আর চালানী মাছ যা আসতো, তাও বিস্বাদ লাগতো। কত দিন আগেকার ধরা মাছ কে জানে। সুতরাং ডিমের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হতো। তারপর পেটরোগা অনিলবাবু মাঝে মাঝেই উপবাস করতেন বা চিড়ে খেতেন। একা আমার জন্য আর চাকর রাখলাম না আমরা। কোনোদিন জমিদার গিরিজাবাবুর বাড়ীতেও পাতা পাততে হতো। মন্মথ জোয়ারদার মাঝে মাঝেই তাঁর কুকারে অভিনব প্রথায় রান্নাকরা মাংসের ঝোল খাইয়ে দিতেন। তারপর সতীশ গুপ্তের মেসে ও সতীশ গুহের বাড়ীতে ছিল অবারিত রান্নাঘর। নেহাত আমাদের এখানে রান্না চাপাতে হলেও ঐ ডাল আর ভাত পর্য্যন্তই। অখিলবাবুর স্ত্রীও পাঠিয়ে দিতেন নানা ব্যঞ্জন দারোগার নজরকে ফাঁকি দিয়ে। অর্থাৎ রান্নার ব্যাপারটা এখানে প্রায় বর্জ্জন করেই চলছিলাম।

এমন সময় অকস্মাৎ এক হাটের দিন বিকেলে অনিলবাবু প্রায় দেড় সের ওজনের একটি ইলিশ মাছ এনে হাজির করলেন। সগর্ব্বে বললেন: চার টাকা সের চেয়েছিল, সাড়ে তিন করে এনেছি। ফার্স্ট ক্লাস মাছ, সোজা গোয়ালন্দ থেকে এখানে এসেছে। দেখুন দ্বিজেনবাবু, কি সাইজ আর কি শেপ, আর রংটা দেখছেন, যেন খাঁটি রূপো—

কিন্তু দক্ষিণা লাগলো ক'খানা রূপো? হেসে প্রশ্ন করলাম।

পাঁচ খানা, সগর্ব্বেই জবাব দিলেন তিনি: তা হোক, এদেশে এমনি জিনিস কখনো আসেনি আর কখনো আসবে বলে কেউ মনেও করেন না। তাই দেখতে দেখতে ব্যাটার এক বাক্স মাছ উড়ে গেল, বুঝলেন? ভাগ্যিস, একখানা ধরে ফেলেছিলাম—

বললাম: কিন্তু দেড় সের মাছ—দু'জন লোক—

কেন, বাধা দিয়ে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করে দিলেন অনিলবাবু! আরে মশাই, চার পাঁচ দিন বসে বসে খাবো। ইলিশ মাছ যার নাম, বাসি বাসি তস্য বাসি হলেও যার স্বাদ ও গন্ধ থাকে একেবারে অক্ষুণ্ণ। সাত দিন হয়ে গেলেও যা পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে ঝুরি-ভাজা করে মজাসে চালানো যায়।

তবুও দ্বিধা প্রকাশ করলাম: কিন্তু আমাদের রান্নাঘরে তো প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে আছে। উনুন আছে বটে, কিন্তু কোথায় কাঠ? তারপর হাঁড়িকড়াগুলো

সব নোঙরা ময়লা হয়ে পড়ে আছে। মসলা কোথায়? তেল? নুন? মসলা বাটবার শিলখানা আছে বটে, কিন্তু নোড়া?

ব্যস, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন অনিলবাবু। দুঃখ-ভাঙ্গা স্বরে বললেন: তাহলে এটা অখিলবাবুর বাড়ীতেই পাঠিয়ে দেয়া যাক, বলে পাঠাই আমাদের দিন তিনেক দু'বেলা চারখানা করে মাছের টুকরো দিলেই হবে। কি বলেন?

বলে মাছটা বারান্দার বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধতে লাগলেন অনিলবাবু। আমি বললাম: না, না, সেটা ঠিক হবে না। মাছ দিয়ে আবার ভাগ চাওয়া ভালো দেখাবে না। তার চাইতে জোয়ারদারের ওখানে ফিস্ট লাগালে কেমন হয়?

এ প্রস্তাব আবার তাঁর মনঃপুত হলো না: না মশাই, জোয়ারদারের কুকারে ইলিশ রান্না ভালো হবে না। আর রান্নার উনি কি জানেন? খান তো আলু সেদ্ধ আর ভাত! তার চাইতে এক কাজ করা যাক, আপনার বন্ধু সতীশবাবুর মেসে পাঠিয়ে দিই—

এ প্রস্তাব আবার আমার মনঃপুত হলো না। বললাম: মেসে? বলেন কি! তাহলে আর ভাগ পেতে হবে না। যদি সর্ব্বসত্ব ত্যাগ করে দান করতে পারেন, তাহলে চলুন, মেসে দান করে আসি।

তাহলে কি করা যায়? আমার প্রস্তাব অনিলবাবুর মনঃপুত হচ্ছে না, আবার ওঁর প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারছি না। বারান্দায় দোদুল্যমান ইলিশ মাছটিকে সম্মুখে রেখে দুটি চেয়ারে বসে পড়লাম আমরা গবেষণা করতে, কিভাবে মাছটির সদ্গতি করা যেতে পারে! শুধু জোয়ারদার, অখিলবাবু ও সতীশ গুপ্তের ওখানে কেন, গিরিজাবাবু, সতীশ গুহ, এমন কি সম্রাট আলাউদ্দীনের ওঁখানেও দেবার প্রস্তাব যথারীতি উঠলো ও যথারীতি বাতিল হয়ে গেল। অনেক চিন্তা করে অবশেষে যখন আমি চামেলীদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলাম, অনিলবাবু তখন একেবারে ফায়ার হয়ে উঠলেন: পাগল হয়েছেন নাকি?

সুতরাং অনেক মাথা ঘামিয়ে ও অনেক সময় ব্যয় করে যখন কোনো সিদ্ধান্তেই পৌছুতে পারলাম না আমরা, তখন অনিলবাবু সহসা বলে উঠলেন: কারুকে দিতে হবে না, কারুর বাড়ী পাঠাতে হবে না। কেন, আমরা কি অথর্ব্ব নাকি? ইংরেজ মারতে পারি, আর মাছ কাটতে রাঁধতে পারবো না?—

আলবৎ পারবো, একশোবার পারবো। আপনি মাছটা কাটুন, আমি তেল, মসলা ও রান্না করবার কাঠ কিনে আনছি। ফার্স্ট ক্লাস চাল ও মুগের ডাল নিয়ে আসছি, আজ খিচুড়ি, মাছভাজা, মাছের ঝাল ও ভাঁপানো মাছ রান্না হবে।

বলেই সোজা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ শব্দ শোনা গেল, ম্যাঁ-এ্যা-ওঁ—

থমকে দাঁড়ালেন অনিলবাবু, আমিও চমকে উঠলাম। বারান্দার অদূরে অর্দ্ধ-খোলা সদর দরজা দিয়ে উঁকি মারছেন একটি নধরকান্তি মার্জ্জাররাণী। সে লুব্ধ দৃষ্টি আমাদের প্রতি নয়, বাঁশে দোদুল্যমান ইলিশরাণীর প্রতি। ইলিশের কস্তুরী গন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে আলাউদ্দীনের গৃহেও তা'হলে পৌঁছে গেছে, তাই গন্ধাহুতের মতো এসে আবির্ভূত হয়েছেন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি!

খড়ম ছুঁড়ে মারলেন অনিলবাবু: দেখবেন দ্বিজেনবাবু, সাবধান! আলাউদ্দীনের নাতনী এসে গেছে গন্ধে গন্ধে।

অনিলবাবু বেরিয়ে যাবার পর বসলাম আমি বটি নিয়ে। বাড়ীতে অন্তরীণ থাকাকালে সামান্য সেফটি ক্ষুরের ব্লেড দিয়েই কেটে ফেলেছি গোটা ইলিশ মাছ, সুতরাং বটি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে আদৌ দেরী হলো না। সত্যিই চমৎকার মাছটি! সদর দরজা ভেজিয়ে দেবার ফলে বিড়ালটা আর বাড়ীতে ঢুকতে পারেনি সত্য, কিন্তু চেগারের বাইরে ঘন ঘন তার আকুতি শুনতে লাগলাম, ম্যাঁ-এ্যা-ওঁ······

অনিলবাবু ফিরে এলেন এবং সমস্ত আয়োজন করে নিয়ে আধঘন্টার মধ্যেই খিচুড়ির হাড়ি চড়িয়ে দিলাম। কাঠ দিয়ে রান্না, সুতরাং, বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। বসে বসে কাঠ ঠেলতে লাগলাম। ঢাকনিটা তুলে অনিলবাবু বললেন: দেখেছেন, এক রত্তি ডিম নেই আর পেটির মাছের গায়ে গায়ে চর্ব্বি জমে আছে। বেশ বড় সাইজ করেই কেটেছেন। ভালোই করেছেন। খাবো তো দু'জনে, তার আবার কুটি কুটি করবার দরকার কি? আচ্ছা দ্বিজেনবাবু, আপনি কণ্ঠার কাঁটাটা ভালোবাসেন, না ল্যাজটা?

দুটোই। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম: ইলিশ মাছের সবটাই চমৎকার।

অনিলবাবু বলতে লাগলেন: কণ্ঠার কাঁটা মাছটাতে এত কাঁটা যে আমি সামলাতে পারি না, ল্যাজে বরং কম। তবে হ্যাঁ, যদি কড়া করে ভাজেন,

তাহলে কণ্ঠার কাঁটাও চালাতে পারি। আপনি মাথাটা ঝোলে ভালোবাসেন, না ভাজা ?

মাথা দিয়ে তরকারি ভালো হয়। জবাব দিলাম।

খিচুড়িটা নামাতেই অনিলবাবু বলে উঠলেন: যা গন্ধ ছেড়েছে মশাই, ক্ষিদেটা যেন বড্ড জোর চাড়া দিয়ে উঠছে। রান্নায় যে আপনি আলাউদ্দীনের বেগমকেও হার মানাতে পারেন, তা বেশ বুঝতে পারছি। চাকুরে মেয়েকে বিয়ে করে সুবিধেই হবে আপনার। কখনো তিনি, আবার তিনি চাকুরিতে বেরিয়ে গেলে আপনি, রান্নাঘরের জন্য আর বাড়তি লোক লাগবে না।—একটু থেমে সহসা আবেদন জানালেন তিনি: আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় দ্বিজেনবাবু, আজকের রাত্রের মেনুটা একটু সংক্ষেপ করুন না। রাত করে খুব বেশী হাঙ্গামা না করে ঝাল, ঝোল, ভাঁপানো, টক ইত্যাদি সবই কাল দিনের জন্য মুলতুবী রাখুন না, আজ শুধু ক'খানা ভাজা দিয়েই চলুক আমাদের কালকের ভুরিভোজের প্রস্তাবনা। কি বলেন ?

আপত্তি জানালাম: খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা বেস্ট, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে ক'খানা যদি ঝালে ও ভাঁপানো পাওয়া যায়, তাহলে একেবারে মারভেলাস হবে। আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন। নইলে যান, ঘরে গিয়ে একখানা বই-টই খুলে বসুন।

স্পষ্ট স্বীকার করলেন তিনি: হ্যাঁ মশাই, ভালো কথাই বলছেন, এমনি খিচুড়ির গন্ধ ছেড়ে ও-ঘরে যাই আর কি! খিচুড়ির গন্ধেই প্রায় নেশা লেগে গেছে, এর পর ইলিশ মাছ যেই তেলে ছেড়ে দেবেন, তখন না পাগল হয়ে যাই। বই-টই তখন চুলোয় যাবে। তার চাইতে যা বললাম, তাই করুন না দ্বিজেনবাবু —অনিলবাবু সকাতর অনুরোধ জানিয়ে ফেললেন: আপনি না-হয় কালকের জন্য শুধু পেটের কেন, সব মাছগুলোই রেখে দিন ঢেকে, আজ শুধু ল্যাজ ও পিঠের মাছ ভাজা হোক। এত ক্ষিদে পেয়ে গেছে যে, আর দেরী সইছে না—

তবুও একবার আপত্তি জানালাম: কিন্তু আপনি জানেন না অনিলবাবু, পিঠের মাছের ঝাল যা হয়—

বাধা দিলেন: তাহলে এক কাজ করা যাক না কেন, আজ শুধু কণ্ঠার মাছ, ল্যাজ, মাথা ও কাঁটাকুটো বেশ কড়া করে ভেজে খিচুড়ি সহযোগে চালানো যাক, কাল দিনের বেলায় একেবারে ষোড়শোপচারের আয়োজন করা যাবে—

দি আইডিয়া! উত্তম প্রস্তাব। ক্ষিদে আমারও বেশ পেয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনিলবাবুর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। রান্নার কেরামতি এই পেট-রোগা ভদ্রলোককে আর কি দেখাবো! কাল বরং সতীশকে বলবো'খন হুস্ করে এক ফাঁকে এসে খেয়ে যেতে আর চামেলীরাণীকেও একটু টেস্ট করিয়ে দোব, যাতে তার দিদিকে আমার এই মেয়েদের ফেলকরানো রান্নার কেরামতির কথাটা জানিয়ে দিতে পারে। জোয়ারদার তো কুকারেই সারাজীবন চালাচ্ছেন, কাল না-হয় সেখানেই বয়ে নিয়ে যাবো কতকটা, তারপর ওখানে গিরিজাবাবু, সতীশ গুহ, ডাঃ মনোজ দত্ত ও আরো ক'জনকে খবর দিয়ে আনিয়ে বৈকালিক চায়ের আসরটা খাসা জমানো যাবে। জমাদার অখিলবাবুকেও বলে দোব এক ফাঁকে ঢুঁ মেরে আসতে।

তাই স্থির হয়ে গেল। সে রাত্রে খিচুড়ি ইলিশ মাছের কাঁটাকুটো ভাজা সহযোগেই পরম পরিতোষ সহকারে শেষ করলাম। তারপর প্রায় সবগুলো মাছের টুকরোই সামান্য ভেজে কড়াইশুদ্ধ নির্ব্বাপিত উনুনের ওপর বসিয়ে প্রথমে একখানা থালা, তার ওপর একটা ঝুড়ি এবং তারও ওপর দু'খানা ইট বসিয়ে দিলাম। অনিলবাবু বললেন: যাক, আজ তো বেশ হলোই, কাল আরো বেশ হবে।

ঘরে ফিরে এসে অনেক রাত পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনা চললো আগামী কালের ভোজনপর্ব্বটা কিভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অভূতপূর্ব্ব করে তোলা যায়। হরিপুর গ্রামে সুধীজন ও ভোজনরসিক সমাজকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।......

ভোরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল অনিলবাবুর চেঁচামেচিতে। এত ভোরে তো তিনি কোনোদিন ওঠেন না, বিশেষ করে, শীতকালে। কি হলো আজ?

ধড়মড় করে উঠে বসতেই অনিলবাবু রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে একেবারে ধপাস করে আমার পাশে বসে পড়লেন।

জিজ্ঞেস করলাম: কি হলো?

শিরে করাঘাত করে বলে উঠলেন অনিলবাবু: আর কি হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে! গিয়ে দেখুন রান্নাঘরে, ইট ফেলে, ঝুড়ি উলটে দিয়ে সেই ব্যাটা বিড়াল সবগুলো মাছ—

অ্যাঁ, বলেন কি! ত্রিং করে লাফিয়ে উঠলাম, তারপর এই শীতের কথা বেমালুম হয়ে খালি গায়েই ছুটে গেলাম রান্নাঘরে মরিয়া হয়ে। চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। পাথরের চোখের মতো পলকহীন হয়ে রইলো। তারপর বেরিয়ে এল গোটাকয়েক দীর্ঘশ্বাস!

বুক ভেঙ্গে গেছে। ঝাল, ঝোল, ভাঁপানো, টক সমস্ত প্ল্যান ফেঁসে গেছে। কালকের ভূরিভোজন, বৈকালিক চা-চক্র, কেরামতি দেখাবার সমস্ত পরিকল্পনা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। আমরা খেয়েছি শুধু কণ্ঠা ও ল্যাজা আর পরস্বাপহারী দস্যু খেয়েছে সব। আমাদের বুক ভেঙ্গে দিয়েছে!

অনিলবাবু সহসা চীৎকার করে উঠলেন: শালা আলাউদ্দীনের আদুরে বিড়াল!

হাসবো, না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না।······

হক মন্ত্রিসভা তখন অন্যতম মন্ত্রী সৈয়দ নওসের আলীর বিশেষ উদ্যোগে বাংলার রাজবন্দীদের ধীরে ধীরে মুক্তি দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন। দু'একদিন পরপরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় একশো জন মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত রাজবন্দীর নাম। সরকারী হুকুমনামা এসে পড়ে দিন সাতেকের মধ্যেই।

উগ্র উৎসাহ নিয়ে অনিলবাবু প্রত্যহই যান ডাঃ মনোজ দত্তের ওখানে এবং প্রত্যহই ফিরে আসেন হতাশ হয়ে, তারপর ফোস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন: নাঃ দ্বিজেনবাবু, আপনারও নাম নেই, আমারও নেই।

আমি তৎক্ষণাৎ প্রবোধ দিই: ঘাবড়াবেন না, এগারো শো ছাড়া হবে। চান্স এখনো যায়নি।

তারপরই আবার স্মরণ করিয়ে দিই: কিন্তু সাবধান, বিয়ে করবেন বলে যে কথা দিয়েছেন, তা কিন্তু রাখবেন। আমিও কথা দিয়েছি, আমিও তা রাখবো। রাজবন্দীদের কথা যেন নড়চড় না হয়।

নিশ্চয়ই হবে না।—জোর দিয়ে বলেন অনিলবাবু।

অকস্মাৎ একদিন কলকাতা থেকে মেজদা'র চিঠি পেলাম ২৬শে অগ্রহায়ণ আমার বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। তারকবাবু ও মেজদা' দু'জনেই সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছেন আমায় ছুটি দেবার জন্য।

ক্ষেপে গেলেন অনিলবাবু। এই আনন্দের সন্দেশ বিতরণের জন্য ছুটোছুটি করলেন সারা হরিপুর গ্রামে। ২৬শে অগ্রহায়ণ মানে ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭ সাল।

১০ই ডিসেম্বর দুপুরবেলা বারান্দায় দু'জন খেতে বসেছি, এমন সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দূরে দু'জন সশস্ত্র সিপাই আসছে থানার দিকে। আর যায় কোথা! খাওয়া ফেলেই উঠে পড়লেন অনিলবাবু, ছুটে গেলেন থানায় এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে একেবারে কলরব করে উঠলেন : এসে গেছে দ্বিজেনবাবু, সরকারী হুকুম এসে গেছে।—Your transfer order to the house of Mr. Tarakeswar Chatterjee of Khansama…এখনই রওনা হতে হবে। ফজলুল হকের বিবেচনা আছে, কি বলেন ?

হেসে জবাব দিলাম : হবে না কেন, বরিশালের যে! তবে গৈলা নয় কিন্তু, চাখার। সেটা ভুলবেন না।

বিকেলবেলাই রওনা হলাম মালপত্র সব নিয়ে। বিয়ের পরে এখানে নাও ফিরে আসতে পারি, তাই গিরিজাবাবু, জোয়ারদার, সতীশ গুপ্ত, সতীশ গুহ, অখিলবাবু সবাই জানালেন অভিনন্দন। রুবি মা অভিমান করে বললো : এবার মাকে আর মনে পড়বে না।

বললাম : শুধু ছেলে নয়, এবার ছেলের বৌ-ও আসবে তোমার কাছে।

যদি তোমায় এখানে আর না পাঠায় ?—জিজ্ঞেস করলো রুবি মা।

বললাম : একদিন তো ছাড়া পাবো। তোমার সাথে দেখা করবোই রুবি মা।

চামেলী বললো : এবার আপনার বাড়ীর সব ফুল তুলে নিয়ে আসবো।

সেই সঙ্গে জামাইবাবুকেও।—বলে হাসলাম।

সত্যি, একবার বেড়িয়ে যাবেন হরিপুরে ছাড়া পাবার পর, কেমন ?

কথা দিলাম : আসবো।

কথা দিচ্ছেন তো ?—চামেলীর কণ্ঠে বিপুল আগ্রহ।

দিচ্ছি।

আবার সেই আঠারো মাইল। ট্যাঙস ট্যাঙস করে চলেছে গরুর গাড়ী। সারারাত চলবে। সেই ভোরে পৌঁছুবে রায়গঞ্জ স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন।

বেশ শীত পড়ে গেছে। পড়বেই। ডিসেম্বরের অপরাহ্ন। একটু পরেই

চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কথা বলবার কেউ নেই। বাহে গাড়োয়ান বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায় গরু দুটোকে কি সব বলছে। নীরবে গরুদুটো বোধহয় তার নির্দ্দেশ পালন করে এগিয়ে চলেছে। পেছনের গাড়ীখানাও অন্ধকার। তবুও ওটাতে আমার মালপত্রের সঙ্গে আছে দু'জন সশস্ত্র সিপাই ও একজন আই বি-র সহ-দারোগা। তাদের কথাবার্ত্তার মৃদু গুঞ্জন মাঝে মাঝে কানে আসছে।

বিয়ে করতে চলেছি আমি। যে বিয়ে দেবার জন্য মা-বাবা এত চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায়? বাবার ইচ্ছে ছিল আমার বৌ দেখে যাবেন, মার আশা ছিল আমার বৌ এসে তাঁর সেবা করবে। কিন্তু তাঁদের সে ইচ্ছা, সে আশা পূরণ করতে পারিনি আমি। বাদ্যভাণ্ড-মুখরিত আলো ঝলমল শোভাযাত্রায় যে উৎফুল্ল বরযাত্রী দলের যোগদানের কথা, আজ তারা কোথায়? কোথায়ই-বা আমার দেশ, কোথায় আমার পরিজন? অন্ধকার অজানা পথে শম্বুক গতিতে চলমান এক গরুর গাড়ীর অন্ধকার ছইয়ের মধ্যে লেপের নীচের অন্ধকারে প্রসারিত দেহ একক পড়ে রয়েছি আমি আগামী পরশুর বর। সে বাড়ীতে নিশ্চয়ই অন্ধকার নেই, অনেক আলো জ্বলে উঠেছে, আত্মীয়-বন্ধু প্রতিবেশীর আনন্দকলরবে মুখর হয়ে উঠেছে বিয়ে বাড়ী, হয়তো অনেক আশা, অনেক রঙীন পরিকল্পনা নিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে বিয়ের কনে। সে যখন দেখবে এসেছি আমি একা, একাই নামছি অন্ধকার ছইয়ের নীচে থেকে, জানিনা কি প্রতিক্রিয়া হবে তার মনে! সে কি বেদনার আঘাতে মুষড়ে পড়বে, না শির উঁচু করে এগিয়ে আসবে অন্তরে এই মহাসত্য উপলব্ধি করে যে, দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্বে কোনো বিপ্লবীর জীবনেই খুশীর দেয়ালী জ্বলতে পারে না?······

ছাব্বিশ

১১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এসে নামলাম আবার সেই দারোয়ানী স্টেশনে। চেপে বসলাম আবার সেই গরুর গাড়ীতে। আবার চললো গরুর গাড়ী শম্বুকের মতো।

এবার চলেছি বরবেশে। রাজবন্দী বর, তাই বরযাত্রী দু'জন সশস্ত্র সিপাই আর আই বি-র জনৈক সহ-দারোগা। বরবেশে নয়, মনে হলো চলেছি বিজয়ীর বেশে। খানসামার নিন্দুকের দলের মুখে এবার ছাই পড়লো, গালে লেপিত হলো চুন আর কালি! মাস্টারমশাইয়ের কন্যার সঙ্গে চোরের বিবাহ ভেঙ্গে দিয়ে যারা সমাজসেবার জলন্ত আদর্শ স্থাপন করবার জন্য নিসপিস করছিলো, সেই সীতা বিশ্বাসের শাগরেদদের এবার মাথা কাটা গেল। চোর আজ চলেছে বিজয়ী বরের বেশে! একবার কথা দিলে রাজবন্দী যে সে কথার আর খেলাপ করে না, এবার আর একবার তার পরিচয় পাবে হিংসুটের দল। আনন্দে রোমাঞ্চ জাগছিল শরীরে এই ভেবে যে, অবশেষে ওয়াটারলু-তে একেবারে ভূপাতিত করে ফেলতে পেরেছি দিগ্বিজয়ী ভস্মমাখা সাধুকে!······

আবারও মার কথা মনে পড়লো। বড় আশা ছিল আমার মায়ের, আমি বিয়ে করবো, আমার স্ত্রী এসে করবেন তাঁর সেবা, রোগজর্জ্জর ললাটের উত্তাপে বুলিয়ে দেবেন সান্ত্বনার শীতল পরশ, সুখী হবেন মা ছায়ার মতো তাঁর পাশে একটি সেবিকাকে পেয়ে। আজ চলেছি আমি সেই সেবিকাকে আনতে, কিন্তু মা কোথায়? সেবিকা এসে কার সেবা করবে? আমার মুখের কথা আদায় করে নিয়ে কোথায় তিনি পালিয়ে গেলেন চিরদিনের তরে?······

সংবাদ আগেই পাঠানো হয়েছিল মন্মথ জোয়ারদারকে দিয়ে একখানা টেলিগ্রাম করিয়ে। ডাকবাংলোর কাছাকাছি আসতেই তাই দূরে তারকবাবুর বাড়ীর সম্মুখে প্রচুর ডে-লাইটের আলো দেখতে পাওয়া গেল।

ডাক্তারখানা এসে পড়তেই আমি কিন্তু নেমে পড়লাম। আই বি-র বাবু ও সিপাইরা যাবে থানায়। বলে দিলাম ওদের যেতে। আমার গাড়ীখানাকেও বলে দিলাম সোজা তারকবাবুর বাড়ী নিয়ে যেতে। আমি এটুকু রাস্তা পায়ে

হেঁটেই যাবো। বিজিত দেশের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটেই যাবো বিজয়ী হিটলারের মতো!

ডাক্তার অমর গুপ্তের বাসায় উঠলাম। ডাক্তারবাবু আমায় একেবারে দু'হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন: হ্যাঁ, একেই বলে বীর! সমস্ত নিন্দা, কুৎসা, শত্রুতা, বিরোধ—সব কিছু দলে পিষে আপনি এসেছেন বিজয়ীর বেশে। এই তো চাই!—যান, গিয়ে দেখবেন আজ সব হাঙ্গামা চুকে গেছে। বিরোধীরা সব আজ তারকবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন: বার বার বলেছি আমি খুকুর মাকে, রাজবন্দী কখনও কথার নড়চড় করে না। আজ আমার কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

ওঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাংলা মদের দোকানের সম্মুখে আসতেই স্বয়ং অপূর্ব্ব সান্ন্যালের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

আরে মশাই, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! খুঁজেই পাচ্ছি না আপনাকে। ওদিকে জামাইকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাড়ীর মেয়েরা বরণ ডালা নিয়ে এসে দেখে একটা গাড়ী তো একেবারেই খালি, আর একখানায় দুটো সিপাই বসে কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছে—চলুন, শীগগির চলুন।

আমায় একেবারে টেনেই নিয়ে রওনা হলেন অপূর্ব্ব সান্ন্যাল। এককালে সীতা বিশ্বাসের অন্যতম শাগরেদ ছিলেন। আজ মাথা মুড়িয়ে গোময় ভক্ষণ করেছেন দেখছি!

বাড়ীর কাছে এসে দেখি, এক বিরাট কাণ্ড করে বসেছেন চাটার্জ্জী ব্রাদার্স। প্রকাণ্ড তোরণদ্বার তৈরী করা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অনুকরণে। তার মাথার ওপর শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। বিজয়ী চাটার্জ্জী বাড়ীর অপরিম্লান গৌরবের নিশানা। চতুর্দ্দিকে জাতীয় পতাকার মালা, পাতাবাহার ও দেবদারু পাতায় ছাওয়া রাস্তার দিকের সম্পূর্ণ বেড়াটি। তোরণের মাথায় ঝুলছে একটি বড় ডে লাইট আর জমায়েত জনতার অনেকের হাতেই ছোট ছোট ডে-লাইট লণ্ঠন। আলোকে উদ্ভাসিত চতুর্দ্দিক। চেয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। প্রচণ্ড অগ্রহায়ণের শীতকেও কেউ পরোয়া করেনি। তাঁদের মধ্যে হাড়ী আছে, পান্নুয়া আছে, হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, হিন্দুস্থানী আছে, মারোয়াড়ী আছে, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মাস্টারমশাইয়ের রাজবন্দী জামাইয়ের।

প্রথমেই যে লোকটি এসে আমার পায়ের ধূলি নিয়ে মস্তকে ও জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করালো পরম ভক্তিভরে, চেয়ে দেখি সে আর কেউ নয়, স্বয়ং মংলা হাড়ী। হাড়ী-পাড়ার সর্দ্দার, প্রমোদবাবুর মাথায় একদা যে কাঠের রোলার চালিয়েছিল। বাচালকে সম্বোধন করে চাণক্যের সেই কথাটি চট্ করে আমার মনে ঘা দিল: এখন যে ভারী ভক্তি দেখছি। একদিন আমার শিখা ধরে টেনেছিলে মনে আছে? মুখেও প্রায় বলে ফেলেছিলাম, কিন্তু আত্মসংবরণ করে নিলাম।

এগিয়ে এসে তারকবাবুর পদধূলি গ্রহণ করলাম সর্ব্বাগ্রে। জিজ্ঞেস করলেন: শরীর ভালো আছে তো?

ভালোই আছি।—

কিন্তু তারপর আর কথা কওয়া সম্ভব হলো না। মহিলাদের মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হলো বরণের কাজটা সংক্ষেপে সারবার জন্য। তারপরই সমবেত জনতা উল্লাসধ্বনিতে একেবারে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে তুললো, সবাই আমায় প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে হাজির করলো পাশের বাড়ীতে। সেখানেই সুন্দর করে ফরাশ পেতে একটি বৈঠকখানা সাজানো হয়েছিল। রঘুর দোকানের পাশেই। পেছনের দরজা দিয়ে বিলুদের বাড়ী যাওয়া যায়। তারপর সেখানে প্রায় সারা রাত চললো আলাপ-আলোচনা, গান-বাজনা, হাসি-পরিহাস, খেলাধূলা······

আমার সঙ্গী আই বি-র ভদ্রলোক ও সশস্ত্র সিপাই দু'জন থানায় চলে গেছে। বলেছিলাম বিয়ে-বাড়ীতেই থাকতে। ভদ্রলোক বললেন হেসে: আপনাকে জামাই-বরণ করে ঘরে তুললেও আমাদের কেউ আর বরযাত্রীর আদর-আপ্যায়ন জানাবেন না। বরং শুভকার্য্যে একটা অমঙ্গল বলেই ভাববেন ও তেমনি চোখা চোখা মন্তব্য শোনাবেন। তাই, আমরা আমাদের সনাতন আস্তানাতে গিয়েই কম্বল মুড়ি দিই গে।

পরদিন সন্ধ্যার পর সরকারীভাবে বিবাহসভায় প্রবেশ করেই দেখি, সেই নামজাদা সুনীতি ও সুরুচির ধ্বজাধারীরা সবাই এসে গেছেন। পুরুষ ও মহিলা সবাই। লাট্টু বিশ্বাস এসেছেন, এসেছেন তাঁর ভাই মাক্কু বিশ্বাস, এসেছেন প্রভাত চৌধুরী, এসেছেন রামলাল গুহ, এসেছেন মহেন্দ্র মিত্র, এসেছে মংলা হাড়ী, সবাই গুটিগুটি করে এসে বিবাহসভা আলোকিত করে বসেছেন। অপূর্ব্ব সান্যাল তো প্রধান সংগঠক বলে মনে হলো।

একান্তে প্রমোদবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : নির্লজ্জের মতো সবাই এসে গেছেন দেখছি ?

তা—এসে গেছেন।—বললেন প্রমোদবাবু।

কিন্তু নরসুন্দর পরিতোষ ও তদীয় সহধর্ম্মিণী পরিতোষিণীকে দেখছি না যে ? তাঁদের নেমন্তন্ন করেছিলেন ?

নিশ্চয়ই।—বললেন প্রমোদবাবু : এমন কি, লাট্টু বিশ্বাসের মাকে পর্য্যন্ত নেমন্তন্ন করে এসেছি। আজ এই শুভদিনে অতীতের রেষারেষি সব ভুলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কোথায় সীতা দেবী ?—জিজ্ঞেস করলাম।

এখনো আসেননি দেখছি। জবাব দিলেন তিনি।

বিবাহে বরপক্ষের একজন কর্ত্তার প্রয়োজন আছে। কারণ, কন্যা সম্প্রদান করবার প্রাক্কালে সম্প্রদানকারী বরপক্ষীয় কর্ত্তার অনুমতি চেয়ে নেন। আমার পক্ষে যারা এসেছিল, ব্যাকরণের নিয়মে তারা বরযাত্রী বটে, কিন্তু লজ্জায় তারা আর বিবাহ বাড়ীতেই নামেনি। একেবারে সোজা থানায় চলে গেছে।

এগিয়ে এলেন বীরগঞ্জের স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় : দাও, ঐ অনাহারী চাকরিটা আমাকেই দাও প্রমোদ। তবে সত্যিই অনাহারী রেখো না। যে দারুণ শীত পড়েছে আজ, চায়ের সঙ্গে খানকতক গরম লুচি খুব ভালো মানাবে।

সবাই হেসে উঠলেও আমি হাসলাম না। প্রমোদবাবুকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললাম : শুনুন প্রমোদবাবু, আমি এই বিবাহসভায় একটা বক্তৃতা দিতে চাই। কি বিষয়ে, তা তো বুঝতেই পারছেন। নির্লজ্জ কাপুরুষদের একবার সমঝে দেওয়া দরকার যে রাজবন্দী keeps his word of honour !

প্রমোদবাবু বললেন : তা তো সবার মতো ওরাও দেখতে পাচ্ছে এবং দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আর যারা নির্লজ্জ বেহায়া, তাদের শতবার সমঝে দিলেও কি স্বভাব ছাড়বে তারা ? থাকগে, কি দরকার—

দরকার আছে, বাধা দিলাম : বিনা দরকারে যারা বাড়ী বয়ে এসে আপনাদের সদুপদেশ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি, বিনা দরকারে শিখণ্ডী সাধুকে সম্মুখে রেখে নিন্দা ও কুৎসার বিষাক্ত তীর ছাড়তে দ্বিধা করেনি, আজ তাদেরই মুখোশ খুলে দেয়া দরকার। কি হবে ঐ কুত্তার দল যদি কেঁউ কেঁউ করে

বিবাহসভা ছেড়ে চলে যায়?—আপনি যান, বরং আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসুন, উনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে—

তাই ভালো, তাই ভালো। বলে প্রমোদবাবু তারকবাবুর উদ্দেশে চলে গেলেন।

কিন্তু তারকবাবু বলে পাঠালেন, বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা যদিও তিনি সম্পূর্ণ অনুধাবন করছেন, তথাপি এঁরা তার মর্ম্ম উপলব্ধিই করতে পারবেন না। ফলে, এই আনন্দের দিনে সামাজিক ব্যাপারে আবারও একটা অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

নিরস্ত হতে হলো।

বরকর্ত্তা সত্যবাবু দিলেন অনুমতি আর সম্প্রদান করলেন আধুনিক পণ্ডিতমশাই চিত্তবাবু অর্থাৎ সুবলবাবু। কিন্তু বিশ্বেশ্বরবাবুকে এই আনন্দের দিনে পাওয়া গেল না, তিনি এর আগেই বদলি হয়ে গেছেন তপন থানায়।

শিশিরকণা নামটি বড্ড সেকেলে বলে একদিন তাঁরই প্রস্তাবমতো শিশিরকণার নামকরণ হয়েছিল আত্রেয়ী। আত্রাই নদীর তীরবর্ত্তী খানসামা গ্রামের আত্রেয়ী। নামের মধ্যে আছে কবিত্ব আর নামের পেছনে আছে চাঞ্চল্যকর ইতিহাস! বিশ্বেশ্বরবাবু বলতেন, স্থান ও পাত্রী বিবেচনায় একেবারে নিখুঁত নাম আত্রেয়ী!······

বিয়েতে কাউকে নেমন্তন্ন করতে পারিনি আমার পক্ষ থেকে। করবার সময় পেলাম কোথায়? আর করলেই-বা কে পারতো আসতে? আসতে সাহসই বা করতো কে? রাজবন্দীর বিয়েতে যোগদান করবার ফলে তাকেও হয়তো 'শ্বশুরবাড়ী' চালান করে দিত আই বি-র ধুরন্ধরেরা। আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে তার নিজের শ্বশুরবাড়ী—থাক্, বা না থাক্—যেতে হতো অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য।

তাই অভিনব পন্থা গ্রহণ করলাম। বিয়ের পর অনেকগুলো ছাপানো কার্ড ছেড়ে দিলাম বন্ধু ও আত্মীয়দের নামে। তাতে যা লিখেছিলাম আজও মনে আছে:

আত্রাই নদীর তীরে কুড়িয়ে পেয়েছি আত্রেয়ীকে। তারই সঙ্গে হয়েছে আমার নিবিড় করে পরিচয় কুয়াসাচ্ছন্ন অগ্রহায়ণের ছাব্বিশে। আমাদের অনির্দ্দেশ চলার পথে কামনা করি আপনার শুভকামনা ও শুভাশিস!

* * * *

বিয়েতে শেষ পর্য্যন্ত আসেনি পরিতোষ ও পরিতোষিণী আর আসেননি স্বনামধন্যা সীতা বিশ্বাস। চাকা ঘুরে গেছে, এঁরা এবার পড়ে গেছেন চাকার তলায়। ঘূর্ণায়মান চাকার নিষ্পেষণে এঁদের বুঝি জিভ বেরিয়ে পড়েছে !···

রাত দশটার মধ্যেই বিয়ে শেষ হয়ে গেল। এবার আহার পর্ব্ব। নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিতাদের অধিকাংশই এ কাজটা আগেই সেরে নিয়েছেন। বিয়ের পাট চুকে যাবার পর যাঁরা বসবেন, তাঁরা সবই খুব নিকট আত্মীয় বা শুভানুধ্যায়ী— এমনি অভিমত প্রকাশ করতেই আমি চেপে ধরলাম প্রমোদবাবুকে : বলেন কি, এঁরা সব শুভানুধ্যায়ী ! সত্যিই নাকে খৎ দিয়ে, একশোবার ওঠ-বোস করে ও গোবরজল খেয়ে এঁরা শুদ্ধ হয়েছেন, না এঁদের গায়ের চাদরের নীচে নিন্দার আর-একখানা ধারালো ছুরি লুকানো আছে ?

আমলই দিলেন না তিনি ; নিন্দার আর-একখানা ছুরি আর কোথায় পাবে বাছাধনরা ? যে বিয়ে নিয়ে এত জল-ঘোলা করলো, সে বিয়ে তো হয়ে গেল।

উঠানে সামিয়ানার নীচে পাতা পড়েছে। সবার সঙ্গে আমিও সেখানে বসতে যেতেই বড় জামাই সিনিয়র দ্বিজেন গাঙ্গুলীর সেই রূপসী কন্যা টুকু এসে বাধা দিল : ও কি, আপনি এখানে বসলেন কেন মেসোমশাই, আপনি ঘরে চলুন। ঘরে আপনার জায়গা করা হয়েছে।

আপত্তি জানালাম : না, না, এখানেই সবার সঙ্গে বসবো।

শান্তি, ছুটুন, রেণু, বীণা প্রভৃতি খুকুর এক পাল বন্ধু ছুটে এল : সে কি কথা, এখানে আপনার বসা চলবে না। আজ জামাইকে আলাদা হয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় খেতে হয়।

রাজী হলাম না।

এবার এলেন বাড়ীর বৌরা, ভাইরাও এগিয়ে এলেন। তাঁদের বললাম : কাল পর্য্যন্তও সবারই সমান ছিলাম আর আজই অকস্মাৎ সবার থেকে পৃথক হয়ে যাবার মতো কোনো গর্হিত কাজ করিনি, সুতরাং—

সবাই হেসে উঠলো। দূরে তারকবাবুকে দেখা গেল। তিনি যেন কার উদ্দেশ্যে বললেন : দ্বিজেন যেভাবে খেতে চায়, সেইভাবেই দাও।

ব্যস, সুপ্রীম কোর্টের সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ রায় ! মেয়ে-পুরুষের দল সরে গেল। আমি পাতাটা আর-একবার ধুয়ে নিতে যেতেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন

স্বয়ং অপূর্ব্ব সান্ন্যাল: আরে, আপনার সামনে আবার পাতা কেন? কেন, তোরা এটাও কি জানিস না ছেনু যে, জামাইকে থালায় দিতে হয়? তোদের আর কাণ্ডজ্ঞান হবে না। বলে ছোঁ মেরে আমার পাতা তুলে নিয়ে যেতেই ছেনু অর্থাৎ খুকুর মেজদি' স্নেহকণার কণ্ঠ শোনা গেল: থালাতেই তো সব সাজিয়ে রেখেছি অপূর্ব্ব দা'। তা উনি ঘরে বসে না খেলে কি করবো? রাজবন্দীরা যেমন গভর্নমেন্টকে জ্বালায়, রাজবন্দী জামাইরাও তেমনি—তেমনি—

শ্বশুরবাড়ীকে জ্বালায়! বলে উঠলেন লাট্টু বিশ্বাস, তারপর হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

কিন্তু থালাতেও খেলাম না আমি। এমন কি, বাটি বাটি ভর্ত্তি বিশেষরকম ব্যঞ্জন একটিও ছুঁলাম না। পরিমাণেও যেগুলো বেশী দেয়া হয়েছে, তাও রেখে দিলাম। সবার সঙ্গে বসে সবাই যেসব ব্যঞ্জন যতটুকু খাচ্ছেন, আমিও তাই খেলাম।

একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের ফলেই আমার মর্য্যাদা একেবারে আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছে বলে স্বীকার করি না।

অকস্মাৎ বিয়ের ঠিক পরদিন বিকেলে আমার নামে একখানা এনভেলপে পত্র এসে হাজির। বিস্মিত হলাম। কে লিখলো? ঠিকানা পেল কি করে? মাত্র দু' সপ্তাহের জন্য এসেছি খানসামায়, এরই মধ্যে কী এত জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল?…খুললাম সবার সমক্ষেই এবং দেখে বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রইলো না যে, ওখানা আর কারুর পত্র নয়, একেবারে স্বয়ং রেবার। ফুলবৌদির গ্রামের সেই দূর সম্পর্কীয়া বোন রেবা। প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে একদিন কেয়টখালীতে আমাদের বাড়ীতে এই রেবাই আমায় বিবাহ করবার কামনা জানিয়েছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সে উত্তাপ তো শান্ত হয়ে যাবার কথা। এই ক'বছরে কোনো যোগাযোগই নেই তার সঙ্গে আমার! কিন্তু আশ্চর্য্য, সে আমায় আজও ভোলেনি এবং আকাবাঁকা অক্ষরে দীর্ঘপত্রে যা লিখে পাঠিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমি যেন তার বিষণ্ণ মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

খানিকটে তুলে দিচ্ছি সেই স্মরণীয় পত্র থেকে:

তুমি ভেবেছ আমি তোমায় ভুলে গেছি, তাই না? মনে করেছ, আমি তোমায় একদিন চেয়েছিলাম খেয়ালবশে বা সাময়িক উত্তেজনায়? —তা নয়,

আমি তোমায় সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। ছিলাম নয়, এখনও বাসি। তোমার মনের মতো হয়ে ওঠবার জন্য এই দীর্ঘ চারটি বৎসর আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, লেখাপড়া করেছি, সেলাই শিখেছি, তোমার বিপজ্জনক কাজে সাথিনী হবার মতো করে নিজেকে গড়ে তুলেছি! কিন্তু এ কি করলে তুমি? আমায় কথা না দিলেও আমি তো কথা দিয়েছিলাম নিজকে যে, তোমার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবো!……

যাকে পেয়েছ, সে হয়তো আমার চাইতে অনেক সুন্দরী, অনেক গুণবতী। তবু আমি এখন কী করবো বলতে পারো? আমার সমস্ত তপস্যা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী?……

পড়লাম বারকয়েক। একা নয়, সবাই মিলে। মানুষের জীবনই দেখছি একটি হাসিকান্নার উপন্যাস। আগুন নিয়ে খেলা করবার সময় কার প্রাণে তরঙ্গ সৃষ্টি করে বসেছি, কোন্ বেপথুমানা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, অতনুর ফুলশরে কে মূর্চ্ছা গেল, সে সংবাদ রাখবার সময়ও পাইনি কখনো!……

বিয়ে করবার জন্য সদাশয় সরকার ছুটি দিয়েছিলেন দু' সপ্তাহ। হুকুম ছিল: এই দু' সপ্তাহ তুমি থাকবে তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে, তারপর লক্ষ্মী-ছেলের মতো আবার চলে আসবে হরিপুরে তোমার আস্তানায়।

অকস্মাৎ একটা বুদ্ধি এল। আবেদন জানালাম সরকারকে: ফিরে যাবার সময় সঙ্গে করে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে দাও।

জানতাম, সরকার এতে রাজী হবেন না। আর সরকারের জবাবও বাকি সাত দিনের মধ্যে সেই সুদূর কলকাতার লাল বাড়ী রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে এই নগণ্য দুরধিগম্য খানসামা গ্রামে এসে পৌছুবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, জবাব এল। সুবিবেচক সরকার আমার প্রার্থনার কোনো জবাব না দিয়ে আমার ছুটির মেয়াদ আরও পনেরো দিন বাড়িয়ে দিলেন।

পরিতোষ আর পরিতোষিণীর টিকিটিরও দেখা পাওয়া গেল না। রোজই বিকেলে দলবেঁধে যেতাম সেই ডাকবাংলোর মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলতে। রীতিমতো সরকারী নির্দেশ ভঙ্গ হলেও পরিতোষ এমনি আঘাত নীরবে হজম করতে লাগলেন!

আশ্চর্য্য, লোকটা বোধহয় একেবারে মরে গেছে!……

ক' সপ্তাহ পর ফিরে এলাম হরিপুরে। দেখি, অনিলবাবু নেই। জানতে পারলাম, পরে একশোর একটি তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল। মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে গেছেন। কিন্তু দিনসাতেক পরই বিয়ের দিন স্থির করে তবে বিদায় নিয়েছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে এলেন তিনি তাঁর দাদা ও জনকয়েক বরযাত্রীসহ। আলিঙ্গন জানিয়ে বললাম: অনিলবাবু, রাজবন্দীরা যে কথা দিলে তার নড়চড় করে না, তা আমি দেখিয়ে এসেছি খানসামায়, আপনি দেখালেন হরিপুরে।

হরিপুরে সেনদের বাড়ী আনন্দমুখর হয়ে উঠলো। হরিপুরের বহু ভদ্রলোককেই পেট ভরে খাওয়ালেন তাঁরা। আমিও নিশ্চিন্তে বিয়েতে যোগদান করতে পারলাম। কারণ আলাউদ্দীন বদলি হয়ে চলে গেছেন আর তাঁর স্থানে এসেছেন আবদুস সালাম। পাঁচটায় থানায় যেতেই তিনি নিজেই বললেন: আপনার বন্ধুর বিয়ে আর শুনছি আপনিই match maker—যাচ্ছেন তো?

একটু ইতস্তত: করতে দেখে বললেন: আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি না গেলে সেখানকার উৎসবটা ভালো জমবে না। যাবেন, বুঝলেন?

সালাম সাহেব স্বল্পভাষী, কিন্তু অমায়িক। অখিলবাবু বললেন: এঁর পোস্টিং অন্নদাবাবুর জন্যই হয়েছে। এবার একটু ভদ্রভাবে থাকা যাবে আশা করা যায়।

বিয়ের পর বৌ নিয়ে অনিলবাবু বরিশাল চলে গেলেন আর দিনদশেক পর আমায়ও আবার স্থানান্তরিত করা হলো এই দিনাজপুর জেলারই ফুলবাড়ী থানায়। অখিলবাবু গোপনে বলে গেলেন যে, ওখানে ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স পাঠানো হচ্ছে আমাকে আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে থাকতে দেবার জন্য।

সাতাশ

বন্দীজীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে পড়েছি। পেছনে রেখে এসেছি দীর্ঘ ছয়টি বৎসর। কোথাও কাটাতে পারিনি নিরুপদ্রব জীবন, কোথাও পাইনি অনাহত শান্তি, কোথাও মেলেনি একটানা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। বন্দীজীবনের প্রতি পদক্ষেপে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বৃটিশ গভর্নমেন্টের এমনি সব শয়তান কর্ম্মচারীর যে, সারাক্ষণই চালাতে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধির সংগ্রাম। ক্ষতবিক্ষত হলেও গর্ব্বভরে •ঘোষণা করবো যে, বিজয়ার মর্য্যাদা নিয়েই চলে এসেছি এতদিন। বিপ্লবীর জীবনে হাজার-দুয়ারী হাওয়া-ঘর কোথায়? কোথায় বোটানিক্যাল গার্ডেনের ছায়াশীতল অর্কিড?……

হরিপুরে আবদুস সালাম আসাতে আশা করেছিলাম হয়তো সত্যিই এবার ঝড়জলের অবসান ঘটবে, ওখানকার দিনগুলি শরতের সোনালি রোদের মতো মিষ্টি হয়ে উঠবে। কিন্তু কপালে তা সইলো না, তাই কয়েক দিন পরই এল বদলির হুকুম।

ফুলবাড়ী থানার অফিসার ইন চার্জ্জ পূর্ণ বড়ালের নাম দিনাজপুর জেলায় জানে না, এমনি একটিও লোক নেই। লোকে বলে, তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অত্যন্ত কটুভাষী ও মামলাবাজ পূর্ণ দারোগা, এই সংবাদই পেয়েছিলাম। সুতরাং মুষ্টিযুদ্ধের দশম রাউণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়েই একদিন হরিপুর ছেড়ে রওনা হলাম। এবার আর বিয়ে করতে যাওয়া নয়, স্ত্রী নিয়ে সংসার করবার জন্য ফুলবাড়ী যাত্রা। অর্থাৎ চিরদিনের জন্য হরিপুর ত্যাগ।

ফুলবাড়ী পার্ব্বতীপুরের পর কলকাতার দিকে দিনাজপুর জেলার মধ্যেই একটি রেল স্টেশন। স্টেশন থেকে থানা প্রায় এক মাইল। খুব ভোরে সিপাই-শান্ত্রীসহ এসে যখন পৌছুলাম, থানার কর্ত্তারা তখনো কেউ গাত্রোত্থান করেননি দেখা গেল। একজন সিপাই গেল খবর দিতে।

মেজাজটা এমনিই ভালো ছিল না এখানকার দারোগার কাহিনী শুনে। তারপর যতই ওদের আসতে দেরী হতে লাগলো, ততই যেন মনে হতে লাগলো এই সকালেই বুঝি একটা লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায় দারোগার সঙ্গে!

একটু পরই দেখা গেল পূর্ণ বড়ালের টিকি। পশ্চাতে বোধহয় জমাদারবাবু।

কম্ফর্টারে কান ও মাথা ভালো করে ঢাকা, গায়েও জড়ানো একখানা র‍্যাপার। জমাদারের গায়ে অবশ্য খাঁকি শার্টের ওপর ফুলহাতা সোয়েটার।

নমস্কার, নমস্কার। আপনি এলেন হরিপুর থেকে ?

এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় ? তবু বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম : তা তো বুঝতেই পারছেন। আমার কোয়ার্টার্সটা কোন্ দিকে ?

দাঁড়ান, মশাই, দাঁড়ান। বাধা দিলেন পূর্ণ বড়াল, তারপর আমার ট্রাঙ্ক ও সুটকেস দেখিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন : ওসবের মধ্যে রিভলভার-টার নেই তো ? আপনাদের মশাই দেখলেই ভয় করে। সার্চ্চ না করে বাসায় ঢুকতে দেওয়া যেতে পারে না।

বিস্মিত হলাম : সার্চ্চ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিরক্তিভরে বললাম : এই দু'টি বছর তো কাটিয়ে দিলাম রাজবন্দীর জীবন। কোথাও তো রাজবন্দীর বাক্স তল্লাশী হতে দেখিনি। আপনার এখানে নতুন নিয়ম নাকি ?

জবাব দিলেন বড়াল : তা হয়তো হবে। তবে আমি নয়, সার্চ্চ করবেন উনি, আমার সতীশ দাদা। জমাদার হলেও আসলে দারোগা উনিই। ইচ্ছে করলে উনি ছেড়েও দিতে পারেন। কী বলেন দাদা, সার্চ্চ করবেন ?—

দাদা কোনো জবাব না দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন মাত্র। দেখে গা জ্বলে গেল ! এখনই দোব নাকি দারোগাকে কড়া কথা শুনিয়ে ? Hard nut কাকে বলে, তার নমুনা বোধহয় এখনো দেখেননি। দোব নাকি দেখিয়ে ?

কিন্তু সহসা দারোগা বলে উঠলেন : থাক, না হয় পরেই করা যাবে। এখন ভদ্রলোক স্নান-টান করে আগে চা-খাবারের জোগাড় করে নিন। তাই ভালো নয় কি ?

সতীশবাবু বললেন : আমার ওখানেই চা হবে।

বড়াল বললেন : তা বেশ। রাজবন্দীকে চা খাইয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চান, আনুন। আমার তাতে কী হবে ? তবে এক কাপ চা আমাকেও দেবেন, বলে দিন পরী-মাকে।

সত্যিই লোকটির কথাবার্ত্তা এতো স্পষ্ট যে, অনেক সময় অভদ্রতা বলে মনে হয়। কিন্তু দু'চার দিনেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। আজ তাই

পরম শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করি এমনি উদার, শুভানুধ্যায়ী ও ধর্ম্মভীরু দারোগা আমার প্রায় সাত বৎসরের বন্দীজীবনে কোথাও পাইনি। অল্পদিনেই তিনি অত্যন্ত সহজে আমার পরম হিতৈষী হয়ে উঠলেন।

একদিন বললেন : শুনুন দ্বিজেনবাবু, এখানে আপনাদের এরিয়াটা ভারী বিশ্রী, বাজারটাই বাইরে পড়ে গেছে। তা হোক, আপনি যাবেন বাজারে, তবে Command certificate কেটে আমি আমার সিপাইকে পাঠাবো আপনার পেছন পেছন। দেখবেন, পালিয়ে যাবেন না যেন। তাহলে আমার চাকরি যাবে।

আর-একদিন বললেন : আপনার শোবার খাটটা ভাঙা। ললিত বর্ম্মণ মশায় এই খাটেই চালিয়ে গেছেন কোনোরকমে। আপনি বরং খাট তৈরীর জন্য ত্রিশ টাকা চেয়ে পাঠান। কিন্তু ত্রিশ টাকাই পাবেন না। আমি লিখবো, রাজবন্দীর estimate ভুল, পঁচিশ টাকার বেশী লাগতে পারে না। আই বি আবার আরও কলম চালিয়ে ওটা কুড়ি টাকা করে দেবে। তাতেই ঠিক ঠিক দাম পাবেন আর হয়ে যাবে আপনার খাট। একখানা টি-পয়ও হতে পারে। আর সত্যবাদিতা দেখিয়ে যদি কুড়ি টাকা চান তাহলে শেষ পর্য্যন্ত স্যাংশন হয়ে আসবে দশ টাকা। আধখানা খাট তাতে হতে পারে।

আবার একদিন বললেন : স্বদেশী করেন, অথচ সংবাদপত্র পাঠ করেন না, কেমন স্বদেশী গো আপনি? এক কাজ করুন। আমি অমৃতবাজার পত্রিকা আনাচ্ছি আমার নামে। পড়েই কাগজখানা ফেরত দেবেন, ভুলবেন না। আর মাসের শেষে দামটি কিন্তু ঠিক ঠিক হিসেব করে আমার হাতে তুলে দেবেন। দেখবেন ফাঁকি দেবেন না যেন। গরীব দারোগাকে আবার ফাঁসিয়ে দেবেন না যেন।

সাপ্তাহিক কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্টটি আমায় বড়াল সাহেব না দেখিয়েই ছাড়বেন না : নিন মশাই, দেখুন ইংরেজী-টিংরেজী ভুল আছে কিনা। আর কি লিখলাম, সেন্সর করে দিন। পরে যে বলবেন, শালা পূর্ণ দারোগা চুকলি কেটেছে, সে বদনাম আমি নিতে পারবো না। সারা জেলায় আমার বদনাম, গ্রামের দেওনিয়াদের ধরে দশ ধারার মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম বলে। কিন্তু শেষ বয়সে আর কেন?

সত্যি, অদ্ভুত মানুষটি। স্পেডকে ইনি স্পেডই বলেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বকথার অন্তরালেই এঁর গভীর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়!......

সরকারী আদেশের ফলে ক'দিন পরই এক সন্ধ্যায় বিলু আত্রেয়ীকে নিয়ে এল। তাদের নিয়েও পূর্ণ বড়াল একহাত কটুকথা ঝাড়লেন।

আরে মশাই, আপনি ওদিকে যাচ্ছেন যে? আপনার বোন দ্বিজেনবাবুর বাসায় যাবেন, তা জানি। সরকারী হুকুমই তাই। কিন্তু তাই বলে আপনি বোনাইয়ের বাসায় কী করে যাবেন শুনি! এই থানার বারান্দাতেই অপেক্ষা করুন, না হয় মাঠে বেরিয়ে হাওয়া খান। ফিরতি ট্রেনে চলে যাবেন।

সে তো ভোরবেলা!—বিলুর কপালে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল।

দারোগা বললেন: তা আর আমি কি করতে পারি? রামশুকুল সিপাই সদরে গেছে, না হয় তার খাটেই শুয়ে সারা রাত খট্মল আর মশা মারুন। রাতটা কাটবে ভাল।

ভারী বিরক্তি লাগছিল বিলুর। লোকটা কি পাষণ্ড!

একটু পর বড়াল সাহেব বললেন: বাজার থেকে চিড়ে-গুড় আনিয়ে দিই? একেবারে উপোস করবেন না। তাতে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণ হয়! শত্রু হলেও আপনি অতিথি। অতিথি নারায়ণ। —তবে হ্যাঁ, সতীশ দাদা যদি হুকুম করেন, তাহলে কাছেই মতিয়ার হোটেলে খাওয়া ও রাতটুকু থাকবার ব্যবস্থা হয়তো করা যেতে পারে। থানার কর্ত্তা তো উনি, আমি শুধু নামে। কি বলেন সতীশ দাদা?

দাদা মুচকি মুচকি হাসছিলেন, বললেন: তাই করুন।

পূর্ণ জিজ্ঞেস করলেন: কি মশাই, রাজী তো?—তা খাবেন ভাল।

বিলুর শরীর জ্বলে যাচ্ছিল! বললো: থাক্, আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

না, না, সে হয় না।—বলতে লাগলেন দারোগা: মতিয়া খুব ভালো রাঁধে, চার্জ্জও কম। আপনার কাছ থেকে নাও নিতে পারে। সহজ কথা তো নয়, আপনি ডেটিনিউবাবুর শ্যালক!—যান দাদা, পৌঁছে দিয়ে আসুন ভদ্রলোককে। কিন্তু ভোরের ট্রেনেই যেন ফুলবাড়ী ত্যাগ করবেন, ভুলবেন না।

সতীশ জমাদার বিলুকে আমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মতিয়া আমারই রাঁধুনী ও ভৃত্য। এবার সব পরিষ্কার জানা গেল। তিনজনে মিলে খুব আমোদ উপভোগ করলাম।

* * *

দু'চার দিনের মধ্যেই পূর্ণ বড়াল খুকুকে আত্রাই-মা বলে ডাকতে শুরু করলেন। পাড়ায় যেসব ছেলে ম্যাট্রিক দেবে, সবাইকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন : এদের কাছ থেকে বই নিয়ো, নোট নিয়ো। পাস করা চাই। তবে তোমাদের তো বিশ্বাস-টিশ্বাস নেই। রাজবন্দীর স্ত্রী কিনা, আবার তারকবাবুর কন্যা। এককালে জুরির কাজ করতেন। হয়তো আমার চাকরিই খেয়ে দেবেন।

আমরা কিন্তু পরম বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় ফুলবাড়ীর দিনগুলি কাটাতে লাগলাম ফুলেরই মতো !···

সতীশ জমাদারের একমাত্র মেয়ে পরীর সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, আত্রেয়ী দু'চার দিনের মধ্যে তার সঙ্গে বন্ধুত্বই পাতিয়ে ফেললো ! আত্রেয়ীকে সে ডাকতো, নদী, আর আত্রেয়ী ডাকতো, বারি। বারি আর নদীকে কখনোও পৃথক করা যায় ? তারাও ভাবতো, তাদের বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য। দু'জনে সাইকেল চালাতো থানা কম্পাউণ্ডে, ব্যাডমিণ্টন খেলতো আর হাজারো বার থানায় গিয়ে পূর্ণ বড়ালের কাছে নালিশ জানাতো এ ওর নামে। বড়াল বলতেন : গেল, এবার আমার চাকরিটা গেল। দুটো সৎমা শেষ বয়সে আমায় দেখছি পথে বসাবে !···

মাসখানেক পর আত্রেয়ীকে একবার ফিরে যেতো হলো তার স্কুলের ব্যাপারে।

অকস্মাৎ ১৯৩৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ পূর্ণ বড়াল সকালবেলায় আমায় ডেকে পাঠালেন। ভাবলাম হয়তো আবার কিছু কটূক্তি করে এ সপ্তাহের কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্টখানা আমার সামনে মেলে ধরবেন কিংবা মতিয়া রান্নাবান্না কি কি আর শিখলো, তার হিসেব চাইবেন। লোকটি থাকেন একা, কুকারে ভাত আব আলুসেদ্ধ খান। আমার এখান থেকে কিছু পাঠালে সসম্মানে ফেরত দিয়ে বলে পাঠান : বিশ্বাস নেই মশাই, রাজবন্দীদের পক্ষে সম্ভব সবই। হয়তো বিষ-টিষই দিয়েছেন নাকি মিশিয়ে, কে জানে !

যাই হোক, গেলাম থানায়। দেখলাম, সতীশ জমাদার কাজ করছেন। কিন্তু দু'জনেই আজ যেন ভারী গম্ভীর। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না।

নীরবে উপবেশন করতেই শুরু করলেন বড়াল : আত্রাই-মা বোধহয় আপনার মুক্তির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন ?

জবাব দিলাম : তা তো মাস খানেক আগে না-মঞ্জুর হয়ে ফিরে এসেছে।

কী লিখেছিলেন সরকার বাহাদুর ?

লিখেছিলেন, আপনার স্বামীকে এখন মুক্তি দেওয়া হবে না।—কেন, সে প্রশ্ন কেন দারোগাবাবু ?

ডায়েরীতে চক্ষু নিবদ্ধ রেখেই জবাব দিলেন পূর্ণ বড়াল : না, বিশেষ কিছুই নয়। শুধু আপনার transfer order এসেছে।

আবার কোথায় ?

কোথায় যেন সতীশদাদা ?

গম্ভীরমুখে মুখ না তুলেই জবাব দিলেন জমাদার : দেওলিতে।

পূর্ণ বড়াল জের টানলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, দেওলিতে। চমৎকার জায়গা শুনেছি। রাজপুতনার মরুভূমিগুলো খুব কাছেই। বেশ বেড়াতে-টেড়াতে পারবেন। কি বলেন ?

বলবার আর কি আছে ? তাই চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, এতদিনেও বৃটিশ সরকারের ক্ষোভ মেটেনি। তাই এবার একেবারে রাজপুতনার আমন্ত্রণ এসেছে ! পূর্ণ বড়াল হাঁক দিলেন : দরওয়াজা !

বুটের আওয়াজ তুলে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সিপাই।

ডিড বক্স্ লেতে আও।

এলো সেই কালো বাক্সটি। তালা খুলে পূর্ণ বড়াল ভেতর থেকে একখানা কাগজ বার করে আমার হাতে দিতে-দিতে বললেন : এখনই রওনা হতে হবে। রান্না না হয়ে থাকলে না-খেয়েই যেতে হবে। কিছু চিড়ে-গুড় রুমালে বেঁধে নিন। রাস্তা কম নয়। একেবারে round the Cape of Good Hope-এর সামিল ! সরকার বাহাদুরের জরুরী হুকুম। তামিল করাই আমাদের কর্তব্য। নুন খাই, গুণ গাইবো না ? বুড়ো বয়সে তো আর—

বাধা দিলাম শুধু ওঁর মুখের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করে। কাগজখানা নিঃশব্দে পাঠ শেষ করে ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিতেই এবার বেশ সহজভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি : মানে ? চুপ করে পড়ে আবার কথা না বলেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?

নিঃশব্দে হাসলাম, বোধহয় তা ম্লান দেখা গেল। বলে উঠলেন পূর্ণ বড়াল : আরে মশাই, আপনি কি মানুষ, না পাথর ? সাড়ে ছ' বছর তো হতে চললো। পেলেন আজ মুক্তির আদেশ। চুপ করে বসে রইলেন ?

কি করবো তবে ?

কি করবো ! আরে আমি হলে তো এখন রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে চীৎকার করতাম, লাফাতাম, গান করতাম, গাছে চড়তাম, পাগলামি করতাম—

যোগ করে দিলেন জমাদার : আর আমি পরনের ধুতিখানা দিয়ে মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি বেঁধে নিতাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন ওঁরা দু'জন। পারলাম না যোগ দিতে। শ্রান্তস্বরে বললাম : আমার দীর্ঘ রাজবন্দীজীবনের শেষদিকে যে শান্তিময় পরিবেশে দিন কাটছিল সত্যি বলছি দারোগাবাবু, তা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে আমার। দীর্ঘ সাড়ে ছ' বছর নানা হাঙ্গাম, নানা মনোমালিন্য ও মামলা-মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে কেটেছে। সবে এই ফুলবাড়ীতে এসেই—

বাধা দিলেন পূর্ণ বড়াল : ওসব কথা রাখুন। আপনাকে এমন কিছু খাতির করিনি আমি। যতটুকু পারা যায় আমাদের চাকরি-বাকরি বাঁচিয়ে তাই করেছি। ওটুকু সবাই করবে।

বললাম : দারোগাবাবু, আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনলে আপনাদের লাইনটার ওপরই ঘেন্না ধরে যাবে আপনার।—সে কথা যাক। সত্যিই বিশ্বাস করুন, এই মুক্তি আমায় স্বাধীনতা দিলেও এখানকার আনন্দময় জীবনের কথা ভুলতে পারবো না কোনোদিন।

পূর্ণ বড়াল বললেন : আমারও এইটুকুই সান্ত্বনা যে, চাকরির শেষ দিকে আপনাদের মতো দেশহিতৈষীদের দর্শন পেলাম, সাহচর্য্য পেলাম ও সাধ্যমতো আপনাদের সেবা করবার সুযোগ পেলাম।—

এই হচ্ছে পূর্ণ বড়াল, যাঁর নামে কত বদনাম শুনেছি ! কেউ কেউ বলেছিলেন যে, ফুলবাড়ী এসে একটি মাসও তিষ্ঠিতে পারবো না আমি !……

বড়াল বললেন : সারা জীবন পুলিশের চাকরি করে যে পাপ করেছি, শেষ জীবনে তা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেলাম। ভগবানের কাছে আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। আত্রাই-মাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন, বলবেন, বুড়ো ছেলের অত্যাচার যেন তিনি মাপ করেন !……

গোছগাছ করে নিতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এলাম থানাঘর থেকে। একদা কেয়টখালী থেকে রওনা হয়েছিলাম এমনিভাবে রাজেন দারোগার

সঙ্গে। আমার পশ্চাতে এগিয়ে এসেছিলেন পাড়া-পড়শী আত্মীয়জনেরা। বাবা মা বৌদিরা এগিয়ে না এলেও আড়ালে নিশ্চয়ই অশ্রুমোচন করেছিলেন। আজ তাঁরা কোথায় আর আমি কোথায় ?

যাক, সেসব কথা আর ভাববো না। আজ আমি স্বাধীন, কোনো রাজেন দারোগাই আজ আর আমার গন্তব্যস্থল নির্ণয় করবে না। ঠিক করলাম, কিছুই কাউকে জানাবো না, অকস্মাৎ খানসামায় হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দোব। এই তো মাত্র গোটা চার-পাঁচ স্টেশন, তারপরই সেই দারোয়ানী। সেখান থেকে সেই গরুর গাড়ী। সেই ট্যাঙস ট্যাঙস করে এগিয়ে যাবে। হেঁটেও বোধহয় ওর চাইতে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়!......

মুক্তি! বার বার উচ্চারণ করলাম মনে মনে, মুখেও। প্রায় সাড়ে ছ' বছর পর মুক্তি! একেবারে সর্ত্তহীন মুক্তি! বন্দীত্বের শৃঙ্খল পরেছিলাম সেই একুশ বছর বয়সে আর তা থেকে মুক্তি পেলাম যখন, তখন সাতাশ পেরিয়ে গেছি। জীবনের অনেকগুলো মূল্যবান বৎসর পেছনে ফেলে এলাম। বাবাকে হারিয়েছি, মাকে হারিয়েছি, ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি তাঁদের কত-না আশা, কত-না কল্পনা! দ্বিজেন বিলেত যাবে, লিঙ্কল্‌স ইন্‌-এ তার এক্‌সটেম্পোর ভাষণ অবিসংবাদিত প্রশংসা লাভ করবে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রশস্ত কক্ষ তার অগ্নিগর্ভ সওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে, চারিদিকে যশঃ ছড়িয়ে পড়বে, বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে!......

বাবা মা-র, আত্মীয়-পরিজনের, বন্ধুদের, শুভাকাঙ্ক্ষীদের, পাড়া-প্রতিবেশীর সমস্ত আশা ও ভরসার দেউল কালাপাহাড়ের মতো ধূলিসাৎ করে দিয়ে একুশ বছরের যুবক আজ আটাশ বছরের পরিণত মানুষ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বন্দীজীবন ছিল বিধিনিষেধের নিগড়ে সীমিত, অসোয়াস্তি থাকলেও আর নিত্য নব নিগ্রহের সুযোগ ছিল না। আজ মুক্তির পর সেই গণ্ডী হলো তিরোহিত, ফিরে পেলাম চলা ও বলার স্বাধীনতা। কিন্তু কে জানে আগামীকাল আমার জন্য কি সঞ্চয় করে রেখেছে! কে জানে, পথের সেই দুর্দান্ত দেবতা অপ্রতিরোধ্য সম্মোহনে আবার কোথায়, কোন্ সর্ব্বনাশা পথে আমায় টেনে নিয়ে যাবেন! ফাঁসির দড়ির যে ফুলের মালাটি কণ্ঠে ধারণের সৌভাগ্য থেকে রয়েছি বঞ্চিত, কে জানে হয়তো আগামী জীবনে তেমনি একখানি মালাই রয়েছে আমার জন্য নির্দিষ্ট!......

সতীশ জমাদারকে সঙ্গে করে স্টেশনে এলেন পূর্ণ বড়াল্। ট্রেন থামে মাত্র দু' মিনিট। সেই দু'টি মিনিটই ভদ্রলোক নিঃশব্দে আমার একখানা হাত দু'হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রইলেন। আমিও কোনো কথা কইলাম না।

ট্রেন ছেড়ে দিল। পূর্ণ বড়ালও হাত ছেড়ে দিলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম। হাত নাড়লাম। বড়াল আর হাত নাড়লেন না, পাথরের মতো নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে রইলেন। ট্রেন প্লাটফরম্ অতিক্রম করে এগিয়ে চললো।

হাতে যেন বড়ালের হাতের উষ্ণতা লেগে রয়েছে!

আজ পেছনে ফেলে-আসা সেই অগ্নি-জীবনের পানে মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে তাকাই। বুঝি চুরি করে তাকাই। শাহারার বুকে অকস্মাৎ যেন মৌসুমী বায়ুর আর্দ্রতা নেমে আসে, বিসুভিয়সের শীর্ষে গৌরীশঙ্করের তুষারকণা জমে ওঠে······ভাবি,

চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল······

সমাপ্ত